খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীদের আত্মকথা

ধন্য মোরা ইসলাম পেয়ে

গ্রন্থনা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীদের আত্মকথা

ধন্য মোরা ইসলাম পেয়ে

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীদের আত্মকথা

ধন্য মোরা ইসলাম পেয়ে

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি

ইন্টারনেট সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২০

প্রকাশক: খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ভূমিকা

আধুনিক এ যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের। মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে অনসুন্ধিৎসা- জানার আগ্রহ। বর্তমান যুগে এ আগ্রহটি খুব বেশি বেশি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আগেকার যুগে একদল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ জ্ঞানান্বেষায় লিপ্ত থাকতেন। আর তাদের কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি সবাই বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতো। এ যুগের অবস্থা এর উল্টোটি- মানুষ নিজেই জানতে চায়- যুক্তির নিরিখে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি মৌলিক বিষয় ছাড়াও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আজকাল সবাই আরো বেশি জানতে চায়- বুঝতে চায়। প্রত্যেকে নিজের ও অপরের ধর্মবিশ্বাস কতটুকু সত্য, যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ তা অনুধাবন করতে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেছে।

কিতাবী ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম সবশেষে আবির্ভূত হয়েছে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সর্বশেষ নবী তা এখন সবাই মেনে নিয়েছে। তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের পূর্বেকার ধর্মগুলোর মধ্যে ইয়াহুদী, খ্রিস্টবাদ, হিন্দুত্ববাদ, জৈনবাদ, জুরোসথ্রবাদ, বৌদ্ধবাদ ইত্যাদি ছিলো শক্তিশালী ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজকের যুক্তিপাগল মানুষ এ সবকটি ধর্মবিশ্বাসে ত্রূটি-বিচ্যুতি যুক্তির নিরিখে উন্মোচন করেছে। শুধু তাই নয়, ওসব ধর্মে বিশ্বাসী অনুসন্ধিৎসু মানুষ স্ব-স্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব পরিত্যাগকারী লোকজনের অনেকেই সত্যধর্ম ইসলামকে 'সত্য জেনে' গ্রহণ করছেন। কেনো কোন্ কারণে ইসলামের ছায়াতলে এসব মানুষ আশ্রয়গ্রহণ করছেন সেসব কাহিনী নিয়েই আমাদের এ গ্রন্থটি রচিত। পৃথিবীব্যাপী মানুষের 'ইসলামে প্রত্যাবর্তন' এর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাঠ করে অমুসলিম ও মুসলমানগণ উপকৃত হবেন এটাই আশা। আমরা যারা গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত তারাও এসব কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। শুকরিয়া জ্ঞাপন কিরেছি মহান আল্লাহর দরবারে যিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছেন। হাজার হাজার মানুষের ইসলামগ্রহণের বর্ণনা ইন্টারনেটে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিনই। অধিকাংশ বর্ণনা ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীরা নিজেই দিয়েছেন। কেউ দিয়েছেন অল্পকথায়, কেউ বা দীর্ঘ বর্ণনা তুলে ধরেছেন ইসলামের প্রতি ভ্রমণের। অধিকাংশ বর্ণনাই চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয়। এসব কাহিনীর কোনটি গ্রন্থে স্থান দেবো আর কোনটি দেবো না- সেটাই আমাদরে ভাবিয়ে তুলে। যেহেতু সবগুলো গ্রন্থে স্থান দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়- তাই আমাদের পছন্দসই বর্ণনাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আশাকরি সবাই এগুলো পাঠ করে উপকৃত হবেন।

আমাদের এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়। সবার নিকট দু'আপ্রার্থী, আল্লাহ যেনো বইটি কবুল করে নেন। অমুসলিম ও মুসলমানগণ এ বই পড়ে ইসলামের মাহাত্ম্য, সত্যতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে উপকৃত হবেন- এটাই আশা।

গ্রন্থপ্রণয়ন একটি নেশার নাম। প্রেরণা-অনুপ্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপণা নিজে থেকে অনেক সময় জাগ্রত হয় না। এর জন্য প্রয়োজান দাঁড়ায় ওয়াসিলার। আমাকে যারা লেখালেখির ক্ষেত্রে সব সময় প্রেরণা দান করে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহর জলিলুল কদর খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা., জকিগঞ্জী হযরতের খলিফা লেখক-গবেষক ও বিজ্ঞানী শায়খ প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক, জকিগঞ্জী হযরতের অপর খলিফা কবি-গবেষক শায়খ আবদুল মুকিত মুখতার, তরুণ লেখক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ও লেখক-গবেষক ড. মুহাম্মদ শামীম খান। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপরও কারোর নিকট ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে জানাবেন- পরবর্তী সংস্করণে গুরুত্বসহ শুধরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

-গ্রন্থকার

ড. জুলিও সিজার পিনো

প্রাক্তন সন্দেহবাদী - ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা

সন্দেহবাদী থেকে ইসলামের ছায়াতলে

ড. জুলিও সিজার পিনো ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস-এ্যাঞ্জেলেস (UCLA) -এ ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর ইসলামগ্রহণের কাহিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন। আমরা এখন এ বর্ণনা তাঁরই ভাষায় ব্যক্ত করবো।

আমি যে হাইস্কুলে সত্তুর দশকের সময় পাঠরত ছিলাম, সেখানকার পাদ্রি ও নানগণ সৌভাগ্যবশত আমাকে এমনিতেই খ্রিস্টবাদ থেকে বাদ দিয়েছিলেন। আমি সেসব অনুমিত খ্রিস্টানদের ব্যাপারে কী-ই বা বলবো, যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধকে আশীর্বাদ করেছিলো? তিনটি বছর এ উপহাসসর্বস্ব অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমি চিৎকার করেছি। অবশেষে একটি পাবলিক স্কুলে চলে যাওয়ার অনুমতি পাই মাতা-পিতার কাছ থেকে। একই সময় আমার মন থেকে খ্রিস্টবাদের সব বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়! ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমার সন্দেহ শেষ পর্যন্ত আমাকে একজন সন্দেহবাদীতে পরিণত করে। এ অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি ইসলামকে আপন হিসেবে পেয়েছি।

পাবলিক ‘প্যারিশ’ [খিস্ট্রান] স্কুল থেকে বের হয়ে ১৯৮০ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস-এ্যাঞ্জেলেস-এ ভর্তি হলাম। আমার অধ্যয়নের বিষয় ছিলো ইতিহাস ও বিশেষত্ব ব্রাজিল। ধীরে ধীরে ‘সংগঠিত’ ধর্মবিশ্বাস থেকে আমি দূরে থেকে দূরে সরে পড়ি। আশির দশকে রন্যাল্ড রিগ্যান [১৯১১-২০০৪] ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। মধ্য-আমেরিকায় আমাদের লাতিন ভাই-বেনাকে অন্যায়ভাবে আমেরিকান-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেথ-স্কোয়াড প্রত্যহ কসাইদের মতো হত্যা করে চলছিলো। এদিকে স্বয়ং আমেরিকায় দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছিলো উচ্চ হারে। ধনীরা আরো

ধনী হচ্ছিলো। অপরদিকে গরীবরা আরো বেশি গরীবত্বের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিলো।

একজন সচেতন মানুষ হিসেবে ইউসিএলএ প্রতিষ্ঠিত একাধিক সংস্থার সঙ্গে যোগ দেই সামাজিক বৈষম্যমূলক এ জঘন্য অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। এ সময় আমার জন্য রাজনীতি হয়ে ওঠে ধর্মের বিকল্প হিসেবে। আমি ছোট থেকেই পৃথিবীর জমিনে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতাম। তবে যে কেউ এ রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন তার অবশ্যই জানা যে, যতো বেশি এতে নিজেকে সম্পৃক্ত করা হবে ততো বেশি অন্তরে বিচ্ছিন্নতাবোধ এসে দানা বাঁধবে। খুব দ্রুত বন্ধু পরিণত হবে দুশমনে। আমি আন্তরিক হতাশ থেকে শেষ পর্যন্ত নিজকে রক্ষার্থে মদ পান করতে লাগলাম।

নব্বই দশকের শুরুতে (১৯৯১ সালে) ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসিয়েলিস্ট রিপাবলিক ভেঙ্গে যায়, নিকারাগুয়ার নির্বাচনে সান্দিনিস্টান হেরে গেলো, সালভেদোরের বিদ্রোহীগণ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করলো এবং কিউবা তার ইতিহাসের সর্বাধিক জঘন্য অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হলো। সেখানকার আমার পরিবারবর্গ ভীষণ অভাব-অনটনে পড়ে গেলেন। আমি ও আমার আম্মার নিকট তারা পত্র লিখলো, তোমরা যা কিছু পারো- এমনকি এ্যাসপ্রিন হলেও আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও।

কর্মজীবন ও বিবাহ

ব্যক্তিগতভাবে এ দুঃসময়েও আমি নিজেকে দাঁড় করতে দীর্ঘ সাধনায় লিপ্ত হই। আলহামদুলিল্লাহ! ঐ বছরই আমি চিরতরে মদ পানের নেশা থেকে মুক্ত হই। ইউসিএলএ থেকে ইতিহাসের ওপর ডক্টরেট সমাপ্ত করি। এরপর কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে তৎপর হই।

এর পরের বছর কোরিয়ান-আমেরিকান এক নারীকে বিবাহ করি। এরপর যোগ দেই লেকচারার হিসেবে ওহায়োতে স্থাপিত কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। এখানেই আমি লাতিন আমেরিকা ও সভ্যতার ইতিহাসের ওপর শিক্ষকতা করছি। রিও ডি জেনেরিও (ব্রাজিলের রাজধানী) এর

বস্তিশহরের ওপর সাত বছরের গবেষণা শেষে ‘ফ্যামিলি ও ফ্যাবেলা’ শিরোনামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি। এটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশ হয়েছে।

পেশাদারিত্বে, আমি এর চেয়ে আর বেশি সন্তুষ্টির আশা করতে পারি না। কিন্তু দিঘন্তে উঁকি দিচ্ছিলো অপর এক বিষয়- যার ধাক্কায় আমার জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। আমাকে মা-বাবা আরো সুখের বাল্যকাল উপহার দেননি কেনো? আমি তাদের প্রতি খুব রাগান্বিত ছিলাম। আমার স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে পড়ি। আবার অনুভূতিশূন্যতায় আক্রান্ত হই। তবে এখন আর মদ নয়- বিভিন্ন চিত্তবিনোদন সামগ্রী ক্রয় করে হৃদয়ের শূন্যতা দূর করার চেষ্টা চালালাম।

এ সময়ের ভীষণ আবেগপ্রবণতা হেতু আমি বিবাহজীবনকে সামান্যের জন্য ধ্বংস করে ফেলি। দীর্ঘ ৬ মাস আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এবার আমি হাটুগেড়ে যে কেউই উপরওয়ালা ছিলেন, তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকি। প্রার্থনা করতে থাকি এই বলে: আমাকে জিসাস, বুদ্ধা কিংবা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো সাহস দান করুন।

উক্ত বার্তাবাহকদের সম্পর্কে এটুকুই শুধু জানতাম যে, তাঁরা ভীষণ ব্যক্তিগত ট্রাজেডির শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও তাঁরা বিজয়ী হন। এ বিজয়ের পেছনে ছিলো, অপরদেরকে মুক্ত করার জীবনভর মিশন। আমার এ প্রার্থনার (আজ আমি ইসলামী শব্দ দু’আ বলতে পারি) জবাব পেলাম। আমার স্ত্রী ফিরে আসলেন। এটা আমার নিকট ছিলো একটি অলৌকিক ঘটনা। আমি জানতাম, উপরওয়ালা কেউ একজন আছেন! এবার তাঁকে খুঁজে পেতে আকুল হয়ে ওঠলাম।

অনুসন্ধানের শুরু

প্রথমেই আমি পড়তে লাগলাম ক্যাথলিক ক্যানন[১] (ধর্মগ্রন্থাদি)। সেন্ট অগাস্টিনের ‘কনফেশন’, থোমাস কেমপিসের ‘দ্যা ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট’ [এটি আমার মায়ের প্রিয় বই] ইত্যাদি পাঠ করে দেখলাম এগুলো বেশি শুষ্ক ও দুর্বোধ্য। এরপর আমি অধ্যয়ন করি খ্রিস্টান অতীন্দ্রিয়বাদী ঐহিত্যমূলক গ্রন্থাদি- যেমন, সোরেন কির্কিগার্ড, সাইমোন ওয়েল এবং অ্যান সেক্সনের কনফেশন কবিতাসমূহ ইত্যাদি। এটাই ছিলো বিরাট ইউ-টার্নের কারণ।

এ পর্যন্ত আমি যা করছিলাম তা ছিলো ‘যুক্তির চশমায় ধর্মসন্ধান’। অথচ এ পর্যন্ত (খ্রিস্টবাদের ওপর) যা পাঠ করলাম তাতে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে, গডকে পাওয়ার কেনো যৌক্তিক রাস্তা নেই। অ্যান সেক্সন বলেন, “প্রভুর দিকে ভয়াবহ দাঁড় টানা!”।

এরপরও, মৌলবাদশূন্য খ্রিস্টবাদী অতীন্দ্রিয়বাদীদের দ্বারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। নিজেকে অন্ধভাবে ‘ক্রাইস্টের’ নিকট আত্মসমর্পণ করলে- তিনি গডের পুত্র হয়ে থাকলেও, আমাকে পুনরায় নিয়ে যাবে ঐ সংকীর্ণ অনুমিত বিশ্বাসে। আমার জীবনকে কীভাবে পুনঃকাঠামোযুক্ত করবো তার কোনো দিক-নির্দেশনা এতে নেই। হ্যাঁ, সফল স্বামী, ভার্সিটির প্রফেসর কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে অশান্ত, নিরাপত্তাহীন ও ভীত-সন্ত্রস্ত এক ব্যক্তি, যে জীবনের স্বাদ নিতে অপারগ- সে তো আমি!

অবশেষে নব্বুই দশকের মাঝের দিকে আমি ক্রয় করলাম মুহাম্মদ পিকতালের অনূদিত বিখ্যাত ‘দ্যা মিনিং অব দ্যা কুরআন’। এটা ক্রয় করার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামের ওপর আমার হিস্টোরি লেকচারের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সহায়তা পেতে। আমি এটি পাঠ করার সুযোগ পেলাম না কিন্তু। এরপর, ১৯৯৯ সালে ক্লিভল্যান্ড থেকে মায়ামি ভ্রমণে যাই। কোনো অদৃশ্য ইশারায়, আমি উক্ত কুরআনের অনুবাদগ্রন্থটি সাথে নিলাম। বিমানের সীটে বসে পাঠ করতে থাকি। আমার মনে পড়ছে, পাশের সীটে বসা একজন নারী

---

[১] খ্রিস্টান ক্যাথোলিক চার্চের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আইন-কানুন। পৃথিবীর অধিকাংশ চার্চ এসব আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী পাঠ করছেন?" এক ধরনের রূঢ়ভাবে জবাব দিলাম, "কুরআন"। তিনি আমার প্রতি হতবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম, "মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ"।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী তাদের একজন?"

আমি জবাব দিলাম, "না। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের ওপর আগ্রহশীল- এই যা।"

দীর্ঘ দুই ঘণ্টার বিমানযাত্রার সময় আমি অর্ধেক পাঠ করে নিলাম। বাকি অর্ধেক পাঠ করে শেষ করি আমার পিতা-মাতার বাড়িতে থাকাবস্থায়। আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুললো যে, এটা এমন একটি গ্রন্থ যেখানে মানবজীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু বিদ্যমান! সুদ থেকে তালাক ও মহিলাদের অধিকারপর্যন্ত এতে বর্ণিত হয়েছে। সকল ধর্মেরই দাবি- এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কিন্তু একমাত্র ইসলাম এ দাবি বাস্তবে পূরণ করেছে।

আমি এবার নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি: ক্যাথলিকরা কী তাদের দিবস শুরু করে প্রার্থনার মাধ্যমে? বৌদ্ধবাদ কী কথার খেলা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু?

আমার অন্তর থেকে হঠাৎ এক আওয়াজ বুলন্দ হলো: "আমি তো এটাই হতে চাই- এখন থেকে হবোও- একজন মুসলমান।"

সভ্যতার ইতিহাসের লেকচারকালে আমি বলেছি, পৃথিবীর সকল ধর্মের তুলনায় ইসলাম হচ্ছে সর্বাধিক গণতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী। এটা পার্থক্য করে না কাউকে তার কৃষ্টি, সামাজিক অবস্থান, জাতীয়তা, বর্ণ কিংবা লিঙ্গের ওপর। মানুষের মূল্য নির্ভরশীল তার ঈমানের স্তরের ওপর। এ প্রথমবারের মতো এসব ব্যাপার আমাকে ভাবিয়ে তুললো। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য এখন যেটুকু বাকি ছিলো তাহলো কোনো একটি বিশেষ ঘটনার।

ক্রান্তিক্ষণ

ব্রাজিলের রিককাইফ শহর, ২০০০ সাল। আমি এখানে একটি কনফারেন্সে যোগ দেই। এতে যোগদানকারী সকল পণ্ডিত ছিলেন ব্রাজিলের ওপর বিশেষজ্ঞ। পাঠের জন্য আমি সাথে নিয়ে আসি সুফি কবিতা ও প্রার্থনার একটি বই। আমার 'আধ্যাত্মিক' অনুসন্ধানের দিনে আমি এটি ক্রয় করেছিলাম কিন্তু পাঠ করে শেষ করি নি। হোটেল কক্ষে থাকাকালে শেষ পর্যন্ত এটি পাঠ করে শেষের পৃষ্ঠায় আসলাম। এরপর এটি ব্যাগে রেখে দিলাম। ঐদিন শহরের সমুদ্র সৈকতের ওপর সন্ধ্যেবেলা হাটার সময় হঠাৎ উক্ত সুফি বইয়ের কথা আমার মনে পড়লো। অন্তরে আওয়াজ উঠলো: "আমি এটাই হতে চাই- এখন থেকে আমি হয়ে যাবো একজন মুসলমান!"

কনফারেন্স থেকে ইউএস-এ ফিরে একজন স্থানীয় মুসলমানকে খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হই। কিন্তু কীভাবে করবো? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে 'ইসলাম' শব্দের খোঁজ নেবো কী? হঠাৎ মনে পড়লো, লাতিন আমেরিকার ওপর ক্লাস করতে যেয়ে একজন ছাত্রের সাথে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। আফ্রিকান-আমেরিকান এ যুবকের নাম ছিলো মূসা। সে ছিলো একজন অল্পভাষী কিন্তু খুব আন্তরিক মুসলমান। আকরন এলাকার বখাটে যুবকদের সহায়তায় সে তার অবসর সময় কাটাতো। সে একদা বলেছিলো, আকরন এলাকায় একটি ছোট্ট মসজিদ আছে। সেখানে আমাকে সবাই স্বাগত জানাবে।

ইন্টারনেটে সার্চ করে আকরনের সেই মসজিদের ঠিকানা জেনে নিলাম। পরদিন জুমুআবার। বৃহস্পতিবার রাতে আমি হাটুগেড়ে বসে প্রভুর দরবারে আবদার জানালাম: যা আমার জন্য উত্তম সেদিকে আমাকে নিয়ে যাও। আমি কী উম্মাহর সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য ছিলাম? কীভাবে আমাকে গ্রহণ করা হবে- যেখানে লাতিন মুসলমানদের সংখ্যা এতো কম? প্রার্থনার সময় এক পার্যায়ে চোখ থেকে পানি গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। এ অভিজ্ঞতা ছিলো নতুন। আমি জানতাম, আমার এ জীবনে একটা কিছু নাটকীয় পরিবর্তন আসছে। শীঘ্রই আসছে।

পরদিন শুক্রবার। আমি কেন্ট থেকে আকরনে ড্রাইভ করে যাই জুমুআ নামাযে শরীক হতে। ধীরে ধীরে মসজিদের দুতলায় যেয়ে উপস্থিত হলাম। নামাযের স্থানে বিভিন্ন ধনরের মানুষের মুখ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সেখানে ছিলেন, আফ্রিকান-আমেরিকান, দক্ষিণ এশিয়ান, অনেক আরব এবং একজন যাকে মনে হচ্ছিলো ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গ! ইমামকেও আরবদেশের মনে হচ্ছিলো। তিনি এক অনলবর্ষী অথচ নিয়ন্ত্রিত খুতবা দিলেন। কী বিষয়ের ওপর তিনি খুতবা দিয়েছিলেন তা ঠিক মনে পড়ছে না- তবে বার বার মনে পড়ছে তাঁর এ কথাগুলো: "ও হে আল্লাহর বান্দাগণ!"। এ কথাটি আজো আমার কানে বাজতে থাকে বার বার।

কে চায় 'আল্লাহর গোলাম' হতে? আমি সেদিন আমার মধ্যে জবাব পেয়েছিলাম: যারা দৃঢ়, আন্তরিকভাবে প্রশান্ত- এ কারণে যে, তারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে। যা কিছু ইচ্ছে আল্লাহ তাদের নিয়ে তা-ই করবেন- এতে তারা সম্পূর্ণরূপে রাজি-খুশি।

পরের সপ্তাহে আমি ঐ সমজিদে ফিরে আসলাম। জুমুআর খুবতা ও নামায শেষে আমি একজন ভাইকে অনুরোধ জানালাম অনেকটা লজ্জাবণত হয়ে: "আপনি কী অনুগ্রহ করে আমার শাহাদাতের বাক্য পাঠের সাক্ষী থাকবেন?" আমি অবাক হলাম যখন তিনি সবাইকে ডাক দিলেন। সকলে আমার চতুর্দিকে বসে গেলেন। ইমাম সাহেব শাহাদাতের বাক্যটি পাঠ করালেন। এরপর বললেন: "আপনার জীবনে ইতোপূর্বে যতো পাপ হয়েছে তা সবই এ মুহূর্তে মওকুফ হয়ে গেছে! কাল কিয়ামতের দিন আমরা সবাই আপনার জন্য সাক্ষী দেবো যে, আপনি আমাদের সম্মুখে পবিত্র কলিমা শাহাদাতের বাক্যটি পাঠ করেছেন।" ঐ দিনই 'জুলিও সিজার পিনো' মারা যায়- এবং জন্ম নেয় 'আসাদ জিব্রিল পিনো।'

বাধ্যতামূলক গোসল সেরে মাতা-পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তবে টেলিফোনে নয়- আমার এ বিরাট আনন্দের কথাটুকুর জন্য মুখের ভাষা যথেষ্ট নয়। আমি তা-ই কলম হাতে নিয়ে লিখতে লাগলাম। দীর্ঘ এ পত্রের শেষের দিকে সূরা ফাতিহার স্প্যানিশ অনুবাদও লিখে দিলাম। তিন বছর পরও কিন্তু আমার মা-বাবা বুঝতে পারেন নি কোন্ কারণে আমি মুসলমান

হয়েছি? তবে তারা খুব সহনশীল। একই কথা কিন্তু ভার্সিটির কিছু সহকর্মীদের ক্ষেত্রে সত্য নয়। তারা ব্যাপারটি সহনশীলভাবে নেয় নি। ফিলিস্তিনে যখন গণহত্যা হয় ২০০১ সালে, আমি তখন প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ জানাই। এর ফলে সহ্য করতে হয়েছিলো অপবাদ, মানসিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকি। তবে এসব নির্যাতনের শিকার হওয়া আমেরিকার মুসলমানদের জন্য নতুন কিছু ছিলো না।

আমার ঈমানের আগে এখন আর কিছুই আসে না। বিশ্বাসীদেরকে যেসব নিয়ম-নীতি মানতে হয় সেগুলোকে আমি সর্বাধিক বেশি পছন্দ করি। এরই মাধ্যমে আমরা একটি উম্মাহে পরিণত হয়েছি। নিজেকে সর্বদাই একজন নীতিবান ব্যক্তি হিসেবেই জানতাম। তবে ইসলাম আমাকে এটা শিক্ষা দিয়েছে যে, বাস্তবে আমার নীতি-নৈতিকতার ভিত ছিলো ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, মুসলমান হওয়ার আগে আমি নিজেকে বলতাম, "আমাকে ঐ সিনেমা হলে ঠিক ৭টার সময় উপস্থিত হতে হবে। আমাকে প্রথম সারিতে বসতে হবে।" কিন্তু আজ ফযরের নামায শেষে আমি ভাবি, "ইসলামের খিদমাতে আমি আজ কী করতে পারি? অতি ক্ষুদ্র হলেও কিছু করার প্রয়োজন। হতে পারে স্থানীয় কংগ্রেসম্যানকে টেলিফোন করে অনুরোধ জানানো, যাতে করে বিদেশি আমার কোনো মুসলমান ভাই ভিসা পেতে বেগ না পায়। কিংবা নাইজেরিয়ার কোনো মসজিদে টাকা প্রেরণ করা।

পেশাদারিত্বের দিক থেকে আমি সংলাপও করে যাচ্ছি। আমার বর্তমান গবেষণা হচ্ছে উনিশ শতকের ব্রাজিলে মুসলিম ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রার ওপর অনুসন্ধান। সভ্যতার ইসিহাসের ওপর ক্লাস যা থেকে আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার স্পৃহা লাভ করেছিলাম, তাতে আমি এখন সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্যের ওপর আলোচনাও যুক্ত করেছি। এছাড়া সময় সময় ফিলিস্তিন থেকে আগত অতিথি বক্তাদেরও সুযোগ দিয়েছি। আমার ছাত্রদের প্রায় সকলেই ক্লাসে এসব আলোচনার প্রতি আগ্রহশীল। কেউ কেউ এটাও অনুরোধ জানিয়েছে, ইসলামের ইতিহাসের ওপর আলাদা ক্লাস শুরু করার জন্য।

আমার জাহিলী যুগে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো আমার পরিচিতি- আমি বলতাম: কিউবান কিংবা কিউবান-আমেরিকান বা এমনকি আমেরিকান। কিন্তু এখন, অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু বলবো: মুসলমান। তারা যদি এতেই সন্তুষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ চাইলে তাদেরকে আমি জীবনের অত্যাশ্চর্য এ কাহিনী শুনাতে পারি- কীভাবে একজন কিউবান ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।[২]

[২] https://www.quora.com/Whats-your-story-of-converting-to-Islam

লানদিসার আত্মকথা

প্রাক্তন খ্রিস্টান - দক্ষিণ আফ্রিকা

ভালো খ্রিস্টান থেকে উত্তম মুসলিমা

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”

উপরোক্ত পবিত্র শাহাদাতের বাক্য যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া কেনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, বিশ্বাস করতে যদি আপনি আমাকে ৭ বছর পূর্বে বলতেন তাহলে আমি কখনো করতাম না।

বড় হয়ে বেড়ে ওঠার সময় আমি একজন ভালো খ্রিস্টান মেয়ে ছিলাম। আমি নিয়মিত বাইবেল পাঠ করতাম, উপাসনা বৈঠকে যোগ দিতাম- এমনকি, আমার নন-কর্মী খ্রিস্টান মা-বাবাকে জোর করে বলতাম, রোববার দিন আমাকে চার্চে নিয়ে যেতে।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই তখন আমার একাংশ বেড়ে ওঠা থেকে বিরত হয়ে যায়। আমি মনে করলাম, জীবনে আমার কোনো গডের প্রয়োজন নেই। বাইবেল পাঠ থেকে বিরত হলাম। চার্চেও যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

এর কিছুদিন পর আমার বয়স যখন ২৩ তখন আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হলো একটি চার্চে। মাত্র ছয় মাস পর কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে গেলো। আমি ভেঙ্গে পড়ি এবং এজন্য দোষ চাপিয়ে দিই গডের ওপর।

তবে ডিবোর্সের কয়েক বছর পরই এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়- তিনি ছিলেন একজন মুসলমান। আমাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করলেন। কিন্তু আমি মানলাম না। ধার্মিকতার প্রতি আকর্ষণ আমার মাঝে ছিলো না। আমার জীবনে কোনো গড থাকবেন- তা আমি মেনে নিতে পারি নি।

কিন্তু আরো বছরখানেক পর এক বন্ধু ফেইসবুকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলো। এতে কানাডার একজন ইয়াহুদি পুরুষ কিভাবে ইসলামে দীক্ষিত হলেন তার বর্ণনা এসেছে। মুসলিম সুফিদের একটি মসজিদে প্রবেশ করে ঐ ইয়াহুদি ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ঐ মসজিদে প্রবেশ করে বুঝতে পারলেন আমার স্থান এখানেই- এই সুফিদের সাথে। তাসাওউফ বা সুফিতত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিকতার নাম। সুফিরা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভকে কঠোরভাবে অনুসরণ করেন ও নিয়মিত জিকির-মুরাকাবায় অভ্যস্থ থাকেন।

উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করার পর আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সুফিদের তৎপরতা কোথায় আছে সে অনুসন্ধানে লেগে যাই। আমি এদের উপস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকেই জানতান। এছাড়া ধ্যান বা মেডিটেশন ছিলো আমার এক পছন্দনীয় বিষয়। বেশ কিছুদিন অনুসন্ধানের পর আমি একটি ই-মেইল ঠিকানা পেলাম। সাথে সাথে অনুসন্ধানমূলক একটি পত্র লিখে প্রেরণ করলাম। আমি ভাবলাম, এর কোনো জবাব পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

তবে কিছুদিন পরই কিন্তু ফয়সল নামক এক ব্যক্তি ফোন করে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তার ওখানে ভ্রমণে যেতে। আমি শঙ্কিত থাকাসত্ত্বেও সাহস করে সিদ্ধান্ত নিলাম ভ্রমণে যাবো। দেখি ফয়সল সাহেব কী বলতে চান?

ফয়সল সাহেব, যেমনটি বয়স্ক ভেবেছিলাম তা কিন্তু ছিলেন না। তিনি কোনো 'ঘূর্ণনরত' দরবেশও নন। আমি এতে কিছুটা হতাশ হলাম। তবে তিনি ও তাঁর পরিবারের সাবাই 'নকশবন্দিয়া' তরিকা অনুসরণ করেন। এ তরিকায় মানবদেহে কয়েকটি লতিফা থাকার কথা বলা হয়। আমাকে নিয়ে একটি মেডিটেশন করা হলো লতিফায়ে কলবের দিকে খিয়াল করে। আমি এতে কিছুটা হালকা প্রভাব অনুভব করি- কিন্তু তখনও কিছুই সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি। তবে আমি নশ্চিত ছিলাম যে, নিরাপদে ইসলাম সম্পর্কে জানার একটি স্থান মিলে গেছে।

আমি মেডিটেশন করতে থাকি। কোনো কোনো সময় এর প্রভাবে আমি কাঁদতে থাকি- কেনো, তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এরপর ফয়সল ও তাঁর

মেয়ে নাজরিনকে বার বার দেখতে গিয়েছি। তবে ঠিক কী আমি চাচ্ছিলাম তা আমি মোটেই বুঝতে পারি নি।

এরপর ২০১৭ সালে সিদ্ধান্ত নিলাম রামাদ্বানে মুসলমানদের মতো উপবাস করবো। দেখি এর দ্বারা কোনো দিক-নির্দেশনা মিলে কী না। পুরো মাসব্যাপী উপবাসের পরও কিন্তু আমি কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। তবে ইসলামের প্রতি সামান্যতম টান জন্মালো মাত্র। এবার ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বেশি থেকে বেশি পড়াশুনা শুরু করি। যেনো অপেক্ষায় ছিলাম সে-ই তীর এসে আমার অন্তরে কবে বিদ্ধ হবে।

ফিরে এলো আরেক রামাদ্বান। এবারও উপবাস করলাম। কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতায় তখনও ভুগছিলাম। তখনও বসা ছিলাম বেড়ার মধ্যে। যতোবারই নাজনিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে- আমার সিদ্ধান্ত কী? ততোবারই তাকে ইতিবাচক কোনো উত্তর দিতে পারি নি। তবে মেডিটেশন আমলটি ছাড়লাম না।

এরপর ২০১৯ সালের রামাদ্বান মাসের কয়েকদিন পূর্বে এক রাতে আমি গভীর ধ্যানস্থ অবস্থায় বুঝতে পারি 'আল্লাহ' সত্যিই একজন আছেন। এর অর্থ এ নয় যে, অতীতে তিনি নেই বলে মনে করেছি- না, বরং তখনও আমার মন থেকে সন্দেহ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। এবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমার এ শক্তিশালী ধ্যান আসে, যখন আমার এক মুসলিমা বান্ধবী আমাকে সঠিকভাবে উপাসনার উপদেশ দেয়। এরপরও আমি উপাসনা সঠিকভাবে করতে পারি নি। কিন্তু এবারকার ধ্যানের মধ্যে আমি খুব বেশি করে নিজের নফসের দিকে খিয়াল করেছি। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি। যতোবারই নিজের নফসের দিকে খিয়াল করে ধ্যান করেছি ততোবারই এ অনুভূতি আমার মাঝে জাগ্রত হয়েছে।

আমি কুরআন পাঠে অভ্যস্ত হলাম। যে সংবাদ আমি বার বার উপলব্ধি করছিলাম তা ছিলো এই: আল্লাহ তা'আলা যতো নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এই একই সংবাদ দিয়ে। যারা তা গ্রহণ করেনি, নিজেদের দোষোর কারণেই করে নি।

আমি যখন ২০১৯ সালের ১৮ মে ফয়সল সাহেবের বাড়িতে আসি, তখন ভাবি নি যে, আমি বলবো- হ্যাঁ, আমি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে এসেছি। কিন্তু আমি নিজের অজান্তেই তা-ই বললাম, যখন নাজরিন জিজ্ঞেস করলো, আমার আগমনের কারণ কি ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ! এটাই ছিলো আমার মুখ থেকে উচ্চারিত সর্বোত্তম কথা।

শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। পরিবারের সবার সম্মুখে বেশ সন্ত্রস্থ অবস্থায় শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করলাম। হয়তো বা শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করি নি- তবে আমার নিয়তের মধ্যে কোনো ভিন্নতা ছিলো না। পরে নাজরিনের পিতা বললেন, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ উচ্চারণের সময় আমার মুখমণ্ডলে নূরের আভা ফুটে ওঠেছিলো।

ইতোমধ্যে ঐ দিনের ঘটনা ৫ মাস অতীতে চলে গেছে। আমি মনে করিনা, খুব উত্তম একজন মুসলিমায় পরিণত হয়ে গেছি। কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি এটাই ভাবি, প্রথম মুসলমানরা তো একদিনে সবকিছু শিখেন নি। এটি একটি প্রক্রিয়া। যদিও এ ভ্রমণের শুরু হয়েছিল সে-ই ২০১৬ সালে, অবশেষে আমার হৃদয়ে বিরাজ করছে প্রশান্তি এজন্য যে, আমি এখন ইসলাম ধর্মে পুরোপুরি দীক্ষিত হয়েছি। আমি আমার বাড়িতে ফিরে এসেছি।[3]

[3]https://www.news24.com/news24/columnists/landisa/landisa-my-story-of-converting-from-christianity-to-islam-20191031

শরীফা কার্লো

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

খ্রিস্টবাদ থেকে ইসলামের ছায়াতলে

আমার ইসলামে প্রত্যাবর্তনের গল্প হচ্ছে একটি পরিকল্পনার গল্প। আমি পরিকল্পনা করেছি। যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা পরিকল্পনা করেছে। আল্লাহ পরিকল্পনা করেছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম পরিকল্পনাকারী। আমি যখন সবেমাত্র টিনেজ বয়সে পদার্পণ করি, তখন একদল লোকের দৃষ্টিতে পড়ি যাদের কার্যক্রম ছিলো খুব অশুভ। তারা ছিলো- আর সম্ভবত এখনো আছে, মুক্ত একদল সংঘবদ্ধ মানুষ যাদের সবাই সরকারী কর্মকর্তা। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করাই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। আর সেটা হচ্ছে ইসলামকে ধ্বংস করা! তবে এটি কোনো জানা সরকারী দল ছিলো না, তারা শুধুমাত্র আমেরিকান সরকারে নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগাচ্ছিলো তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে।

এ দলের একজন সদস্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি আমাকে একজন স্পষ্টভাষী, প্রণোদনী ও নারী অধিকার ভাষ্যকার হিসেবে সনাক্ত করেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর পড়ালেখা করো- বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর- তাহলে আমি তোমাকে মিশরের আমেরিকান দূতাবাসে ভালো কোনো কাজ দেবো। তার উদ্দেশ্য ছিলো সেখানে যেয়ে নিজের কাজের পজিশনকে ব্যবহার করে মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে আলাপ

করা এবং নারী অধিকার আন্দোলে গতি সঞ্চার করা। আমি ভাবলাম, এটা তো একটি উত্তম কাজ। আমি মুসলিম মহিলাদেরকে টিভিতে দেখেছি। আমি জানতাম তারা গরীব, নির্যাতিত দল; আমি চাচ্ছিলাম তাদেরকে বিংশ শতকের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে।

এরূপ নিয়ত করে আমি কলেজে যেয়ে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করি। উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের অংশ হিসেবে আমাকে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ইতিহাসের উপর পাঠ গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয় কীভাবে উক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করবো আমার কাজে। আরো শিক্ষা দেওয়া হয় কীভাবে শব্দকে মোচড়াতে হবে- কীভাবে অর্থ পরিবর্তন করে বলতে হবে- যেভাবে বলার প্রয়োজন। তাদের বিশ্বাস-আমলে গড়মিল আছে, এরূপ কথা বুঝিয়ে বলার মতো শক্তিশালী হাতিয়ার আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এসব ব্যাপার শিক্ষা করতে যেয়ে আমার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম নিলো। ভাবলাম, ইসলামের শিক্ষাই তো সবার জন্য উত্তম! এটা সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পাঠ করছিলাম তা তো সত্যিই ভয়ঙ্কর। সুতরাং এ প্রতিক্রিয়াকে সামাল দিতে আমি একই সময় খ্রিস্টবাদের ওপর গবেষণা শুরু করি।

ক্যাম্পাসে থিওলজির ওপর হারভার্ড পিএইচডি একজন প্রফেসর ছিলেন। আমি তার কাছে খ্রিস্টবাদের ওপর পড়াশুনা শুরু করলাম। ভাবলাম, একজন উত্তম ব্যক্তির কাছে শেখার সুযোগ পেয়েছি। কথাটি ঠিক ছিলো- কিন্তু কারণটি আমার ধারণামতো ছিলো না। বুঝতে দেরি হলো না যে, এই প্রফেসর সাহেব ছিলেন একজন ইউনিট্যারিয়ান খ্রিস্টান। তিনি ত্রিত্ববাদ বা জিসাসকে গড হিসেব মানেন না! তার কাছে জিসাস ছিলেন একজন প্রফেট- এই যা।

প্রফেসর সাহেব তার ইউনিট্যারিয়ান (একত্ববাদী) খ্রিস্টবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রিক, হিব্রু ও এ্যারামিক বাইবেলকে ব্যবহার করেন। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক বাইবেলে কোথায় কোথায় রদবদল করা হয়েছে। আমি যখন এই ক্লাসের পাঠক্রম শেষ করি তখন আমার মধ্য থেকে ধর্মবিশ্বাস (দ্বীন) বলতে যা ছিলো সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমি তখনও 'ইসলাম' গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে ছিলাম।

সময় যেতে লাগলো। নিজের জীবনকে উত্তমরূপে গড়ে তুলতে আমি পড়ালেখায় মনোযোগী হলাম। আমি আরো তিন বছর পড়ালেখা করি। এ সময় মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। যাদের আমি প্রশ্ন করতাম তাদের একজন ছিলেন এমএসএ [মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়োশন] সদস্য। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি আমার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণকে অনুধাবন করেন এবং আমাকে ইসলাম সম্পর্কে আরো জ্ঞানবান করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যে সময়ই সুযোগ পেয়েছেন তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়েছেন।

একদিন এই এমএসএ সদস্য আমাকে জানালেন একদল সুশিক্ষিত মুসলিম আমাদের এলাকায় ভ্রমণে এসছেন। তার ইচ্ছে ছিলো ওদের সঙ্গে দেখা করতে আমাকে নিয়ে যাওয়া। আমি সম্মত হলাম। ইশার নামাযের পর আমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাতে যাই। একটি কক্ষে যেয়ে দেখলাম সেখানে অন্তত ২০ জন পুরুষ ছিলেন। তারা সবাই আমাকে বসার জন্য জায়গা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন! পাকিস্তানী সেই প্রধান অতিথির সম্মুখে আমাকে বসানো হলো। মাশাআল্লাহ! বুঝতে পারলাম এই ব্যক্তি খ্রিস্টধর্মের ওপরও বেশ

জ্ঞানবান। বাইবেল ও কুরআনের বিভিন্ন পংক্তি (আয়াত) নিয়ে ফযরের পূর্ব পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম। তবে এ মুহূর্তে প্রজ্ঞাবান এ ব্যক্তি একটি কাজ করলেন যা ইতোমধ্যে কেউ করে নি। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি!'

দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ আমি অনুসন্ধান ও গবেষণা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে একদিনও ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে দাওয়াত দেয় নি। আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যুক্তিতর্ক করে বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে- এমনকি সময় সময় মানহানির চেষ্টা হয়েছে- কিন্তু কেউ কোনোদিন বলে নি, "ইসলামের দরোজা তোমার জন্য খোলা আছে- এসো প্রবেশ করো সন্তুষ্টচিত্তে।"

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করুন। যখনই ঐ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত দিলেন তখনই আমার অন্তরাত্মা নূরান্বিত হয়ে ওঠলো। আমি বুঝতে পারলাম, সময় এসে গেছে। আমি জানতাম এটাই সত্য! আর এখনই আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে খুলে দিলেন। আমি প্রাণ খুলে উচ্চারণ করলাম, "আশহাদুআল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াআশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।" সাথে সাথে পবিত্র এ কলিমার ইংরেজি অনুবাদও বললাম।

আল্লাহর কসম! শাহাতাদের বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে আমি অনুভব করলাম বিরাট এক বোঝা আমার বুকের ওপর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে। আমি শ্বাস-নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম।

যেনো জীবনের এই প্রথম সত্যিকার শ্বাস-নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম! আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এক নতুন জীবন দান করেছেন। একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অবস্থা। জান্নাতে প্রবেশের একটি সুযোগ। আমি প্রার্থনা করছি- হে আল্লাহ! আমার বাকি জীবনকে তোমার আনুগত্যের মধ্যে কাটিয়ে দাও এবং মৃত্যু দিন মুসলমান হিসেবে। আমীন।[৪]

৪ https://www.islamreligion.com/category/63/stories-of-new-muslims/

তিনজন বৃটিশ ভিক্টোরিয়ান নও-মুসলিম

আবদুল্লাহ কুইলিয়াম, লেডি ইভলিন কোবোল্ড ও রবার্ট স্ট্যানলি

ইংল্যান্ড

তখন ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগ। রাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে। বেশ কিছু উচ্চ বংশের শিক্ষিত লোক তখন নিজেদের খ্রিস্টধর্মকে বিসর্জন দিয়ে পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। নিচে আমরা এরূপ তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির গল্প বর্ণনা করবো। ভিক্টোরিয়ান যুগে খ্রিস্টবাদ ছিলো বৃটিশ পরিচয়ের মূলমন্ত্র। কিন্তু এ ব্যক্তিগণ সেটার জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের ছায়াতলে এনে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ কুইলিয়াম - প্রাক্তন খ্রিস্টান

যার চেষ্টায় বৃটেনের প্রথম মসজিদের আত্মপ্রকাশ

জন্মকালে তার নাম ছিলো উইলিয়াম হেনরি কুইলিয়াম। ১৮৫৬ সালে ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মেথডিস্ট খ্রিস্টান হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। লিভারপুল ইনসস্টিটিউশন ও কিং উইলিয়াম কলেজে লেখাপড়া করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সলিসিটর (আইনজীবী) হিসেবে ডিগ্রী নেন। তিনি অপরাধ আইনের ওপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ২৮ বছর বয়সে লিভারপুল শহরের চার্চ স্ট্রিটে প্রাকটিস শুরু করেন। সফল এ আইনজীবীকে মানুষ পরবর্তীতে "লিভারপুলের বেসরকারী এটর্নি জেনারেল" বলে সম্বোধন করতো।

সফল এ বৃটিশ সলিসিটর (আইনজীবী) উইলিয়াম হেনরি কুইলিয়াম সমুদ্রভ্রমণে যান ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। জাহাজের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিলেন। তারা যাচ্ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান মরক্কোয়। একদিন তিনি লক্ষ করলেন, মরোক্কার এই মুসলিমরা জাহাজের একটি খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করছেন। দৃশ্যটি মিস্টার কুইলিয়ামকে ভাবিয়ে তুললো। তিনি নিজে বলেন: "বাতাসের তীব্র গতি কিংবা জাহাজের হেলাদুলায় তারা মোটেই উদ্বিগ্ন ছিলো না। তাদের উপাসনাকালে মুখের ভাব ও ভঙ্গিমা দেখে আমার অন্তরে সাড়া জাগে। বুঝতে পারি তারা তাদের প্রভুর ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখে এবং আস্থাশীল আছে।"

সলিসিটর সাহেব সেই থেকে ইসলামকে জানার জন্য আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। যখন তার বয়স ৩১ বছর, তিনি মরক্কোর টানজিয়ার্সে বেড়াতে যান। সেখানে থাকাকালেই শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তার এ নতুন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলতে যেয়ে লিখেন: "এটা ছিলো যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুভব করলাম যা আমি বিশ্বাস করি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।"

যদিও নিজেদের নাম রদবদলের কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই- এরপরও তিনি নিজের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সুতরাং পরবর্তীতে উইলিয়াম হেনরি কুইলিয়াম হয়ে গেলেন, আবদুল্লাহ কুইলিয়াম।

টানজিয়ার্স থেকে বৃটেনে ফিরে এসে লেগে যান দাওয়াতী কাজে। বৃটিশ দীপপুঞ্জের সর্বত্র তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে ভ্রমণ করেছেন। ইতিহাসবিদরা বলেন, তার প্রচেষ্টায় নিজের শহরে ২০০ এবং আরো ৬০০ ব্যক্তি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিস্টবাদ বিসর্জন দিয়ে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে সুপরিচিত ক'জন হলেন, প্রফেসর নাসরুল্লাহ ওয়ারেন, হাশিম ওয়াইলডি, বরার্ট রশীদ স্ট্যানলি জেপি প্রমুখ।

আবদুল্লাহ কুইলিয়ামের সর্বাধিক বড়ো অবদান ছিলো বৃটেনের প্রথম মসজিদ স্থাপন করা। তিনি লিভারপুল শহরে এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে যুগে লিভারপুলকে বলা হতো "বৃটিশ রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় শহর"। ঈসায়ী ১৮৮৭ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়। লিভারপুল শহরের যে

বিল্ডিংয়ে মসজিদটি ছিলো সেখানে তা আজো আছে এবং মুসল্লিরা এখনও নামায আদায় করেন।

স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯০১) আবদুল্লাহ কুইলিয়াম রচিত 'ফেইথ অব ইসলাম' শিরোনামের পুস্তিকা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ পুস্তিকা পরবর্তীতে ১৩টি ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিলো। রাণী অতিরিক্ত ৬টি কপি তৈরির নির্দেশ দেন তার নিজের পরিবারবর্গকে প্রদানের জন্য। কিন্তু রাণীর এ 'ইসলামাকর্ষণ' সাধারণ লোক ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। কারণ, তাদেরকে ব্রেনওয়াশ করা হয়েছিল এই বলে: ইসলাম একটি হিংস্র ধর্ম!

শাইখুল ইসলাম

রাণী ভিক্টোরিয়ার সমর্থন নিয়ে সে সময়ের উসমানী খিলাফতের সুলতান আবদুল আজিজ (১৮৩০-১৮৭৬) সলিসিটর আবদুল্লাহ কুইলিয়ামকে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের 'শাইখুল ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করেন। এর ফলে মুসলিম সমাজে তার নেতৃত্বের গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও তখনকার নও-মুসলিমরা কিন্তু হিংসাতুর খিস্টানদের নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। প্রতিনিয়ত তাদেরকে মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। সময় সময় তখনকার খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা রাস্তাঘাটে তাদের ওপর ছুড়ে মারতো ইট-পাটকেল, জীব-জন্তুর হাড্ডি ও ঘোড়ার মল ইত্যাদি। শায়খ কুইলিয়াম লিখেছেন: "এ হামলাকারীদের ব্রেনওয়াস করা হয়েছে। তাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, মুসলমানরা খারাপ লোক।"

স্থানীয় লোকদের মধ্যে শায়খ কুইলিয়াম পরিচিত ছিলেন অধিকারবঞ্চিতদের বন্ধু, ব্যবসা-সঙ্ঘের প্রবর্তক ও বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সংস্কারক হিসেবে। কিন্তু তার আইনপেশার বারোটা বাজে যখন তিনি বিবাহবিচ্ছেদ (ডিভোর্স) আকাঙ্ক্ষী একজন নারী মক্কেলকে সাহায্য করতে হাত বাড়ান।

মহিলার স্বামী পরকিয়ায় জড়িত ছিলো। তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। সে যুগে এরূপ কাজ প্রায়ই হতো। কিন্তু কৌশলটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে শায়খ আবদুল্লাহ তার আইনপেশার লাইসেন্স হারান।

শায়খ আবদুল্লাহ লিভারপুর ছেড়ে লন্ডনে পাড়ি জমান। তার উদ্দেশ্য ছিলো, নও-মুসলিমরা যেনো উক্ত ঘটনা হেতু ক্ষতির সম্মুখীন না হন। তিনি নিজেকে আত্মগোপন করতে 'হেনরি ডি লিওন' নামে পরিচিত হন। তবে শায়খ আবদুল্লাহর জীবনীকার প্রফেসর রন গিভসের মতে, বাস্তবে তাকে অনেকেই চিনতেন। উক্ত ঘটনার পর কিন্তু তিনি পাবলিক কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন।

সবকিছুর পরও শায়খ আবদুল্লাহ কুইলিয়াম দ্বীনি কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। বৃটেনের দ্বিতীয় পুরাতন মসজিদ স্থাপনে তার ভূমিকা ছিলো অগ্রগামী। লন্ডন শহরের অদূরে অবস্থিত ওয়াকিং টাউনে এই ছোট্ট মসজিদটি আজো বিদ্যমান আছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সলে। শায়খ আবদুল্লাহ এই মসজিদের টাউন ওয়াকিংয়ের 'ব্রুকউড' কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তিনি ইন্তিকাল করেন ঈসায়ী ১৯৩২ সালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

লেডি ইভলিন কোবোল্ড - প্রাক্তন খ্রিস্টান

যিনি ছিলেন প্রথম বৃটিশ মুসলিম হাজ্জিয়াহ

তাঁর জন্ম হয় ১৮৬৭ সালে স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবোরাহ শহরে। পিতার নাম ছিলো চার্লস এডোলফাস মারে। তিনি ছিলেন বৃটিশ রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত সপ্তম আর্ল অব ডানমোর। মাতার নাম ছিলো লেডি গেট্রিউড কৌক। লেডি ইভলিনের জন্মনাম হচ্ছে লেডি ইভলিন মারে।

বাল্যকাল

লেডি ইভলিনের বাল্যকাল কাটে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স ও মিশরের রাজধানী কায়রোতে। তাঁকে দেখভালের জন্য মুসলিমা মহিলাদের নিযুক্ত করা হয়। লেডি ইভলিন পরবর্তীতে লিখেছেন: “আমি ছোট থেকেই মুসলিমা ছিলাম। তবে শাহাদাতের ঘোষণা আসে অনেক পরে যখন আমার সাক্ষাৎ ঘটে সে যুগের পৌপের সাথে।” তবে শীতকালে উত্তর আফ্রিকার মনোরম পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণেই যে ইসলামের প্রতি তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন তা অবশ্যই সত্য।

ইসলামগ্রহণ

সে যুগে উচ্চ বংশের ব্যক্তিবর্গের জন্য ইসলাম ধর্মের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা তেমন বিরল কোনো ব্যাপার ছিলো না। আর এর পেছনে মূল কারণ ছিলো মুসলিম জনপদে ভ্রমণ। লেডি ইভলিন নিজেই বলেন: “উত্তর আফ্রিকায় থাককালে আমি আরবি ভাষা শিখেছিলাম। আমার আলজেরিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে মসজিদ দেখতে যাওয়া ছিলো অত্যন্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। তখনই অবচেতনভাবে হৃদয়ে আমি ছিলাম একজন ছোট্ট মুসলিমা।”

লেডি ইভলিন লিখেছেন: “পৃথিবীর অসংখ্য সমস্যা সমাধানে একমাত্র ইসলামই উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। একমাত্র ইসলামই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে স্থায়ী শান্তি ও সুখ।” লেডি ইভলিন ১৯১৫ সালে ইতালি ভ্রমণে যান। সেখানে পৌপের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। পৌপ তাকে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি কী ক্যাথোলিক?” তিনি জবাব দিলেন, “আমি একজন মুসলিমা!” এ ঘটনার পরই তিনি প্রকাশ্যে ইসলামগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ৪৮ বছর। তিনি তার নাম পরিবর্তন করেন- তখন থেকে তিনি হয়ে যান লেডি জয়নব কোবোল্ড।

পবিত্র হাজ্জ পালন

লেডি জয়নবের প্রথম স্বামীর মৃত্যু হয় ১৯২৯ সালে। এরপরই তিনি পবিত্র হাজ্জ পালনের নিয়ত করেন। হিজাজ ও নজদ রাজ্যের রাষ্ট্রদূত হাফিজ ওয়াহবার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। তিনি বাদশাহ আবদুল আজিজের নিকট এ ব্যাপারে একখানা পত্র লিখেন।

সে যুগে ইউরোপিয়ান অমুসলিমরা হাজ্জ পালনের নামে মক্কা শরীফ যেয়ে গোয়েন্দাগিরি করতেন। এ কারণে ইউরোপিয়ানদের হাজ্জে গমনের ক্ষেত্রে সৌদি বাদশাহগণ বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তবে লেডি জয়নব নিজেকে একজন মুসলিম নারী হিসেবে পরিচয় দান করায় বাদশাহ তাঁর ব্যাপারে সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। তাই তার জন্য হাজ্জে গমনে আর কোনো বাঁধা থাকে নি।

সুতরাং, লেডি জয়নব কোবোল্ড ইতিহাস সৃষ্টি করেন ১৯৩৩ সালে প্রথম বৃটিশ মুসলিম মহিলা হিসেবে হাজ্জে গমন করে। তাঁর এই হাজ্জে গমনের স্মরণীয় ভ্রমণকাহিনী ‘পিলগ্রিমেজ টু মক্কা’ শিরোনামে একটি গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি ১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেডি জয়নবের এই ভ্রমণকাহিনীর কিয়দংশ মাইকেল উলফ-এর ‘ওয়ান থাউজেন্ড রোডস টু মক্কা’ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

লেডি জয়নবের ডাইরি

লেডি জয়নব একজন ডাইরিস্ট (রোজনামচা লেখিকা) হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তার লিখিত ডাইরির প্রাক কথনের লেখক উইলিয়াম ফেসি বলেন: “লেডি ইভলিন ইসলামের আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষিত ছিলেন। এটাই তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিল।”

মধ্যপ্রাচ্যে থাকাকালে তিনি তার ডাইরিতে ‘ইসলামী কৃষ্টিতে মুসলিম মহিলাদের প্রভাব’ সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। পবিত্র কাবা শরীফের

ওপর জীবনের প্রথম দৃষ্টিপাত ও তাওয়াফের অনুভূতি বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি তার ডাইরিতে লিখেন: "আমরা মসৃণ মার্বেলের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে পবিত্র থেকে পবিত্র আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। কী অপূর্ব সে কালো কিউব (কাবা) দাঁড়ানো আছে স্ব-মহিমায়। কোটি কোটি মানুষের জীবনভর ধ্যান-সাধনার উদ্দেশ্য। আরো কতো কোটি ভাগ্যবান মানুষ ইতোপূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে স্বর্গবাসী হয়েছেন ... ... তাওয়াফ হচ্ছে একটি প্রতীকী কর্ম। একজন কবি বলেন: যেনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের গৃহের চতুর্দিকে চক্কর দিচ্ছে / নিজেকে আত্মসমর্পণের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে / প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি কল্পে কুরবান করে দিচ্ছে তার সবকিছু। হাজ্জযাত্রীরা আত্ম-সমর্পণের নিরাকার চৈতন্যসহ পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন।"

তিনি তার ডাইরিতে লিখেন: "আমাকে প্রায়ই মানুষ জিজ্ঞেস করে, আমি কখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম? উত্তরে আমি শুধুমাত্র এটুকু বলতাম, ঠিক কখন ইসলামের সত্য আমার মাঝে প্রবেশ করেছিলো তা আমি জানি না। কোনো কোনো সময় মনে হয়, আমি সর্বদাই একজন মুসলিমা ছিলাম।"

দাওয়ার কাজে জড়িত

উভয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় মুসলমানগণ বৃটিশদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। একদা বৃটিশ মুসলিম যোদ্ধারা একত্রিত হন ওয়াকিং মসজিদে পবিত্র ঈদ পালনের উদ্দেশ্যে। এ সময় বৃটিশ রাজবংশের দূত হিসেবে লেডি জয়নব ওয়াকিংয়ে যান। এছাড়া তিনি সে সময়ের মুসলিম দায়িদের সাথে ইসলামী দাওয়ার কাজে জড়িত হন। শায়খ আবদুল্লাহ কুইলিয়াম, রবার্ট স্ট্যানলি প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র পৌছে দিতে বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন।

আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ লেডি জয়নব মানুষকে বুঝিয়ে বলতেন, ইসলাম হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ধর্ম, যৌক্তিক ধর্ম। তিনি ছিলেন একজন মৌলবাদী এ্যাংলো-স্কটিশ মুসলিমা। সবাইকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন তিনি

যাকিছু করতেন। মানুষ তার কথা ও কাজের মিল দেখে তার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করতো।

ইন্তিকাল

লেডি জয়নব কোবোল্ড ১৯৬৩ সালে এ মায়াবী পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি অসিয়ত করেন, “আমাকে আমার ওয়েস্টার রস টিলার ওপরে কবর দিও। কবর শিলালিপিতে আয়াতুন নূর থেকে এ কথাটি লিখে রাখবে: আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব।” তখনকার দিনে স্কটল্যান্ডে জানাযা আদায়ের যোগ্য কেউ ছিলেন না। পরিবারের লোকজন ওয়াকিং মসজিদের ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভীষণ বরফের মধ্যে ইমাম সাহেব ড্রাইভ করে স্কটল্যান্ড এসে লেডি জয়নবের জানাযা আদায় করে তাকে সমাহিত করেন। স্কটল্যান্ডের ইনভারনেসের নিজস্ব ওয়েস্টার রস এস্টেটের টিলার উপর লেডি জয়নব কোবোল্ড চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

হাইল্যান্ডে অবস্থিত লেডি জয়নবের গ্লেনসারোন এস্টেটে বসবাসরত শিলালিপিকার অসিয়ত মতো আয়াতুন নূরের প্রাথমিক কটি শব্দ লিখেছিলেন ঠিকই। কিন্তু এজন্য তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। তাকে কট্টর খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা ছুরিকাঘাত করে। অবশ্য বেঁচে যান- কিন্তু ক্ষতদাগ তার শরীর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুছে যায় নি। আল্লাহ তা’আলা লেডি জয়নবের কবরকে নূরান্বিত করুন।

রবার্ট স্ট্যানলি - প্রাক্তন খ্রিস্টান

মৃত্যুর ৮৭ বছর পর জানা গেলো তিনি ছিলেন একজন মুসলমান

'গুপ্ত মুসলিম' খ্যাত রবার্ট রশীদ স্ট্যানলি ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ওয়েলসের কার্ডিফ শহরে। তবে মাত্র ১০ বছর বয়সে তার চাচার খ্রিস্টান-ইয়াহুদি গ্রোসারি দোকানে কাজ করতে তাকে প্রেরণ করা হয় জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে ম্যানচেস্টারের নিকটস্থ আশটন-আন্ডার-লিন শহরে। তার বয়স যখন ১৯ তখন তিনি নিজেই অদূরবর্তী স্ট্যালিব্রিজ শহরে একটি গ্রোসারি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় তিনি চা-পাতা আমদানী-রপ্তানী করে বেশ লাভবান হন।

তখনকার যুগে 'খ্রিস্টান-ইসরাইলী' নামক একটি ধার্মিক ফিরকা ছিলো। নিজের চাচা এই দলের সদস্য হওয়ায় প্রাথমিক জীবনে রবার্ট স্ট্যানলিও এ ফিরকাভুক্ত ছিলেন।

রাজনীতি

রবার্ট স্ট্যানলি স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এ বছর বৃহত্তর ম্যানচেস্টার কাউন্সিলের ইলেকশনে তিনি ডাকিনফিল্ড ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে বিজয়ী হন। এরপর ১৮৬৭ সালে তাকে জাস্টিস অব পিচ (জেপি) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর আরো দুবছর পরে স্ট্যালিব্রিজের স্ট্যাইলি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৮৭১ সালে তিনি স্ট্যালিব্রিজের স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিন হন। স্ট্যালিব্রিজের ভিক্টোরিয়া মার্কেট হল বিল্ডিং কমিটির সদস্য হিসেবেও তার অবদান ছিলো। এ বিল্ডিংটি বর্তমানে স্ট্যালিব্রিজ সিভিক হল নামে পরিচিত। তবে রাজনীতিবিদ হিসেবে তার সুপরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে যখন তিনি ১৮৭৬ সালে ম্যানচেস্টারের স্ট্যালিব্রিজের মেয়র পদে নির্বাচিত হন। সে যুগে একজন সাধারণ মুদি থেকে শহরের মেয়র হওয়া চাট্টিখানি কথা ছিলো না।

সমাজসেবক রাজনীতিবিদ হিসেবে তার অবদানের মধ্যে ইওম্যান হে জলাধার নির্মাণ, স্টামফোর্ড পাবলিক পার্ক গড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

ইসলামগ্রহণ

ভিক্টোরিয়ান এ নও-মুসলিম সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় তারই বংশধর ক্রিস্টিনা লংডেনের লেখা থেকে। তিনি "হিজ ওউন ম্যান- এ ভিক্টোরিয়ান হিডেন মুসলিম" শিরোনামে একটি জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ক্রিস্টিনা লংডেন লিখেছেন: রবার্ট স্ট্যানলি একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি একটি ফান্ড তৈরি করেন ওসব শ্রমিকের জন্য যারা নিজেদের বসের কথামতো ভোট না দেওয়ায় চাকুরিচ্যুত হতেন। তিনি আরো লিখেছেন, রবার্ট স্ট্যানলি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সমসাময়িক নও-মুসলিম আবদুল্লাহ কুইলিয়াম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিভারপুল মসজিদের খবরের কাগজে "বৃটিশ কলোনিয়েলিজম" [বৃটিশ ঔপেনিবেশিকবাদ] বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। এরই সুবাদে স্ট্যানলি শায়খ আবদুল্লাহ কুইলিয়ামের সঙ্গে ১৮৯০ সালে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। অচিরেই শায়খ আবদুল্লাহ কুইলিয়ামের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মিস লংডেন বলেন: "বরার্ট স্ট্যানলি আবদুল্লাহ কুইলিয়াম থেকে ২৮ বছরের বড়ো ছিলেন। সুতরাং তাদের এ বন্ধুত্ব ছিলো পিতা-পুত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের মতো।

দীর্ঘদিন শায়খ আবদুল্লাহ কুইলিয়ামের সঙ্গলাভ হেতু শেষ পর্যন্ত ১৮৯৮ সালে রবার্ট স্ট্যানলি ইসলামগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ৭০ বছর। সেই থেকে তিনি রবার্ট রশীদ স্ট্যানলি নামে পরিচিত হন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার খবরটি তার পরিবার-পরিজন দীর্ঘদিন গোপন রাখেন। নিঃসন্দেহে- এর কারণ ছিলো সে যুগের কট্টর খ্রিস্টানদের ইসলামবিরোধী তৎপরতা। মিস লংডেনের গবেষণা থেকে জানা যায় সে সময় স্ট্যালিব্রিজ শহরে অপর কোন মুসলমান ছিলেন না। যাক, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন পর ১৯৯৮ সালে মিস লংডেনের পিতা কর্তৃক তার সম্পর্কে তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়। তবে রবার্ট স্ট্যানলির বংশধরদের মধ্যে মিস লংডেনের ছোট

ভাই স্টিভেন লংডেন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অংশ হিসেবে তিনি মিশরে লেখাপড়ায় যান। সেখানে থাকাকালে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। তবে তারই পূর্বপুরুষ রবার্ট রশীদ স্ট্যানলিও যে মুসলমান ছিলেন একথা তিনি জানতে পারেন নিজে মুসলমান হওয়ার ৭ বছর পরে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি বলেন: "অবিশ্বাস্যভাবে আশ্চর্য ব্যাপার-তবে বিস্ময়করভাবে আনন্দময় অবশ্যই।"

নও-মুসলিম স্টিভেন লংডেন দাতব্য কাজে জড়িত আছেন। তিনি বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন ও লেবাননে বিভিন্ন সময় দাতব্য কাজ করেছেন।

ইন্তিকাল

মুসলিম হওয়ার পর তাঁর বন্ধু শায়খুল ইউকে শায়খ উইলিয়াম আবদুল্লাহ কুইলিয়াম নিজের প্রতিষ্ঠিত 'লিভারপুল মুসলিম ইনস্টিটিউট' (মসজিদ) কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

রাবর্ট রশীদ স্ট্যানলি, ভিক্টোরিয়ান গুপ্ত মুসলিম ১৯১১ সালে নিজের শহর স্ট্যালিব্রিজে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৩ বছর।[৫]

[৫] https://www.bbc.com/news/uk-england-48069763; https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stanley_(mayor)

নূর আরিসা মরিয়ম

প্রাক্তন শিন্টো - জাপান

ইসলামী চিন্তা-চেতনার সৈন্দর্য আমাকে ইসলামের দিকে নিয়ে যায়

আমরা যখই জাপানের কথা নিয়ে ভাবি তখনই মনে পড়ে 'সুর্যোদয়ের দেশ', জাপানী উত্তম খাবার ও কৃষ্টি, সুন্দর প্রকৃতি, জাপানি ভদ্রতা, উচ্চ প্রযুক্তি, সিন্টু ও বৌদ্ধবাদ ইত্যাদি। কিন্তু কখনই কী জাপানে ইসলাম নিয়ে ভেবেছি? সেখানে অনেক নও-মুসলিম আছেন যেমনটি আছেন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। সুতরাং আসুন, জাপানি একজন নও-মুসলিমাকে আমরা জেনে নিই। তার মুসলিম নাম নূর আরিসা মরিয়ম।

নূর আরিসার জন্ম জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে। সেখানে বেড়ে ওঠার পর বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে মালোয়েশিয়ান স্ট্যাডিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ এর ওপর ডিগ্রী নেন। এখনও বিদেশি ভাষাশিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ থেমে যায় নি। বর্তমানে লন্ডনের একটি আরাবিক ও ইসলামিক স্ট্যাডিজ ইনস্টিটিউটে লেখাপড়া করছেন। আসুন, প্রেশ্নোত্তরের মাধ্যমে নূর আরিসা সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নিই।

প্রশ্ন: ইসলামের সাথে আপনার পরিচিতি প্রথমতঃ কীভাবে হলো?

উ: আমি যখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে মালোয়েশিয়ান স্ট্যাডিজের ওপর অধ্যয়ক করি তখন আমাদের একজন হিজাব-পরিহিতা মুসলিম মহিলা শিক্ষিকা ছিলেন। লেখাপড়ায় থাকতে আমি আরো অনেক মুসলিমের সাক্ষাৎ পাই। আমি তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে আগ্রহী হই। আমি অচিরেই বুঝতে সক্ষম হই যে, ইসলামী চিন্তা-চেতনা সত্যিই চমৎকার। আমি একই সময় বেশ আশ্চর্য বোধ করি এ কারণে যে, যেটাই হোক না

কেনো মুসলমানরা সর্বদাই আল্লাহর জন্য বেঁচে থাকেন এবং সকল প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে করেন।

[*ইসলাম নিয়ে নূরের জানার আগ্রহ হেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ক্লাস করেছেন। তিনি লক্ষ করলেন মালোয়েশিয়ান ও ইন্দোনেশিয়ানরা আরবি শব্দাবলী যেমন "মাশাআল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ" ইত্যাদি ব্যবহার করতে বেশ অভ্যস্ত। তিনি এসব শব্দের সঠিক অর্থ প্রথমে খুঁজে পান নি। সুতরাং তার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানার স্পৃহা জেগে ওঠে।*]

প্র: আপনি যখন মুসলমান হতে সিদ্ধান্ত নেন তখন আপনার পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবীরা কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন?

উ: সবচেয়ে বেশি আঘাত পান আমার মা। তার মেয়ে মুসলমান হতে পারে এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। মানুষ এখন তার মেয়ের দিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাবে, লোকজন হামলা করবে, আমার বিয়ের কী হবে, যেহেতু জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যল্প- এসব ভাবনা তাকে আড়ষ্ট করে ফেলে। তিনি খুব বিভ্রান্ত হন। আমাকে বললেন, 'তুমি আমার মেয়ে নয়!'। এরপর দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেন নি। তবে আমি জানতাম, এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সুতরাং চেষ্টা চালালাম যাতে তিনি আমাকে গ্রহণ করে নেন। আমি চাচ্ছিলাম তাকে এটা বুঝাতে যে, ইসলাম আমাকে আরো উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। সুতরাং নিজের মায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। আর বন্ধুদের ব্যাপার হলো- কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে কোন্ কারণে আমি মুসলমান হয়েছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে খারাপ কিছু প্রকাশ্যে বলে নি। আলহামদুলিল্লাহ!

[*এদিকে নিজের ছোটবোনের সমর্থন পেয়ে তিনি উপকৃত হন। তিনি বলেন, "আমার বোন আমাকে বললো, আমি তোমার জন্য খুশি।" তার এ বোন নিজের মাকেও বুঝাতে চাইলো যে, ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক, সে তো*

এখনও আমার বোন এবং আপনার মেয়ে। কিছুই তো বদলে যায় নি। কিন্তু অনেকদিন পরে শেষ পর্যন্ত নূরের মাতা তাকে মুসলমান হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি নূরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনাও করেন।]

প্র: এখন যেহেতু আপনি একজন মুসলিমা, আপনি কী অনুভব করেন যে আপনার একটি নতুন জীবন শুরু হয়েছে?

উ: মুসলিমা হওয়ার পূর্বে আমি নিরাশ ছিলাম। আমার চিন্তার বিষয় ছিলো শিক্ষাগ্রহণ, কাজ, বিয়ে করা ও সন্তানাদির মা হওয়া। এগুলো ছাড়া এ জীবনে আমার আর কিছুই প্রয়োজন ছিলো না ভাবতাম। কোনো কোনো সময় ভাবতাম সবকিছু বিজর্সন করে দেবো। কিন্তু এখন [মুসলমান হওয়ার পর] আমার চিন্তা-চেতনা বদলে গেছে। আমি অনুভব করি যে, আমার জীবনটি আল্লাহর জন্য এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এরপরও কিন্তু জীবনচলায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মাত্র। আমাকে সবর করে চলতে হবে।

প্র: একজন মুসলিমা হয়ে জাপানী জীবন ও এখনকার বৃটিশ জীবনের মধ্যে আপনি কী পার্থক্য অনুভব করেন?

উ: ইউকের তুলনায় জাপানী মুসলিম কমিউনিটি খুব ছোট্ট। মুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা এখানে (ইউকে-তে) স্বাভাবিক। এ দেশে অনেক বেশি মসজিদ ও হালাল-দোকান, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ কোনো সুপারমার্কেটেও হালাল খাবার পাওয়া যায়। অপরদিকে জাপানে মুসলিম জনসংখ্যা অতি নগণ্য। সেখানে এখনও খুব অল্প ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। তবে আমি সবসময়ই এ ব্যাপারটি ইতিবাচকভাবে দেখি। জাপানের মুসলমানরা বেশি বেশি একে অন্যকে সালাম দেন। এছাড়া জাপানি মুসলমানদেরকে অতি সহজে বন্ধু বানানো যায়।

নামাযের স্থানের স্বল্পতা ও হালাল খাবার প্রাপ্তির অপ্রতুলতা হেতু জাপানী মুসলমানদের বেশ অসুবিধা হয় বটে। তবে, সুখের খবর হচ্ছে এখন

ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত ভিন্নতাকে জাপান অনেকটা গ্রহণ করে নিচ্ছে। বৃহত্তর জাপানী সমাজ নও-মুসলিমদেরও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আল-হামদুলিল্লাহ!

নূরের সাথে আমাদের কথোপকথনের এখানেই শেষ। তিনি জানান, ইউকে-তে পাড়ি জমানোর একটি কারণ হলো আরবি ভাষা, কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন। কারণ তিনি একজন মুসলিম আলিমা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক যুগের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম নূরের মতো ব্যক্তিদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বেশি বেশি জানার সুযোগ করে দিয়েছে অতি সহজে। নূর বলেন, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে তিনি ফেইসবুকের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে নেন ও বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এগুলো শেয়ার করেন। তিনি প্রশ্ন করতেন তার মতো অনুসন্ধানীদের সংখ্যা কেমন আছে? তিনি অবাক হলেন একটু জেনে যে, তার পোস্ট অনেক লোকের দৃষ্টিতে পড়ে যারা তারই মতো ইসলামকে জানা-বুঝার চেষ্টা করছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নূর আরিসা মরিয়ম দাওয়াতী কাজে নিয়োজিন হন। তার প্রচেষ্টায় বেশ কিছু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়ও নিয়েছেন।

নূর আরিসা মরিয়মের আশা জাপান সরকার জাপানী মুসলমানদের স্বীকৃতি দেবেন। মুসলিম নারীদেরকে স্বাধীনভাবে বস্ত্র পরিধান ও হিজাব ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দান করবেন।

আমরা নূর আরিসার জন্য দুআ করি- তাকে যেনো আল্লাহ তা’আলা দুনিয়া-আখিরাতে সফল করেন। আমীন।[৬]

[৬] https://www.mysalaam.com/en/story/the-story-of-this-japanese-woman-who-converted-to-islam/SALAAM09042019061347

জন স্মিথ ও হানান স্যান্ডারকক

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ওয়েলস, ইউকে

অন্তরে জাগ্রত প্রশ্নাবলীর উত্তর পেয়ে আমরা মুসলমান হয়েছি

উভয়ের জন্ম খ্রিস্টান পরিবারে। তবে পরিবারটি তেমন ধর্মীয় ছিলো না। ইউকে'র চারটে দেশের একটির নাম ওয়েলস। জন স্মিথ ও তার স্ত্রী হানান স্যান্ডারকক পরিণত বয়সে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

তারা এখন ঈদের উৎসব করেন- ক্রিসমাস নয়। তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, শূকরের মাংস ভক্ষণ করেন না এবং মদও পান করেন না। হানান ৫১ বছরে পদার্পণ করেছেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে মুসলিমা হওয়ার পর থেকেই তিনি হিজাব পরে আসছেন। তার চারজন সন্তান আছেন। তারা সবাই মুসলমান।

হানান ও তার স্বামী জন মুসলমান হয়ে খুব খুশি। সত্যধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে তারা আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট। তারা বলেন, এরই মাধ্যমে একটি কমিউনিটির সন্ধান পেয়েছেন। একই সময় একটি আন্তরিক বিশ্বাস মিলেছে যা তাদের মনের অনেক প্রশ্নের উত্তর উন্মোচন করেছে।

উভয়ের পরিবারের অন্যান্য সদস্য যদিও তাদের এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু হানান বলেন, তার কিছু বন্ধু-বান্ধবী তাকে বিসর্জন দিয়েছেন ১৯৯৫ সালে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে। মুসলমান হওয়ার পূর্বে তার নাম ছিলো ডোনা স্যান্ডারকক। নব্বুই দশকের শুরুতে একজন যুবতী ডিগ্রীধারী মেয়ে হিসেবে কার্ডিফে আসেন কর্মসংস্থানের অনুসন্ধানে। হানান বলেন, "তখন আমার বয়স বিশ পার হয়েছে মাত্র। অন্তরে আমি সন্ধানী ছিলাম। জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে ভাবতাম। আমি একদা বৌদ্ধদের একটি বৈঠকে যাই- কিন্তু এতে কোনো লাভ হয় নি। আমি বৌদ্ধদর্শনে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।"

কার্ডিফ শহর সবেমাত্র সত্তুর ও আশির দশকের অনিশ্চিত ধূসর দিনগুলো ঝেড়ে ফেলছিলো যখন ইংল্যান্ডের কর্নওয়ালের একটি ছোট্ট গ্রামে জন্ম নেওয়া ডোনা সেখানে আগমন করেন। তখনই কার্ডিফ একটি বহুকৃষ্টির শহরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এখানে বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করতেন- এখনও করেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে সমবয়সী বেশ কিছু মুসলিম যুবক-যুবতীর সংস্পর্শে আসেন।

হানান বলেন, "আমি মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে ক্রমেই আগ্রহশীল হয়ে ওঠি। আমি অনুভব করলাম, তাদের ধর্মের একটি শক্ত ভিত আছে- যা আমারটির (খ্রিস্টবাদের) ছিলো না। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের মতো ততোটা শক্ত আমারটি নয়। তাদের কারো কারো গৃহে যেয়ে ভালো ভালো খাবার খেয়েছি। তারা সত্যিই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সবাই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।"

হানান ১৯৯৪ সালে ইসারাইলে বেড়াতে যান। সেখানকার একটি ফার্মে তার সাক্ষাৎ ঘটে এক ফিলিস্তিনী পরিবারের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে তিনি মুসলিম কৃষ্টি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করেন। তিনি সেখানে যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা-ই তাকে শেষ পর্যন্ত ইসলামগ্রহণে সহায়তা করে। ইসরাইল থেকে কার্ডিফে ফিরে এসে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে দীক্ষিত হন সত্য ও শান্তির ধর্ম ইসলামে। ইসরাইলে থাকাকালে একটি ঘটনা ঘটে। আমরা সেটি তারই ভাষায় শুনি।

তিনি বলেন, "আমি এক বন্ধুর সাথে ফার্ম থেকে বেশ দূরে একটি পাহাড়ের উপত্যকা দিয়ে হাটছিলাম। উভদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানের এ সরু উপত্যকাটি ছিলো খুব গভীর। দুপুরের সময় খুব গরম ছিলো। আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। আমাদের সাথে কেনো মোবাইল ফোন ছিলো না। কিছুদূর পর্যন্ত ঘুরাঘুরি শেষে সাথে থাকা পানিও শেষ হয়ে গেলো। ভীষণ ভয় পেলাম। মনে মনে আমি প্রার্থনা শুরু করি। এরূপ আন্তরিক প্রার্থনা ইতোমধ্যে কখনও করি নি। বললাম, "হে প্রভু! আমাদেরকে রক্ষ করো। এ বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুসলমান হওয়ার প্রতীজ্ঞা করছি। তুমি অনুগ্রহ করো, দয়া করো,

এ বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো!" এই আন্তরিক দুআ শেষে সত্যিই আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহশীল হলেন। আমরা রাস্তা খুঁজে পেলাম।"

ওয়েলসে ফিরে আসার পর ডোনা ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনি বলেন, "আমার এক ইয়েমনী বন্ধুকে সব খুলে বললাম।" তিনি বার বার জিজ্ঞেস করতে থাকেন, "আমি কী ইসলামগ্রহণে আন্তরিক ছিলাম?" এরপর আমি বললাম, "এসো। এক্ষুণি চলে যাবো সাউথ ওয়েলস ইসলামিক সেন্টারে। আর দেরি না- শাহাদাতের পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করার জন্য আমার মন আকুল হয়ে ওঠেছে।"

"সেন্টারের সুপরিচিত মরহুম ইমাম সাহেবের নিজের মাতাও একজন নও-মুসলিম মহিলা ছিলেন। তিনি আমার ইসলামগ্রহণের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমি আমার নাম পরিবর্তন করলাম। তখন থেকেই হানান নামে পরিচিত হলাম। শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে অনুভব করলাম বিরাট এক বোঝা যেনো বুকের ওপর থেকে অপসারিত হলো। ইসলাম আমার মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আমি একটি বৃহৎ কমিউনিটির অংশীদার হলাম। আমি এখন বুরকা পরি। আমি মুসলিমা- এ পরিচিতি প্রদর্শন করে গৌরববোধ করি।"

প্রথমে হানান আলজেরিয়ার এক মুসলিমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন। তিনি এ বিবাহ থেকে চার সন্তান লাভ করেন। এখন তাদের বয়স ২২, ২১, ১৪ এবং ১০। এরা সবাই মুসলমান। তবে দুর্ভাগ্যবশত এ বিবাহ স্থায়ী হয় নি।

যখন ৯/১১ এর ট্রাজেডি ঘটলো ২০০১ সালে তখন হানানকেও অমুসলিমদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। অনেকে তাকে গালি-গালাজ করেছে, ইট-পাটকেল ছুড়ে মেরেছে। এসময় বাধ্য হয়ে বৃটেন ও আমেরিকার অনেক মুসলিম মহিলাদের মতো তাকেও বুরকা পরা সাময়িক বন্ধ করতে হয়েছিল। হানান বলেন, "৯/১১ এর পরে আমি বুরকা পরা বন্ধ করে দিই। আমি জানতাম কিছু মুসলিম মহিলাকে ইউকে ও আমেরিকায় হামলা করা হয়েছে। আমার চারটে ছোট্ট বাচ্চা ছিলো। আমি চাইনি বিপদের সম্মুখীন হতে। তবে বুরকা না পরলেও হিজাব পরা ছেড়ে দিই নি।"

একই সময় কার্ডিফ শহরের জন স্মিথ নামক এক ব্যক্তি মুসলিমা মহিলার সন্ধানে ছিলেন। এর কারণ ছিলো ভিন্ন। স্মিথের জন্ম হয় উত্তর আয়ারল্যান্ডে। তার পিতা ছিলেন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সদস্য আর মাতা প্রটেসস্ট্যান্ট আইরিশ খ্রিস্টান। এগারো সেপ্টেম্বরের হামলার সময় জন পন্টিপ্রিডে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, “৯/১১ ঘটনাই আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছে।”

তিনি আরো বলেন, “সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুসলমান ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম, মুসলমানরা এরূপ মারাত্মক কাজ করে কীভাবে? যুক্তিটা কী? তিনি জবাব দিলেন, “আক্রমণকারীরা মুসলিম ছিলো নামেমাত্র। এরা মুসলমান নয়।” তিনি আমাকে এক জিলদ অনূদিত কুরআন শরীফ দিলেন”।

এ মহান পবিত্র গ্রন্থটি পাঠ করার পর বিদেশ থেকে আগত একজন মুসলিম আলিমের ওয়াজ-মাহফিলে যান এবং সেখানেই ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি বলেন, “আমি মুসলমান হয়েছি, ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই। শাহাদাত হচ্ছে একটি সাক্ষ্যদান মাত্র। তবে এরই মাধ্যমে অন্তরকে উন্মোচন করতে হবে ইসলামের দিকে। এখন মুসলমান হয়ে একটি বৃহৎ উম্মাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আনন্দিত। শিক্ষার শেষ নেই। ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্ম অত্যন্ত সুসমৃদ্ধ।”

পন্টিপ্রিডে কোনো মসজিদ নেই। জন স্মিথ নামাজ পড়তেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসে যেয়ে। সেখারকার ছাত্র না হলেও প্রেয়ার কক্ষটি সবার জন্য উন্মোক্ত থাকায় কোনো অসুবিধা হয় নি। এখন তিনি কার্ডিফে বসবাস করেন। তিনি আল-মানার ও দারুল ইসরা মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করেন।

হানানের সঙ্গে জনের সাক্ষাৎ হয় ২০১৭ সালে। একই বছর তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তারা মুসলিম কিংবা ননমুসলিম কমিউনিটির মধ্যে কট্টরতা পছন্দ করেন না। জন বলেন, “এসব কট্টরপন্থীরা মুসলমানদের জন্য বিরাট সমস্যা। এদের কথাই হেডলাইনে আসে। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি করছে।”

হানান বলেন, "একজন শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ মুসলিম হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। তিনি সালাফি মুসলিমদের সঙ্গে একমত নন। এরা বলে, মুসলমানদের জন্য পশ্চিমা গণতন্ত্রে ভোট দেওয়া বৈধ নয়। এছাড়া আরো কিছু বৈধ ইসলামী কৃষ্টিকে গ্রহণ করে না। হানান এবং জন বলেন, "আমাদের পরিবার-পরিবর্গ মুসলমান হওয়াতে মোটেই অসন্তুষ্ট নন। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। অনেক নও-মুমলিমের ক্ষেত্রে পরিবারই বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।"

হানানের ছোট বোন লিসাও ইসলামগ্রহণ করেছেন। হানানের মা-বাবা কার্ডিফে এসে মেয়েদের সাথে থাকেন। তারাও তাদের মুসলিম নাতি-নাতনিদের সঙ্গে ঈদের আনন্দে মেতে ওঠেন।

হানান ও জন উভয়ে মনে করেন, ইসলাম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতাই হচ্ছে সকল সমস্যার কারণ। এ সম্পর্কে বেশি বেশি প্রচার-প্রচারণা জরুরি। হানান একজন শিক্ষিকা। তিনি বলেন, "আমার ছাত্রদের মধ্যে খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, মুসলিম, পৌত্তলিক ও ধর্মহীন ছেলে-মেয়েরা আছে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।"

হানানের ছোট্ট শিশুরা একই স্কুলে যায়। তিনি এতে আনন্দিত এজন্য যে, বাচ্চারা মুক্তভাবে সবকিছুর ওপর আলাপ-আলোচনা করতে পারে। তারা একে অন্যের বিশ্বাসে ভিন্নতাকে সহজেই মেনে নিতে শেখে। হানানের আক্ষেপ, এরূপ অবস্থা সর্বত্র বিরাজ করলে কতোই না ভালো হতো।

হানান বলেন, "আমি একজন বৃটিশ মুসলিমা এবং এতেই খুশি। প্রাথমিক দিনগুলো ছিলো অস্বস্থিকর ও লজ্জামূখর। কিন্তু এখন আমি হালাল খাবারও পাক করতে পারদর্শী। এটাই আমি।"[৭]

---

[৭] https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/what-its-like-convert-islam-17314845

করিম আবদুল-জাব্বার

প্রাক্তন খ্রিস্টান - বাস্কেটবল খেলোয়াড়, আমেরিকা

আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কারণে

সাত ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন বিখ্যাত এ বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের ইসলামগ্রহণের কাহিনী তার নিজের ভাষায়ই আমরা শুনবো।

আমার জন্মনাম লিউ আলকিন্ডর জুনিওর (জন্মসন: ১৯৪৭)। এখন আমি করিম আবদুল-জাব্বার। লিউ থেকে করিমে পরিবর্তন শুধুমাত্র সম্মাননা ব্র্যান্ড নাম ছিলো না- যেমন, শন কোম্বস থেকে পাফ ডাডি, ডাডি থেকে পি. ডাডি ইত্যাদি। বরং এটা ছিলো হৃদয়, মন ও আত্মার পরিবর্তন। আমার এ পরিবর্তন হচ্ছে আফ্রিকান পূর্বপুরুষদের ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রকাশ।

অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এক ধর্ম থেকে অন্যটিতে দীক্ষিত হওয়া হলো একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার যার মাঝে জড়িত থাকে আত্মচেতনার গভীর নীরিক্ষণ। কিন্তু আপনি যখন সুপরিচিত, তখন ব্যাপারটি হয়ে যায় একটি প্রকাশ্য প্রদর্শনী- যেখানে একক এবং সকলে মিলে জড়িয়ে পড়ে আলোচনা-সমালোচনায়। আর আপনি যখন অন্যের দৃষ্টিতে একটি অপরিচিত ও অপছন্দীয় ধর্মে ধর্মান্তরিত হবেন, তখন ডেকে আনবেন নিজের বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম ও প্রকৃতিস্থতার কঠোর পাবলিক সমালোচনা। আমি এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। মুসলিম হওয়ার চল্লিশ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমার এ সিদ্ধান্তকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে।

উদ্বেগ ও খ্যাতি

আমি তখন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস-এ্যাঞ্জেলস (UCLA) -এর ছাত্র। এ সময় আমার ইসলামের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। আমি তখন বাস্কেটবল খেলায় বেশ সুনাম অর্জন করে নিয়েছি। ফলে জাতীয়ভাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠি। এরপরও ব্যক্তিগত একটি জীবনকে ব্যক্তিগতই রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমি তখনও বেশ স্বল্পবয়স্ক যুবক। হঠাৎ জাতীয়ভাবে সুপরিচিত হওয়াটা মানসিকভাবে গ্রহণ করা ছিলো কঠিন। বিশেষকরে লজ্জাবোধ ছিলো আমার স্বভাব। তবে সময়ে আমি তা কেটে ওঠি। ব্যাপারটি অনুধাবন করতে সমর্থ হই।

আমি অনুভব করতাম যে, লোকজন যে মানুষটি নিয়ে হৈচৈ করছিলো আমি কিন্তু বাস্তবে তা ছিলাম না। আমি বেড়ে ওঠি ১৯৬৬-৬৭ সালের আমেরিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে। সে সময় জেমস মেরেডিথকে মিসিসিপিতে মিছিল করার সময় এরেস্ট করা হয়েছিল, ব্ল্যাক পানথার পার্টি জন্মলাভ করেছিল, থারগুড মার্শালকে প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং ডিট্রয়েটের বর্ণবাদী রায়টে ৪৩ জন প্রাণ হারায় ও ১১৮৯ জন আহত হয়- এরপর ২০০০ বিল্ডিং ধ্বংস করেছিলো জনতা।

আমি বুঝতে পারি যে, লুই আলকিন্ডর- যাকে নিয়ে সবাই চিল্লাচিল্লি করছিলো সে কিন্তু তাদের কল্পনার ব্যক্তি ছিলো না। তারা চেয়েছিলো, আমি হয়ে যাবো ক্লিন-কাট বর্ণ-সমধিকারী আইডোল। বর্ণ, ধর্ম কিংবা আর্থ-সামাজিক বেকগ্রাউন্ড বিবেচনা ছাড়াও কীভাবে আমেরিকান স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় তার মডেল পোস্টারবয় হিসেবে আমাকে সবাই চিত্রিত করতে থাকে। তাদের নিকট আমি ছিলাম 'জ্যান্ত প্রমাণ' যে, বর্ণবাদ মূলত একটি অতিকথা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে আমি ভালোই জানতাম। সাত ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতা ও মল্লতাই আমাকে সফলতার দ্বারে নিয়ে পৌছুয়েছিলো। এতে না ছিলো কোনো লেভেল-প্লেইং ফিল্ড না কোনো সমধিকার। আমার পিতা একজন পুলিশ কন্সটেবল ছিলেন। আমাকে পাঠিয়ে দেন একটি ক্যাথলিক স্কুলে। সেখানকার

পাদ্রী ও নানদের কাজ ছিলো বেশি বেশি আইন-কানুন প্রয়োগ করা। আমি বাস্কেটবল খেলি যেসব কোচের নিয়ন্ত্রণে তারা প্রয়োগ করতো আরো অসংখ্য আইন-কানুন। আইন-কানুন মানার বিকল্প কিছুই ছিলো না। না বাড়িতে না স্কুলে, না খেলার মাঠে।

এরপরও আমি আন্তরিকভাবে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলাম। ৬০ দশকের আমেরিকায় বেড়েওঠেও কিন্তু আমাকে ছুঁতে পারে নি কেনো 'কালো রোল মডেল'। অবশ্যই আমি শ্রদ্ধাবোধ করতাম মার্টিল লুথার কিং জুনিয়রকে। কারণ ওসময় শ্বেতাঙ্গরা ভাবতো কৃষ্ণাঙ্গরা কোনো কাজের লোক ছিলো না। তাদের ধারণা ছিলো, এরা হচ্ছে কাঙাল নির্যাতিত লোক- যাদের প্রয়োজন ছিলো শ্বেতাঙ্গদের দয়া ও দানের। বাস্তবে তারা ভীত ছিলো যে কালোরা সাদাদের কর্ম, গৃহ, ধন-সম্পদ ইত্যাদি দখল করে নেবে। ভালো কালোরা ছিলো সুখি চিত্তবিনোদনকারী শবিজে বা খেলাধূলায়।

আমার ইসলামগ্রহণকে কিছু কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীরা ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে। তাদের মতে আমি চার্চের ওপর অগ্নিবোমা নিক্ষেপ করে দিয়েছি! আমেরিকান পতাকাকে ছিড়ে ফেলেছি।

বাস্তবে আমার মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রাথমিক প্রেরণা আসে ম্যালকম-এক্স (আলহাজ্জ মলিক আল-শাবাজ - ১৯২৫-১৯৬৫) এর আত্মজীবনী পাঠ করে। তিনি যে জেলে যাবার আগেই সামাজিকভাবে জেলে ছিলেন সে কথাটি আমাকে ভাবিয়ে তুলে। জেলে না যেয়ে অনুরূপ অনুভূতি আমার মাঝেও জেগে ওঠেছিল। ম্যালকম-এক্স প্রথমেই তার মা-বাবার মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যাপটিস ধর্মকে (খ্রিস্টবাদ) ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন। এরপর তিনি ইসলামের ওপর অধ্যয়ন করেন। তার নিকট খ্রিস্টবাদ ছিলো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্টির মূল। তারাই কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। তারাই প্রথমে বর্ণবাদকে সমর্থন করে সমাজকে বিভক্ত করে দেয়। তার পরিবারবর্গকে খ্রিস্টবাদী কু ক্লাক্স ক্লান [Ku Klux Klan] হামলা করে। কেকেকে'র উপদল ব্ল্যাক লিজনের সদস্যরা তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

একজন সাধারণ অপরাধী থেকে ম্যালকম-এক্স এর রাজীনিতিক নেতা হওয়ার কাহিনী আমাকে অনুপ্রেরণা দান করেছে। আমি নিজের পরিচিতি ও

বেড়েওঠার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করি। ইসলাম তাকে নিজের আসল পরিচিতি আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাকে দান করেছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিমিন্যালদের নির্যাতনকে শক্ত হাতে দমন করার উদ্যম। একই সময় তাকে সাহস যোগিয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতেও। আমি কুরআন শরীফ অধ্যয়নে লেগে গেলাম।

প্রত্যয় ও প্রতিরোধ

এ সিদ্ধান্ত আমাকে একটি অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক পূর্ণতার ভ্রমণের দিকে নিয়ে যায়। তবে অবশ্যই এটি কেনো মসৃণ রাস্তা ছিলো না। চলার পথে অনেক মারাত্মক ভুলও করেছি। তবে হয়তো, এ রাস্তা মসৃণ থাকা অস্বাভাবিক ছিলো না। হয়তো এর মধ্যে সর্বদাই বাঁধা-বিপত্তি ও বক্রতা এবং মিথ্যা আবিষ্কার বিদ্যমান আছে যাতেকরে পথচারী ঈমানী চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে। যেমনটি ম্যালকম-এক্স বলেন, "আমি মনে করি, নিজেকে বোকা বানানোর অধিকার কারোর থাকতে পারে যদি সে সত্যিই কোনো লক্ষ্যর্জনের নেশায় থেকে থাকে।"

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, আমাকে আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্য থাকার শিক্ষাসহ লালন-পালন করে বড়ো করা হয়েছিল। বিশেষকরে যারা এসব আইন-কানুন বলবৎ করার জন্য দায়িত্বে ছিলেন তথা শিক্ষকগণ, পাদ্রীগণ ও কোচগণের নির্দেশমতো চলা ছিলো বাধ্যবাধকতা। আমি সর্বদাই একটু ভিন্ন ছিলাম। সুতরাং যখন আমি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ব্রত হতে চাইলাম, তখন একজন উস্তাদ মিলে গেলো যার নাম ছিলো হাম্মাস আবদুল খালিস। আমি যখন মিলওয়াকি বাকস্ ক্লাবের খেলোয়াড় ছিলাম তখন এই উস্তাদের হাতেই ইসলামের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করি। এরপর ১৯৭১ সালে ২৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করে নিই এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে করিম আবদুল-জব্বার রাখি।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, কোন কারণে আমি এমন একটি ধর্ম গ্রহণ করলাম যা আমেরিকান কৃষ্টির জন্য ছিলো খুব অদ্ভুত ও বিদেশি।

এছাড়া অনেক লোক আমার নতুন নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে বেগ পাচ্ছিলো। কিন্তু বাস্তবে তো আমি যে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছি তা ছিলো আমার জন্য বিদেশি। এর বদলে আমি আলিঙ্গন করেছি এমন একটি ধর্মের সঙ্গে যা হচ্ছে আমার কালো-আফ্রিকান ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। উল্লেখ্য, ধারণা করা হয় অন্তত ৩০% আফ্রিকান ক্রীতদাস যাদের আমেরিকায় আমদানী করা হয়েছিল, মুসলমান ছিলেন। অনেক ফ্যান মনে করেছিলো ১৯৩০ সালে ডেট্রোয়ে প্রতিষ্ঠিত নেশন অব ইসলামে আমি যুক্ত হয়ে গেছি। যদিও নেশন অব ইসলামের নেতা ম্যালকম-এক্স এর জীবন ও কর্ম দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমি এ দলভুক্ত হই নি। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামের আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর মনোনিবেশ। এর রাজনীতির প্রতি নয়। অবশেষে ম্যালকমও নেশন অব ইসলাম থেকে বেরিয়ে যান, তার দলের তিন ব্যক্তি তাকে হত্যা করার কিছুদিন পূর্বে।

আমার মা-বাবা কিন্তু ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় আমার প্রতি খুশি হন নি। তারা কট্টর খ্রিস্টান ছিলেন না বটে, তথাপি তারা আমাকে লালল-পালন করেছিলেন এ বিশ্বাস রেখে যে আমি হবো একজন গসপেলে বর্ণিত খ্রিস্টান। কিন্তু ইতিহাস পাঠের সময় আমি খ্রিস্টবাদীদের ভূমিকা জেনে বেশি থেকে বেশি এ বিশ্বাসের প্রতি মোহমুক্ত হতে থাকি। আমি অবশ্য জানতাম যে, ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভেটিক্যান কাউন্সিল কর্তৃক দাসপ্রথাকে “কলঙ্ক” হিসেবে ঘোষণা করে বলেছিলো, এটা গডকে অসম্মানের সামিল। এটা ছিলো সমাজের জন্য বিষ। কিন্তু আমার জন্য এ ঘোষণা আসে অতিদেরিতে! দুই হাজার বছরব্যাপী খ্রিস্টান ক্ষমতাধর চার্চ কর্তৃক দাসপ্রথা বন্ধ না করে একে সমর্থন করার ব্যাপারটি আমাকে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ করেছে। তারা অযুহাত দেখিয়ে আসছিলো যে, এটা নাকি আদি পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত! প্যাপাল ষাড়গণ (যেমন ডাম ডাইভারসাস ও রোমানাস পন্টিফেক্স) দুষ্কৃতকারীদের কর্তৃক আদিবাসী মানুষকে দাসে পরিণত করা ও তাদের ভূমি দখল করাকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং ক্ষমা করেছিল। এরূপ কার্য কীভাবে সমর্থন করা যায়?

আমি জানি, অনেক খ্রিস্টান দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যেয়ে কঠোর নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তাদের চেষ্টা ছাড়া হয়তো খ্রিস্টবাদ থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হতো না। এরপরও আমাকে এটা বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হয় যে, নিজেদের বিশ্বাসের সরাসরি বিরোধী একটি প্রথাকে এ ধর্মের গুরুরা দীর্ঘ কালব্যাপী সমর্থন জানিয়েছেন। সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার!

নতুন ইসলামী নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ছিলো আমার পূর্বপুরুষ ও স্বজাতিকে দাসে পরিণত করাকে পরিত্যাগ করা। আমি জানতে পারি, আমার পূর্বপুরুষ আলকিন্ডর ছিলেন একজন ফরাসী ব্যক্তি যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজে বসবাস করতেন। তিনিই আমাদের পূর্বপুরুষদের মালিক ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিলো নাইজেরিয়ায়। তাদেরকে বলা হয় ইউরোবা জাতি। মালিকের নামে নিজের পারিবারিক নাম রাখাটা আমার নিকট এই ইউরোবা জাতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের সমান। তার (আলকিন্ডর) নামটি যেনো লজ্জার ক্ষতচিহ্ন মনে হয়।

ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্যতা প্রথম থেকেই শক্ত ছিলো। ১৯৭৩ সালে আমি লিবিয়া ও সাউদি আরবে ভ্রমণে যাই। পবিত্র হজ্জ পালন করি। আরবি ভাষা শিখি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি সর্বদা ইসলামে দীক্ষিত হওয়াকে সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই মনে করে আসছি। তবে এখনও আমি ভাবি, হয়তো আরো কিছুটা ব্যক্তিগতভাবে এ মহান ধর্মের সদস্য হওয়াটা অনেকটা ভালো হতো। ধর্মকর্মের ব্যাপারে প্রচার-প্রচারণা মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয়, তার জন্য এটা সত্যিই এক বিরাট সংগ্রাম ও দৃঢ়তার ভ্রমণ। ইসলামী বিশ্বাস হচ্ছে ঈমান ও যৌক্তিকতার সমন্বিত রূপ। এরূপ না হলে কী পিতা-মাতার ধর্মকে বাতিল বলে অপর কোনো বিদেশী ধর্মবিশ্বাসকে আলিঙ্গন করা সম্ভব? ধর্মপরিবর্তন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা নিজের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সমর্থন ও মায়া-মহব্বত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিছু ফ্যান আমেক এখনও লিউ বলে ডাকে। আর আমি যখন এটি উপেক্ষা করি তখন তারা মনক্ষুন্ন হয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, আমার আধ্যাত্মিক পছন্দের প্রতি তাদের সম্মানবোধের অভাব হেতু আমি আহত হই।

তারা আমাকে যেনো একটি খেলার পুতুল ভাবে- তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা যেভাবে তারা চায় সেভাবে আমাকে পূরণ করতে হবে। আমার যে একটি ব্যক্তিগত জীবন আছে তা তারা বেমালুম ভুলে যায়।

কার্মিট ব্যঙ এর বিখ্যাত অভিযোগ হলো, “সবুজ হওয়াটা সহজ নয়।” আমেরিকায় মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করুন। পিউ রিসার্চ সেন্টার থেকে জানা যায়, প্রধান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশের জবাব ছিলো সর্বাধিক নিম্নপর্যায়ের মুসলমানদের প্রতি। অবিশ্বাসীদের তুলনায় সামান্য একটু কম। যদিও ইসলাম হচ্ছে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্ম। মুসলিম নামধারীদের অন্যায় শক্তিপ্রদর্শন, সন্ত্রাস ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সমগ্র পৃথিবী আমাদেরকে ভয় করছে। তারা জানে না, পৃথিবীর ২ বিলিয়ন মুসলমানদের প্রায় সবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। তারা শুধু গোটা ক’জন সন্ত্রাসীদের দ্বারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বিচার করে। আমার ইসলামগ্রহণের একটি অংশ হচ্ছে অন্যকে আমার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদানের দায়িত্ব। শুধুমাত্র তাদেরকে দীক্ষিত করতে নয়, কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকা যারতার ধর্মপালন করে। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহিষ্ণু হওয়া এবং শান্তিতে বসবাস করা আমার ধর্মের শিক্ষা। এক-পৃথিবী মানে এটা নয় যে, এক ধর্ম হতে হবে। তবে একটি বিশ্বাস রাখা চাই- সবাইকে বাঁচতে হবে শান্তির মধ্যে।[৮]

---

[৮] http://america.aljazeera.com/opinions/2015/3/why-i-converted-to-islam.html

আবদুল্লাহ ডিল্যানসি

প্রাক্তন খ্রিস্টান - কানাডা

কুরআন অধ্যয়ন করে সত্যধর্ম ইসলামে দীক্ষিত

আমার নাম আবদুল্লাহ ডিল্যানসি। আমি কানাডার অধিবাসী। আমি রোগিদের সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। আজ প্রায় ২০ বছর হলো বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ৩টি অপূর্ব সুন্দর সন্তান আছে। আমি একজন মুসলমান- আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া। কিন্তু অতীতে মুসলমান ছিলাম না।

অতীতে আমি ছিলাম একজন প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। আমার পরিবার একটি চার্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুতরাং প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের সাথে জড়িত থেকেই আমি বেড়ে ওঠি। তবে পরিণত বয়সে আমি পছন্দ করে নিই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপ্টিস্ট চার্চকে।

একজন অনুগত খ্রিস্টান হিসেবে আমি চার্চের সাথে খুব বেশি জড়িত ছিলাম। এমনকি রোববারের বয়স্ক ক্লাসে বয়ানও করতাম। এছাড়া অন্যান্য চার্চ সম্বন্ধীয় দায়িত্বও পালন করেছি। অবশেষে আমাকে চার্চের উপপুরোহিত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এরপর গডের সার্ভিসে নিজেকে আরো বেশি জড়িত করতে উৎসাহিত হই। চার্চের একজন পাদ্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখি।

চার্চ আমাকে দেবত্ববাদের ওপর ডিগ্রী গ্রহণের জন্য স্পনসর করে। আমার উদ্দেশ্য ছিলো চার্চের যাজক (প্যাসটর) হয়ে মিশনারী (ধর্মপ্রচার) কাজ করা। তবে আমি জানতাম, পাদ্রী বা যাজক হলে পরে পরিবার-পরিবর্গসহ নিজেকে চার্চের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে জড়িত রাখতে হবে বাকি জীবন।

সুতরাং বাইবেল কলেজে পাঠগ্রহণ শুরুর কিছুদিন পূর্বে আমার মনে কেনো যেনো আগ্রহ জাগলো খ্রিস্টবাদকে কিছুটা সমালোচনার দৃষ্টিতে ভালোকরে পরীক্ষণ-নীরিক্ষণ করা। ক্রমে নিজের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে খুব

শক্ত ও সিরিয়াস প্রশ্ন করতে থাকি। ত্রিত্ববাদ নিয়ে আমার বেশ কিছু প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগ্রত হয়- যার সঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যেমন গডের একজন পুত্রের প্রয়োজন কেনো হবে? জিসাস ক্রাইস্ট কেনো মানব-বলির পাত্র হবেন, যেভাবে বাইবেলে বলা হচ্ছে? আমার পাপমুক্তির জন্য তাঁকে কেনো জীবন দান করতে হবে? ইত্যাদি।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে আগের যুগের 'পুরাতন বাইবেলে' [অল্ড টেস্ট্যামেন্ট] বর্ণিত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরা মুক্তিপ্রাপ্ত। আমার প্রশ্ন ছিলো এরা জীবিত থাকতে জিসাসের জন্মই হয় নি- তাহলে তিনি তাদের মুক্তিদাতা হলেন কীভাবে?

খ্রিস্টবাদের ওপর উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি জীবনেও একবার করি নি- কেনো? আমি খ্রিস্টানদের কাছে প্রশ্ন করে এসব "খ্রিস্টান বিশ্বাসের মূল" বিষয়গুলোর ব্যাপারে যেসব উত্তর পেয়েছি তা ছিলো সবই যুক্তিবিরোধী এবং যৌক্তিক চিন্তা বহির্ভূত।

আমি বুঝতে পারি নি, কেনো গড আমাদেরে একটি অত্যাশ্চর্য ব্রেন দেবেন- এরপর বলবেন, সাময়িকভাবে এটিকে কাজে লাগানো থেকে তোমরা বিরত থাকো? কারণ, বাস্তবে খ্রিস্টবাদ মানুষকে এ কাজটি করার জন্যই বলছে যখন তারা বলে, "তোমাকে শুধুমাত্র বিশ্বাস করতে হবে।" বিশ্বাস যে কেনো ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বলে কী আজেবাজে অযৌক্তি যাচ্ছেতাই বিশ্বাস করবো- এটা তো সত্যিকার ব্লাইন্ড ফেইথ!

আমি বুঝতে সক্ষম হই যে, খ্রিস্টবাদের বিশ্বাস করাটা ছিলো উক্তরূপ ব্লাইন্ড ফেইথ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ বিনষ্ট করে ফেলেছি। কোন্ কারণে- আমি এটি ইতোপূর্বে বুঝতে পারি নি?

আমি বাইবেল থেকে কোনো জবাব পাই নি। আমি অনুধাবন করলাম, খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদ একটি রূপকথার গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, এবং এটাও বুঝলাম যে, গডের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে কাউকে 'উদ্ধার' করার কোনো পুত্র বা অন্য কারোর কিংবা কোনোকিছুর সাযাহ্য ছাড়াই। এ অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচত হতেই সবকিছু বদলে গেলো। খ্রিস্টবাদের প্রতি আমার সব ধরণের বিশ্বাস

বিলুপ্ত হলো। এখন আর কিছুতেই এ বাতিল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি জড়িত হতে পারছিলাম না, কিংবা খ্রিস্টান হওয়াও আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

আমি চার্চকে বিসর্জন করলাম। আমার আনুগত্যশীল স্ত্রীও আমাকে অনুসরণ করলেন। বাস্তবে খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করে নিতে তিনিও বেগ পাচ্ছিলেন। এটাই ছিলো আমার জীবনের আধ্যাত্মভ্রমণের শুরু। এ মুহূর্তে আমি ছিলাম ধর্মহীন- তবে একজন প্রভুতে বিশ্বাসী।

এ সময়টা ছিলো খুব কষ্টের। আমি ও আমার স্ত্রী ইতোমধ্যে খ্রিস্টবাদ ছাড়া আর কিছুই জানতাম না। সুতরাং সত্যের সন্ধান ছাড়া উপায় ছিলো না। আমি একে একে বিভিন্ন ধর্মের ওপর অনুসন্ধান চালালাম। কিন্তু আশ্চর্য! একে একে সবগুলোর মধ্যে গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। নির্ভেজাল কোনো সত্যধর্ম পৃথিবীতে ছিলো কী না- সে ব্যাপারে আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম। কিন্তু অবশেষে আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারলাম। ইসলাম! এটা কী ছিলো?

আমি কানাডার যে অংশে বসবাস করতাম সেখানে কোনো মুসলামকে জানতাম না- বা ইসলাম শব্দটি পর্যন্ত শুনি নি। ইসলাম নামক যে একটি ধর্ম আছে তা-ও কেউ কোনোদিন বলে নি। আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কী? এরপর কিছু নিউজ শুনি- সবাই ইসলাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করছিলো। সুতরাং ওসময় আমার জন্য ‘ইসলাম’ কোনো বিবেচনার বিষয়ই ছিলো না। আমার ধর্মীয় রাডারে এটি অনুপস্থিত ছিলো। কিন্তু অন্যসব ধর্মবিশ্বাসে বেজাল দেখে শেষ পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করি।

এরপর আরো বেশি অধ্যয়ন। এরপর পাঠ করলাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। সুবহানাল্লাহ! এমন মনোমুগদ্ধকর ঐশীবাণী! এতো, মহাসত্য। আমার জীবন চিরদিনের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেলো। ইসলাম সম্পর্কে যাকিছু তথ্যই পেলাম পাঠ করতে লাগলাম মনোযোগসহ। খুঁজতে লাগলাম একটি মসজিদ। কিন্তু সর্বাধিক কাছের জানা মসজিদটি ছিলো ১০০ মাইল দূরে।

কালবিলম্ব না করে পুরো পরিবারকে নিয়ে গাড়িতে ওঠলাম। ড্রাইভ করে চলে আসলাম ঐ মসজিদে। পথিমধ্যে নিজেকে খুব নার্ভাস অনুভব করি- কিন্তু একই সময় খুব উত্তেজিতও ছিলাম। ভাবছিলাম মসজিদে প্রবেশের অনুমতি পাবো তো, আমি তো আরব বা মুসলমান নয়?

কিন্তু মসজিদে পৌঁছার পর বুঝতে পারলাম, কোনো সমস্যা নেই। মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিরা আমাকে উষ্ণ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সবাই ছিলেন অত্যন্ত ভালো লোক। মুসলিমদের সম্পর্কে যেসব খারাপ সংবাদ শুনেছিলাম তার লেশ মাত্র এখানে ছিলো না। তারা আমাকে আহমদ দিদাতের (১৯১৮-২০০৫) একখানা গ্রন্থসহ আরো বইপত্র উপহার দিলেন এবং বললেন, আপনি চাইলে ইসলামে দীক্ষিত হতে পারবেন।

আমি ইসলাম সম্পর্কে তাদের দানকৃত সবকিছু পাঠ করলাম। আমি এগুলো পেয়ে আনন্দিত। আমাদের স্থানীয় সরকারী লাইব্রেরিতে মাত্র চারটি ইসলাম সম্পর্কিত বই ছিলো! এগুলোর সবটিই ইসলামকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছে। মসজিদের বইপত্র পাঠ করে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেলাম! কীভাবে আমি এতো কাল যাবৎ খ্রিস্টবাদকে অনুসরণ করলাম, আর কখনো সত্যকে শ্রবণ করলাম না?

আমি ইসলামে বিশ্বাস করে নিয়েছি- আমি তা জানতাম। আমি চাই ইসলামে দীক্ষিত হতে। আমার শহরে খুব ছোট্ট একটি মুসলিম কমিউনিটি ছিলো। এদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি। তাদের খুব ছোট্ট একটি মসজিদও আছে। মার্চ ২৪, ঈসায়ী ২০০৬ সাল। এদিন আমি চলে যাই ঐ মসজিদে। সেদিন ছিলো শুক্রবার। তখনও জুমুআর নামায শুরু হয় নি। স্থানীয় মুসলিমদের অধিকাংশ ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমি সাক্ষ্য বাক্য পাঠ করি: “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!” -আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বার্তাবাহক। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমি একজন মুসলমান। জীবনের সর্বাপেক্ষা উত্তম দিনটি হচ্ছে আজ।

আমি ইসলামকে ভালোবাসি এবং শান্তিতে আছি। তবে মুসলমান হওয়ার পর কঠিন সময় পার হয়েছে। মানুষ যখন জানতে পারলো আমি মুসলমান হয়েছি তখন তারা আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। অনেকে ধিক্কার

করেছে কিংবা হেসেছে আমাকে নিয়ে। পুরতান খ্রিস্টান বন্ধুদের অধিকাংশ আর কোনোদিন কথাও বলে নি আমাদের সাথে।

আমার মাতা-পিতা আমাকে বর্জন করেছেন। তবে আমি মুসলমান হওয়াকে ভালোবাসি। আমার খ্রিস্টান ভাই-বন্ধুরা যদি মনে করে এটি অবিশ্বাস্য- তাতে কী আসে যায়। মৃত্যুর পর তো জবাবদিহি আমাকে একাই করতে হবে। তারা আমার কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ হচ্ছেন শক্তিদাতা। মহান শক্তিধর আল্লাহ আমাকে শক্তিদান করেছেন প্রাথমিক কঠিন সময়ে। এখন আমার অনেক মুসলিম ভাই আছেন। আইনীভাবে আমার নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রেখেছি। আমি এটি খুব পছন্দ করি। আমি এখন প্রথম এবং একমাত্র মুসলিম ব্যক্তি যে স্থানীয় হাসপাতালে মুসলমান রোগি ও তাদের পরিবারের শন্তিদাতা সেবক হিসেবে কাজ করছি। আমি একজন মুসলমান- এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।[৯]

৯ http://tellmeaboutislam.com/abdullah-de-lancey.html

নূর

প্রাক্তন হিন্দু - যুক্তরাজ্য

ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তা অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস দেয় নি

আমি একটি কট্টর হিন্দু পরিবারে জন্ম নিয়েছিলাম। আমাদেরকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া হতো যে, নারীদের বিবহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্বামীর খেদমত করা ও সন্তানাদি জন্মদান ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। স্বামী দয়ালু হোক বা না- তাতে কিছুই আসে যায় না। এরপর আরো অনেক ব্যাপার আছে যা নারীদের প্রতি অন্যায়-অবিচার ছাড়া কিছু নয়। যেমন: বিধবাদের সব সময় সাদা কাপড় পরতে হবে, খেতে হবে শুধুমাত্র শাক-সবজি, মাথা মুণ্ডাতে হবে আর সর্বাধিক নিষ্ঠুর প্রথা হলো পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কন্যা বা তার পরিবারকে অবশ্যই 'যৌতুক' দিতে হবে স্বামী বা তার পরিবারের নিকট। এটা নাকি তাদের প্রাপ্য! স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেতাই চাইতে পারে- স্ত্রী তা দিতে পারুক, বা না।

শুধু তাই নয়, বিয়ের পর যদি স্ত্রী যৌতুক দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এমনকি 'রান্নাঘরে মৃত্যুর' শিকারও হতে পারে। যেখানে স্বামী ও তার মা বেচারীকে রান্নাঘরে কাজের সময় গায়ে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিতে পারে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে। গত বছর আমার পিতার এক বন্ধুর মেয়ে এরূপ নির্যাতনের শিকার হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গয়ে গেছে।

উক্তরূপ নির্যাতন ছাড়াও হিন্দু ধর্মে পুরুষকে এক ধরনের 'গড' হিসেবে দেখা হয়। একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব আছে যেখানে অবিবাহিতা মেয়েরা একটি 'শিরা' নামক মূর্তির সামনে যেয়ে প্রার্থনা করে, যাতেকরে তারা তারই মতো একজন স্বামী পায়। আমার মা-ও এই মূর্তির সামনে যেয়ে প্রার্থনা করতে আমাকে বলেছেন। এসব ব্যাপার থেকে আমি বুঝতে সক্ষম হই যে,

হিন্দুবাদ মূলত কুসংস্কারভিত্তিক একটি ধর্ম। এ ধর্মের পেছনে বাস্তবে কোনো প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত ঐশীবাণী নেই। সবই পৌরানিক কাহিনী, কৃষ্টি ও কুসংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্মে সত্য বলতে কিছুই নেই। কারণ কোনো সত্যধর্ম নারীদেরকে এরূপ নির্যাতন করা সমর্থন করতে পারে না।

কোনো একসময় আমি লেখাপড়ার জন্য ইংল্যান্ডে চলে আসি। ভাবলাম, এমন এক দেশে এসেছি যেখানে নারী ও পুরুষের সমধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নারীরা নির্যাতিত হয় না। আমাদের যার যেভাবে ইচ্ছে তা-ই করতে পারবো, ভাবলাম।

যাক, আমি ধীরে ধীরে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকি। নতুন বন্ধু-বান্ধব তৈরি করি ও এ সমাজ সম্পর্কে শিখতে শুরু করি। এরপর যেতে থাকি বন্ধুদের সাথে সব ধরনের জায়গায়। এমনকি 'বার', 'ডান্স হল' ইত্যাদি স্থানেও গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তথাকথিত 'সমধিকার' মূলত কাগজে-কলমে ও থিওরীতে পাড়ে আছে- বাস্তবে সামাজিক অবস্থা ছিলো ভিন্ন।

আমি বুঝতে পারি স্বার্থান্বেষীদের অভাব ছিলো না। আমি শীঘ্রই খুব অস্বস্থি বোধ করছিলাম। শিক্ষা, কাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমধিকার থাকলেও বৃহত্তর বৃটিশ সমাজে নারীরা মোটেই সমধিকার ভোগ করছেন না। নারীদের প্রতি পুরুষের আচরণ ছিলো লোলুপদৃষ্টিমূলক। আমাকে বিশেষভাবে বস্ত্রাদি পড়তে হবে, কথা বলতে হবে বিশেষ ভঙ্গিতে যাতেকরে পুরুষরা আমার দিকে ভালো চোখে তাকায়। ক্রমে আমি বেশি থেকে বেশি অস্বস্থি বোধ করলাম। আমি নিজেকে যেনো হারিয়ে ফেলছিলাম। অথচ এ চক্র থেকে বেরিয়ে আসাও কঠিন হয়ে পড়ছে। সবাই বলছিলো তারা খুব ফূর্তি-আমোদ করছে। কিন্তু আমি এরূপ জীবনকে কখনও ফুর্তি-আমোদ বলবো না।

পশ্চিমা এরূপ সমাজেও নারীরা নির্যাতিত। আমি এসময় ইসলাম নিয়ে ভাবি নি। যদিও আমার বেশ কয়েকজন মুসলিম বন্ধু-বান্ধবী ছিলো। আমি খুঁজছিলাম এমন একটি উপায়-অবলম্বন-বিশ্বাস যার দ্বারা নিজেকে সত্যিকার অর্থে সবার কাছ থেকে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েও নিরাপদ মনে করতে পারি। এমন একটি বিশ্বাস যা হবে সঠিক, যথার্থ ও সত্য। কারণ, সকলেই কোনো কিছু

বিশ্বাস করে ও এর গণ্ডিসীমায় থেকে জীবন যাপন করে থাকে। যদি ফুর্তি-আমোদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তারা এভাবেই জীবন কাটায়। কেউ যদি বিশ্বাস করে অর্থ কামাই করবে, তাহলে সে এ ধান্ধায়ই থাকে। কেউ যদি বিশ্বাস করে মদ পান করবে- তাহলে সে এটাই করবে। কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, এসব বিশ্বাস ও বাস্তবায়ন বাস্তবে মনের গভীরে লালিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না।

আমরা এখন এমন এক সমধিকারী সমাজে বাস করছি যে, মেয়েদের থাকতে হবে 'বয়ফ্রেন্ড' [অন্যথায় তুমি অস্বাভাবিক!] এবং কুমারীত্ব বলতে কিছু থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে এভাবে বাস করা এক ধরনের নির্যাতন যা অধিকাংশ নারী অনুধাবন করেন না। যখন আমি ইসলামে দীক্ষিত হই তখন এটা বুঝা সহজ ছিলো যে, আমি অবশেষে স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করেছি। ইসলাম ছিলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মবিশ্বাস যা দান করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সঠিক দিকনির্দেশনা। অনেক মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছে। তারা বলে ইসলাম নাকি একটি নিপীড়নের ধর্ম। যেখানে মহিলারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর ঢেকে রাখে এবং সব ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা জানে না, বাস্তবে ইসলাম নারীদেরকে বেশি অধিাকার দিয়েছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগ থেকেই। ভেবে দেখুন, কিছুদিন হয় মাত্র, পশ্চিমা ও অন্যান্য অমুসলিম সমাজে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপরও আধুনিক অ-মুসলিম সমাজে অনেক স্থানে নারীরা নির্যাতিত। আমি ইতোমধ্যে হিন্দু সমাজের কথা বলেছি।

মুসলিম মহিলাদের উত্তরাধিকারের অধিকার আছে। তারা চাইলে নিজেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন। তারা ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখেন। তাদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে। প্রয়োজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কিংবা ভেঙ্গে দেওয়ারও অধিকার আছে। আল্লাহর কালাম কুরআনেও এসব অধিকারের ওপর অনেক আয়াত আছে। ইসলাম মানুষকে একগুচ্ছ সঠিক আইন-কানুন প্রদান করেছে। এসব কানুন কোনো মানুষের তৈরি নয়, আল্লাহর সৃষ্ট; সুতরাং এটাই হবে সঠিক ও যথার্থ-তা-ই স্বাভাবিক।

প্রায়ই মুসলিম নারীদেরকে বলা হয়, কোন কারণে তারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে? এটা তো নিপীড়ন। এটা নিপীড়ন নয়। ইসলামে বিবাহপ্রথা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ সৃষ্টির উপাদানও এটি। সুতরাং কোনো নারীর জন্য উচিৎ হবে না যে, যেখানে-সেখানে ঘুরাঘুরি করে নিজেকে সবার সম্মুখে প্রদর্শন করা। তাকে নিজের স্বামীর সম্মুখে প্রদর্শন করাই হবে সঠিক ও ভদ্রতা- নয় কি? আর পুরুষ- তাকেও বলা হয়েছে, শুধুমাত্র দেহের কিছু অংশ প্রদর্শিত হবে। পর্দার নির্দেশ শুধু নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়- পুরুষদেরও কিছু নিয়ম-নীতি মানতে হবে। এছাড়া মহিলাদেরকে পর্দানশীন রাখা তাদের নিজেদের বিনয় ও ভদ্রতারই অংশ। কুরআনে বলা হয়েছে:

“হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” (আহযাব (৩৩): ৫৯)

আমরা যখন অন্য যে কোনো সমাজের দিকে তাকাই তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, নিজেদের খোলামেলা পরিধেয় ও স্বাধীন চলাফেরা হেতু, নারীদেরকে হামলা করা হয় এবং তারা শিকার হয় পুরুষ কর্তৃক শ্লিলতাহানির। অপর আরেক ব্যাপারে আমি মন্তব্য করবো যে, ইসলামের যেসব আইন-কানুন আল্লাহ তা’আলা নির্ধারিত করেছেন তা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উভয়ের স্বার্থে ফ্রি-মিক্সিং ও মুক্তভাবে চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর আল্লাহ যাকিছুই নির্দেশ দেন তা সঠিক, পূর্ণাঙ্গ, পবিত্র এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআনের একটি পবিত্র আয়াতে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

“ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র,

স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (নূর (২৪): ৩১)

মাথায় হিজাব পরলে, আমি খুব আনন্দবোধ করি। বাস্তবে আমি হিজাব পরতে চাই। এটা পরে আমি আন্তরিকভাবে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি বোধ করি। পরিতৃপ্ত এ জন্য যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ পালন করছি। প্রশান্ত এ জন্য যে, এটা পরার কারণে হৃদয়ে আনন্দবোধ ও অনুগ্রহের ছোঁয়া লাগে। আমি অনুভব করি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। এছাড়া মানুষ স্বভাবতই আমাকে আরো বেশি সম্মান করে। আমার প্রতি মানুষের আচরণে সত্যিই পার্থক্য দেখতে পাই।

সবশেষে আমি সবাইকে আশ্বস্থ করতে চাই যে, ইসলামকে আমি অন্ধভাবে গ্রহণ করি নি। আমাকে কেউ জোরজবরদস্তিও করে নি। কুরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।" (বাক্বারাহ (২): ২৫৬)

আমি ইসলামকে দৃঢ়বিশ্বাসসহ গ্রহণ করেছি। আমি দেখেছি, গিয়েছি, গল্পের উভয় দিক দেখেছি। আমি জেনেছি, অপর দিক কীরকম তা অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝেছি। আর আমি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। ইসলাম নারীদেরকে নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং তাদেরকে দান করেছে স্বাধীনতা। দান করেছে তাদেরকে সঠিক মর্যাদা যা তাদের প্রাপ্য। ইসলাম একটি ধর্ম যা আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য পছন্দ করেছেন। যারা একে গ্রহণ করে নিয়েছে তারা সত্যিকার অর্থে

মানবতার শেকল ও নিগড় থেকে মুক্ত হয়েছে। মানবসৃষ্ট আইন-কানুন ও নিয়মনীতি একদল দ্বারা অপরদলের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ কায়েম করেছে মাত্র। সৃষ্টি করেছে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। ইসলাম এরূপ নয়। ইসলাম সত্যিই নারীদেরকে মুক্ত করেছে। তাদেরকে ব্যক্তিত্ব প্রদান করেছে, যা অন্য কোনো মানবসৃষ্ট আইন-কানুন বা ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে ইতিহাসব্যাপী।[১০]

[১০] https://islamcan.com/convert-stories/noor-ex-hindu-uk.shtml

আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েভ

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

খৃষ্টবাদ থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায়

মুহাম্মদ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েভ ১৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার কলোম্বিয়ার হাডসনে। হাডসন ও নিউ ইয়র্কে শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এরপর অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। 'সেন্ট জোসেফ গ্যাজেট' ও 'মিজোরী রিপাবিলিক্যান' নামক দুটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

আলেকজান্ডারের আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর তার প্রশস্ত জ্ঞানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার তাকে ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগদান করে ১৮৮৭ সালে। সেখানে থাকাকালে তিনি ইসলামের উপর অধ্যয়ন-গবেষণা করেন। স্থানীয় মুসলমান ও ভারত থেকে আগত কিছু মুসলিম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গভীর অধ্যয়ন শেষে একটি উত্তম জীবনবব্যস্থা হিসেবে ইসলামই যে একমাত্র সত্যধর্ম তা অনুধাবন করেন। এরপর তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন।

নিজের নামের প্রারম্ভে মুহাম্মদ শব্দ সংযুক্ত করে একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন। তাকে সবাই মুহাম্মদ আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েভ হিসেবে জানতো, চিনতো। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কিছুদিন পরই তিনি মুসলিম অধ্যুসিত বেশ কয়েকটি দেশে ভ্রমণে যান। এরপর নিজের দেশের অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছুয়ে দিতে গড়ে তুলেন 'ইসলামিক প্রপ্যাগেশন মিশন' নামে একটি দাওয়াতী সংঘ। তিনি 'ইসলাম ইন আমেরিকা' শিরোনামে একটি বই লিখেন ১৮৯৩ সালে। মুহাম্মদ আলেকজান্ডার ওয়েভ ১ম অক্টোবর ১৯১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ ওয়েভের ইসলামের দিকে ভ্রমণকাহিনী নিচে তুলে ধরা হলো। এ কাহিনীটি বেগম আয়শা বাওয়ানী কর্তৃক প্রণীত 'ইসলাম - আওয়ার চয়েস' (ওয়াকফ, করাচী, ১৯৭০) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ওয়েভ বলেন, "আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, কেনো আমি, একজন আমেরিকান যেখানে সবাই খ্রিস্টানপন্থী- এবং বেড়েওঠা হয়ে অর্থোডক্স প্রেসবিটারিয়ান হিসেবে, ইসলামকে গ্রহণ করলাম জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে।

আমি ক্ষিপ্রতা ও সততার মাধ্যমে জবাব দিতে পারি যে, আমি এ ধর্মকে গ্রহণ করেছি এজন্য যে, গভীর অধ্যয়ন শেষে আমি বুঝতে পারলাম এটাই ছিলো সর্বাধিক উত্তম ও একমাত্র ব্যবস্থা যার দ্বারা মানবতার আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ হতে পারে। আর এখানে এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমি জন্মগতভাবে চারিত্রিক দিক থেকে ধর্মের প্রতি আগ্রহশীল কোনো সন্তান ছিলাম না।

আমি যখন ২০ বছর বয়সে পদার্পণ করি তখন থেকেই আমি স্বাধীন হয়ে যাই। চার্চের নিয়ন্ত্রণ ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা অনেকটা অস্বস্থিবোধ করছিলাম। সুতরাং আমি চার্চ থেকে দূরে সরে পড়ি ও আর কখনো এর কাছে ফিরে যাই নি।

সৌভাগ্যবশত আমার মনটি ছিলো বেশ অনুসন্ধিৎসু। এছাড়া সবকিছুর পেছনে আমি কারণ খুঁজতে অভ্যস্থ ছিলাম। কোনো পাদ্রী কিংবা সাধারণ শিক্ষিত কেউ আমাকে যৌক্তিকভাবে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কারণ বুঝাতে সক্ষম হন নি। একই সময় মানব অন্তরে যেসব রহস্য লুকিয়ে আছে সেগুলোর মূলে কী ছিলো তা-ও কেউ বুঝাতে পারে নি। এগুলো ছিলো আমারও বুঝের অতীত।

এগারো বছর পূর্বে প্রাচ্যের ধর্মবিশ্বাসগুলোর ওপর আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমি পাঠ করি মিল (জে.এস. মিল, মৃ. ১৮৭৩), লকে (মৃ. ১৭০৪, কান্ট (মৃ. ১৮০৪), হেগেল (মৃ. ১৮৩১) ফিক্ট (মৃ. ১৮১৪), হাক্সলি (মৃ. ১৯৬৩) এবং আরো অনেকের লেখালেখি। এদের চিন্তা-চেতনা ছিলো গভীর

ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু একজনও বলতে পারেন নি, সৌল বা আত্মা কী ছিলো? মৃত্যুর পর এর কী হবে?

আমি আপনাদেরকে বুঝানোর জন্য অনেক কথা বলেছি। বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আমার ইসলামগ্রহণের কারণ কোনো ভ্রষ্ট ভাবানুভূতি ছিলো না, না ছিলো অন্ধভাবে বিশ্বাস করা, না ছিলো হঠাৎ করে উদ্বুদ্ধ ভাবানুভূতি। এটা ছিলো ঐকান্তিক, সত্যসিদ্ধ, অনড়, স্বাধীন অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও জানার গভীর স্পৃহার ফসল।

সত্যধর্ম ইসলামের মূল হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। আর এর মূল খুঁটি হচ্ছে নামায। ইসলাম শিক্ষা দেয়া সর্বজনিন ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা এবং সর্বজনিন হিতসাধন। এজন্য প্রয়োজন হয় মুক্ত-পবিত্র মন, আমলের মধ্যে সঠিক নিয়ত, কথার মধ্যে পবিত্রতা সততা এবং দৈহিক পবিত্রতার। নিঃসন্দেহে ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য একমাত্র সঠিক, সরল, সত্য ধর্ম।”[১১]

[১১] http://tellmeaboutislam.com/alexander-russel-webb.html

স্যার জালালুদ্দিন লোডার ব্রানটন

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ইংল্যান্ড

আমি কেনো ইসলামকে গ্রহণ করেছি তা ব্যক্ত করার জন্য সুযোগ পেয়ে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। খ্রিস্টান মা-বাবার প্রভাবের মধ্যে আমার বেড়েওঠা। খুব অল্প বয়সেই আমি থিওলজি (খ্রিস্ট-ধর্মশিক্ষা) বিষয়ের ওপর আগ্রহশীল হয়ে ওঠি। চার্চ অব ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো। সক্রিয় না হয়েও আমি মিশনারী কাজে জড়িত হই। বেশ কয়েক বছর পূর্বে খ্রিস্টান বিশ্বাসের অন্তর্গত গোটা ক'জন ছাড়া সমস্ত মানবতার নিয়তি 'চিরস্থায়ী শাস্তি' এর ওপর আমার মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এ বিশ্বাসটি আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিলো যে, আমি প্রায় বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ি। আমি যুক্তি খাড়া করলাম, একজন গড যিনি তাঁর ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করলেন মানবজাতি। আর তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন- এর কারণ কী? এটা তো প্রজ্ঞাময় নয়, না এটা যথার্থ ও প্রেমময়। এরূপ হওয়া তো অনেক সাধারণ মানুষের স্বভাব থেকেও নীচ! তবে আমি তখনও প্রভুর অস্তিত্বকে নাকচ করি নি। কিন্তু খ্রিস্টবাদ যেভাবে গডের পরিচিতি দিয়েছে তাতে বিশ্বাস করা আমার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করি। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না- যা আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।

এ অবস্থায় কিন্তু সত্যিকার প্রভুর উপাসনা ও গোলামী করার এক প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠলো। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস দাবি করা হয়, বাইবেলের ওপর ভিত্তিশীল। কিন্তু আমার নিকট উন্মোচন হলো এ ধারণায় বিবাদ বিদ্যমান। এটা কী সম্ভব যে, বাইবেল এবং যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? সুতরাং, পুনরায় বাইবেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম এবং খুব সতর্কতাসহ অধ্যয়ন করতে বদ্ধপরিকর হলাম। আমি বুঝতে পারি, কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে।

আমি মানুষের বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে নিজেই আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হলাম। আমি শিক্ষা দিতে শুরু করলাম যে, মানুষের মধ্যে একটি আত্মা আছে- একটি অদৃশ্য শক্তি। এটাই ছিলো চিরন্তন। পাপের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে। তবে গড তাঁর মাহাত্ম্য ও দয়া হেতু পাপীদেরে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত আছেন যদি তারা সত্যিকার অর্থে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

যখন বুঝতে পারলাম, সত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং গভীরে যেয়ে আবিষ্কার করতে হবে ‘মণি-মুক্তা’। আমি তখন ইসলামের ওপর গবেষণা-অধ্যয়ন শুরু করি। সাথে সাথে ইসলামে এমন কিছু ছিলো যার প্রতি আমার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। ইচরা[১২] নামক এক অজানা-অচেনা গ্রামে আমি গডের মাহাত্ম্য ও সার্ভিসে সমাজের সর্বাধিক নিম্ন পর্যায়ের লোকদের নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো এ লোকগুলোর সঙ্গে সত্যিকার একমাত্র গডের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া।

অবশেষে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্মের ওপর অধ্যয়ন শুরু করলাম। আমি তখনও জানতাম না কী পরিমাণ কর্ম তিনি করেছিলেন? তবে এটা জানতাম আরবের নবীকে খ্রিস্টানরা একবাক্যে নাকচ করে দিয়েছিল। সুতরাং, কোনো গোঁড়ামি ও অশুভ ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে বের করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হলাম যে, নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্যান্বেষী ও আল্লাহর অনুসন্ধানী।

তাঁর দ্বারা মানবজাতির বিরাট স্থায়ী উপকার সম্পর্কে জানার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, এরূপ মহান পবিত্র ব্যক্তিকে নাকচ করে দেওয়া ছিলো অত্যন্ত মারাত্মক ভ্রম ও অন্যায়। যে মানুষগুলো ছিলো বন্য মূর্তিপূজক, বাস করতো অপরাধ, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপণার মধ্যে- তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিলেন উত্তম বস্ত্র পরিধানের, অশ্লীলতাকে পরিবর্তন করে শ্লীলতা শিক্ষা দিলেন। তারা এমন এক উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন যে, যার তুলনা

---

[১২] বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের নিকটস্থ একটি শহর।

আজো বিরল। মানবসেবা, আথিথেয়তা হয়ে গেলো ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব সৃষ্ট সকল দেবতাকে ধ্বংস করা হলো। তারা উপাসনা করতে থাকেন এক ও সত্যিকার প্রভু মহান আল্লাহর। ইসলাম পরিণত হলো পৃথিবীর একমাত্র ‘পুরোদমে সংযমী সংঘে’। আরো কতো মহৎ কার্যাদি যে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছিলো তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এসব মহাসত্যের সম্মুখে খুব দুঃখজনক ব্যাপার যে, এ মহান আল্লাহর নবীকে কীভাবে খ্রিস্টানরা অবজ্ঞা ও নাকচ করতে পারে? আমাকে এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুললো।

একদা গভীর ধ্যানস্থ থাকাবস্থায় একজন ভারতীয় ভদ্রলোক যার নাম ছিলো মিয়ান আমিরুদ্দিন আমাকে দেখতে আসেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার যে, এ ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত আমার আন্তরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে জ্বালানী প্রদান করলেন। আমি নিজেই খ্রিস্টবাদের একটার পর আরেকটার ওপর গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হলাম এবং ইসলামের সত্যতার সম্মুখে এগুলোকে একে একে খাড়া করলাম। শেষ পর্যন্ত ইসলামের পাল্লা আমার নিকট ভারী হয়ে ওঠলো। এটিই যে মহাসত্য সে ব্যাপারে সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেলো। এটাই ছিলো সত্য, সরল, সহনশীলতা, আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বতার ধর্ম।

এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অল্প কিছুদিন বাকী আছে। আমি এখন আমার যাকিছু আছে সবই ইসলামের জন্য বিসর্জন করে চলে যেতে ইচ্ছুক।[১৩]

---

[১৩] **www.al-islamforall.org**; Islam Our Choice, p. 4-5

আলহাজ্জ লর্ড হেডলি ফারুক

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ইংল্যান্ড

বৃটিশ উচ্চ বংশে জন্ম নেওয়া লর্ড হেডলি ফারুক ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন: "আমার কিছু বন্ধুজন হয়তো ভাবতে পারেন, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পেছনে কিছু মহামেডান [মুসলিম] ব্যক্তিবর্গ আমাকে প্রভাবিত করেছেন। বাস্তবে তা কিন্তু নয়। আমার বর্তমান পরিবর্তনের পেছনে যে জিনিসটি কাজ করে তা ছিলো অনেক বছরের চিন্তা-গবেষণা। এই ক'সপ্তাহ হলো মাত্র ধর্ম বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করি। আমার বলতে বাঁধা নেই, আমি সত্যিকার অর্থে আনন্দিত হয়েছি যে, যেসব থিওরির ওপর আমি বিশ্বাস করতাম তা সবই ছিলো ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

কেউ আমাকে কখনো প্রভাবিত করার চেষ্টা করে নি- এমনকি আমার বন্ধু খাজা কামালুদ্দিনও নয়। তিনি সত্যিকার অর্থে আমার এক প্রকৃত আপনজন, যিনি খুব ধৈর্যসহ কুরআনের কিছু অংশ আমার জন্য অনুবাদ করেন যার সম্পর্কে আমার ধারণা অস্পষ্ট ছিলো। তিনি আমাকে মুসলিম মিশনারী কাজের আসল দিক-নির্দেশনা শিখিয়েছেন। কখনও কাউকে ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করতে নেই। এমনকি বেশি প্রভাবিত করার চেষ্টাও নিষ্প্রোজন। কুরআনের নির্দেশ মতো দীক্ষা শুধুমাত্র আসতে পারে ব্যক্তির মুক্ত পছন্দের মাধ্যমে। ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। জিসাস ক্রাইস্টও একই কথা বলেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেন: 'এবং যে কেউ তোমাদেরকে গ্রহণ করবে না এবং শুনবেও না, তখন তোমরা সেস্থান পরিত্যাগ করবে .. ' (সেন্ট মার্ক, খ.১, ২)

আমি অনেক হিংসাতুর প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদেরকে দেখেছি যারা মনে করে রোমান ক্যাথলিক বাড়িগুলোতে যেয়ে মানুষকে 'দীক্ষিত' করা তাদের দায়িত্ব। এরূপ অস্বস্থিকর ও পড়শীবহির্ভুত কাজ অবশ্যই আপত্তিকর। এসব

কাজের ফলে সৃষ্টি হয় একে অন্যের প্রতি কু-ধারণা- সৃষ্টি করে বাদ-বিবাদ। ধর্মকে ঘৃণ্যতায় পরিণত করা হয়। দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, খ্রিস্টান মিশনারী তাদের মুসলিম ভাইদের ওপর এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তবে কোন কারণে তারা এমন একদল মানুষকে খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত করতে চায় যারা ছিলো তাদের নিজেদের চেয়েও আরো উত্তম খ্রিস্টান, আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি 'উত্তম খ্রিস্টান' কথাটি তুলনামূলকভাবে প্রয়োগ করেছি। কারণ ক্রাইস্ট স্বয়ং যা বলেছেন তার অনুসরণ খ্রিস্টানরা যেমনটি করে তার চেয়ে অনেক ভালো ও উত্তমভাবে অনুসরণ করেন মুসলমানরা। যেমন: বদান্যতা, সহনশীলতা ও প্রশস্তমনতা ইত্যাদিতে মুসলমানরা খ্রিস্টানদের তুলনায় অনেক এগিয়ে।

একটি উপমা দেওয়া যায়। এ্যাথানাসিয়ান বিশ্বাস [Athanasian Creed][১৪] সম্পর্কে ভাবা যায়, এরা ত্রিত্ববাদকে খুব অস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এ বিশ্বাসমতে, যা কিনা চার্চের বিশ্বাসগুলোর মধ্যে অন্যতম- তারা ক্যাথলিক বিশ্বাসকে সমর্থন করে। তাদের বিশ্বাসকে কেউ অস্বীকার করলে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হবে। এরপর আমাদেরে বলা হচ্ছে, নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাইলে ত্রিত্ববাদকে মানতেই হবে। অন্যকথায়, এমন এক গডে আমরা বিশ্বাস করি যাকে এক শ্বাসে আমরা দয়ালু ও সর্বশক্তিমান বলি আর অপর শ্বাসে তাঁকে দোষারোপ করি এই বলে যে, তিনি অন্যায়-অবিচারী ও নিষ্ঠুর! তাদের বিশ্বাস গড যেনো প্রভাবিত হবেন কোনো বেচারা 'ত্রিত্ববাদে' বিশ্বাসী হওয়া কিংবা না হওয়ার মাধ্যমে।

আরেকটি উপমা দেখুন। আমাকে একজন খ্রিস্টান ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে বাঁচাতে পত্র লিখলেন, আপনি যদি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী না হোন তাহলে মুক্তি পাবেন না। ক্রাইস্টের দেবত্ব হওয়ার প্রশ্ন থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার কাছে হচ্ছে এই: তিনি কী গডের বার্তা মানবজাতির নিকট

---

[১৪] খ্রিস্টবাদের মূল বিশ্বাস 'ত্রিত্ববাদ' এর ওপর বিশ্বাস সম্পর্কিত আক্বীদা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট এ্যাথানাসিয়াস (২৯৬/২৯৮ - ৩৭৩ ঈ.)। তিনি লিখেছেন: ফাদার (The Father - পবিত্র পিতা) হচ্ছেন গড (God), পবিত্র পুত্র (The Son - ক্রাইস্ট) হচ্ছেন গড (God), পবিত্র আত্মা (Holy Spirit) হচ্ছেন গড (God)। -wikipedia.com

পৌঁছুয়েছেন? এ ব্যাপারে আমার মধ্যে যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে সেটা হবে মারাত্মক। কিন্তু ধন্যবাদ মহান প্রভুর প্রতি, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্রাইস্ট তাঁর বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছুয়েছেন। তাঁর শিক্ষা দ্বারা মুসলিম কিংবা খ্রিস্টানগণ উপকৃত হতে পারেন। যেমনটি আমি প্রায়িই বলে থাকি, 'ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ সহোদরা ধর্ম'। এদেরকে বিশ্বাস ও কলাকৌশলগত দিক থেকে আলাদা করা হয়েছে মাত্র।

আজকের যুগে মানুষ সহজেই 'বিশ্বাসহীন' হয়ে পড়ছে। যখনই তাদেরকে যুক্তিহীন ও অসহনীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়, তারা এ থেকে দূরে সরে পড়ে। নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিসম্পন্ন ও ভাবানুরাগী ধর্মবিশ্বাসের জন্য মানুষের মধ্যে সর্বদাই ব্যগ্রতা বিদ্যমান। কেউ কী কোনোদিন শুনেছেন যে, একজন সত্যিকার মুসলমান নাস্তিক হয়েছে? হয়তো থাকতে পারে- তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। এরূপ কেউ করবে- তা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য।

আমি মনে করি, হাজার হাজার পুরুষ ও নারী আছেন যারা অন্তরে মুসলমান। কিন্তু নিয়মনীতি, বিরূপ মন্তব্য দ্বারা আঘাতপ্রাপ্তি ইত্যাদির ভয়ে তারা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছেন না প্রকাশ্যে। এ ব্যাপারে আমি পদক্ষেপ নিয়েছি- যদিও আমি অবহিত আছি যে, আমার অনেক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন এখন আমাকে একটি পথভ্রষ্ট আত্মা হিসেবে মনে করেন এবং আগের অবস্থায় ফিরে যেতে উপাসনায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু বাস্তবে বিশ বছর পূর্বে আমি যা বিশ্বাস করতাম এখনও তা-ই বিশ্বাস করছি।

ইসলাম গ্রহণ করার কিছু উত্তম কারণ বর্ণনা এবং একই সময় আমি আগে থেকে একজন উত্তম খ্রিস্টান হয়েছি মাত্র। এটুকু বুঝানোর পর আমি আশা করবো যে, অন্যরা আমাকে অনুসরণ করবে [এবং ইসলামকে গ্রহণ করে নেবে]। সত্যিকার অর্থে আমি মনে করি এরূপ করা হবে তাদের জন্যই উত্তম কাজ।[১৫]

---

১৫ A western Awakening to Islam, pp. 11-13

মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথাল

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ইংল্যান্ড

যার কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে অনেক মানুষ ইসলামগ্রহণ করেছেন

মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথাল ১৮৭৫ সালে বৃটেনের রাজধানী লন্ডনের অভিজাত এলাকা ক্যাম্ব্রিজ টেরেসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মনাম ছিলো মারমাডিউক উইলিয়াম পিকথাল। পৃথিবীব্যাপী তিনি কুরআন শরীফের ইংরেজি অনুবাদক [দ্যা মিনিং অব গ্লোরিয়াস কুরআন] হিসেবে সুপরচিতি। একজন গল্পকার হিসেবেও তার সুনাম ছিলো। বিখ্যাত লেখক ডি. এইচ. লরেন্স (১৯৮৫-১৯৩০), এইচ. জি. ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬) এবং ই. এম. ফস্টার (১৮৭৯-১৯৭০) লেখক হিসেবে তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন।

তাঁর ইসলামগ্রহণের ঘোষণা ছিলো নাটকীয়। ২৯ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে 'ইসলাম ও প্রগ্রেস' এর ওপর একটি সেমিনারে তিনি ছিলেন একজন অতিথি বক্তা। স্থানটি ছিলো পশ্চিম লন্ডনের নটিং হিল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'মুসলিম লিটারেরি সোসাইটি'[১৬]। বক্তৃতা দানের সময় তিনি উপস্থিত বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রোতাবৃন্দের সম্মুখে বলে ওঠলেন: এখন থেকেই আমি আর খ্রিস্টান নই বরং মুসলমান। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

মারমাডিউক পিকথালের পিতার নাম ছিলো রেভারেন্ড চার্লস গ্রেসন পিকথাল (১৮২২-১৮৮১)। তাঁর মাতার নাম ছিলো মেরি হেইল। পিতা ছিলেন এ্যাংলিকান চার্চের[১৭] একজন পাদ্রী। পিকথালের পূর্বপূরুষ ছিলেন

---

[১৬] বিখ্যাত এ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী। লন্ডনের নটিংহিলে এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৬ সালে।

[১৭] চার্চ অব ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত একটি চার্চ।

নরম্যান বাদশাহ উইলিয়াম দ্যা কনকুরার (১০২৮-১০৮৭) এর উচ্চপদস্থ সৈনিক ও নাইট। তার নাম ছিলো স্যার রজার ডি পয়েকটু।

পিকথালের শিশুকাল কাটে সাফোক কাউন্টিতে স্থাপিত তাদের গ্রামীণ কটেজে। তিনি অল্প বয়সে মারত্মক রোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে হাম ও পরে ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে না বাঁচার হালত হয়। এসময় তাঁর বয়স মাত্র ৬ মাস। তবে যিনি হবেন আল্লাহর পবিত্র কুরআনের অনূবাদক তিনি কী আর এতো অল্প বয়সে মরতে পারেন? অচিরেই শিশু পিকথাল সুস্থ হলেন। তার পিতা ১৮৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে পরিবারের সবাই চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডনের শহরতলী হ্যারো অঞ্চলে স্থাপিত বিখ্যাত পাবলিক স্কুলে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। হ্যারো স্কুলে তাঁর একজন বিখ্যাত সহপাঠী ছিলেন স্যার উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫)।

অল্প বয়সেই মারমাডিউক পিকথাল প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যান। মধ্য-প্রাচ্যের ওপর বিশেষজ্ঞ একজন স্কলার হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগ থেকেই তিনি তখনকার উসমানী খিলাফতের (১২৯৯-১৯২৪) সমর্থক ছিলেন। তিনি অরিয়েন্ট (প্রাচ্য) সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করেন ও বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং উপন্যাস প্রকাশ করেন প্রাচ্যের ওপর।

পরে পিকথাল ভারতে ভ্রমণে যান। সেখানকার স্বাধীন অঞ্চল ছিলো হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের নিযাম নবাব স্যার উসমান আলী খান সিদ্দিকী (১৮৮৬-১৯৬৭) পিকথালকে আমন্ত্রণ করে তার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। এখানে থকাকালেই নিযামের অনুরোধ ও আর্থিক সহযোগিতায় পিকথাল কুরআনের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদকে সত্যায়িত করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। বিখ্যাত সাময়িকী 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট' মন্তব্য করেছিলো: "দ্যা মিনিং অব গ্লোরিয়াস কুরআন- ইংরেজি ভাষায় অনূবাদ

হচ্ছে একটি বিরাট সাহিত্যিক অর্জন ও কৃতিত্ব’। তবে পিকথাল নিজে লিখেন: কুরআনের অনুবাদ অসম্ভব। মূল আরবি ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য ছাড়া কুরআনকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এজন্য অনুবাদের নামকরণ হয়েছে, ‘দ্যা মিনিং অব গ্লোরিয়াস কুরআন’ [দ্যুতিময় কুরআনের ভাবার্থ]।

মুহাম্মদ মারমাডিউক পিকথাল তুর্কি খিলাফতের পক্ষাবলম্বন করেন যখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় [১৯১৫ সালে] আর্মেনিয়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। তিনি বলেন, গণহত্যার জন্য এককভাবে খিলাফতকে দায়ী করা ঠিক হবে না। তাঁর এ মন্তব্যে বৃটিশ সরকার খুব রাগান্বিত হয়। এসময় সরকারী পলিসি ছিলো যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মুসলিমদের কর্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সকে সমর্থনের প্রপাগান্ডা করা। এক সময় বৃটিশ মুসলিমদেরে পাবলিকভাবে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা যুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে- অ্যালাইজ (বৃটের ও ফ্রান্স) না সেন্ট্র্যাল পাওয়ার (জার্মানি ও তুর্কী)? পিকথাল এর জবাবে বললেন, “আমার দেশের জন্য যুদ্ধে যেতে আমি রাজি- কিন্তু কোনো তুর্কী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না!”

সুন্নি হানাফি মাজহাবের অনুসারী মুসলিম হিসেবে তিনি জীবনের শেষ অবধি মুসলমানদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দাওয়াতী কাজে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি খতিব হিসেবে ওয়াকিং মসজিদ ও পূর্ব লন্ডন মসজিদে বয়ান করেছেন। তাঁর কিছু খুতবার সংকলন পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়। লন্ডনের ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো অফিসে তিনি এক বছর ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রতিষ্ঠান থেকে একটি সাপ্তাহিক সাময়িকী বের হতো। এটির নাম ছিলো ‘দ্যা মুসলিম আউটলোক’। এছাড়া মুহাম্মদ পিকথাল ও অপর বিখ্যাত কুরআন অনুবাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী (১৮৭২-১৯৫৩) পূর্ব লন্ডন মসজিদ ও ওয়াকিংয়ের শাহজাহান মসজিদের ট্রাস্টি ছিলেন।

ঈসায়ী ১৯২০ সালে তিনি ও তাঁর স্ত্রী চলে যান ভারতের মুম্বাইয়ে। তিনি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন সেখানকার প্রতিষ্ঠিত সাময়িকী 'বুম্বাই ক্রনিকল' নামক পত্রিকার। পনেরো বছর পর ১৯৩৫ সালে ফিরে যান লন্ডনে। এর ১ বছর পর ১৯৩৬ সালে কর্নওয়ালের সেন্ট-আইভে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইংল্যান্ডের সারী শহরে অবস্থিত বৃটেনের সর্ববৃহৎ কবরস্থান ব্রুকউড সেমেট্রির মুসলিম অংশে তিনি সমাহিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ এ বান্দার কবরকে নূরান্বিত করুন। আমীন।[১৮]

[১৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Marmaduke_Pickthall; ইসলাম আওয়ার চয়েজ, পৃ. ১০১।

আয়শা আবদুজ জহির

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ভারত

খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন

ইসলামকে একমাত্র 'ফিতরাহ'-এর ধর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে জন্মগতভাব সব মানুষ মুসলমান। শিশু কোন্ মা-বাবার ঘরে ও পরিবেশে জন্ম নিয়েছে তা-ই নির্ধারণ করে সে বেড়ে ওঠবে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইয়াহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ না অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী হিসেবে। এই ফিতরাহকে বুঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে নও-মুসলিমরা মূলত নিজেদের ফিতরাতের ধর্মে ফিরে এসেছে (বা প্রতাবর্তন করেছে) মাত্র। আজকের যুগে সমগ্র বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামে প্রত্যাবর্তন করছে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রতি ৫ জন নও-মুসলিমের মধ্যে ৪ জনই নারী। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, বাস্তবে ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার দিয়েছে তা আর কোনো ধর্ম দেয় নি। নিচে আমরা এমন এক নারীর আত্মকথা শুনবো যিনি ইসলামের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করে প্রত্যাবর্তন করেছেন। নিজেকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করেছেন, ধর্ম হিসেবে ইসলাম ও নবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নিয়েছেন। ইসলামে ভ্রমণের এ কাহিনী তার নিজের ভাষায়ই বর্ণনা করেছেন।

আমার চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হওয়ার পর থেকেই একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে বিশ্বাস জন্মে। আমি জানতাম যাকিছুই অস্তিত্বশীল তা সবই নির্ভরশীল তাঁরই ওপর। আমার মাতা-পিতা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। আমি যখন সবেমাত্র ১৩ বছরের মেয়ে, তখন থেকেই ঐ একক সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রায় প্রতিদিনই প্রার্থনা করতাম, তিনি যেনো আমাকে সঠিক দিকনির্দেশা দেন। বৌদ্ধ মা-বাবার সন্তান হয়েও কিন্তু আমি যে স্কুলে পড়তাম তা ছিলো খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং আমি নিজেকে খ্রিস্টানও ভাবতাম স্বভাবতই।

দুর্ভাগ্যবশত, এ সময় ইসলামের ওপর আমার জ্ঞানের মাত্রা ছিলো সর্বনিম্নে। আমি মনে করতাম ইসলাম একটি উদ্ভট ধর্ম। শুধুমাত্র ক'টি গরিব দেশে এর বিস্তার। এগুলোর অধিকাংশ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। এ ধর্মাবলম্বীরা অত্যন্ত দমনপীড়ন চালায় তাদের মহিলাদের প্রতি। মুসলিম নারীরা, আমি ভাবতাম- সর্বদাই পুরুষদের নিকট নিচ প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। নারীরা ছিলো সাধারণ ঘরোয়া দাসী। চারের একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামীর আকর্ষণ পেতে সর্বদা প্রতিযোগিতায় থাকতে হয়। এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলে ছিলো জনশ্রুতি, অজ্ঞদের সঙ্গলাভ এবং টিভিতে প্রচারিত সত্যমিথ্যা মিশ্রিত প্রোপাগান্ডামূলক একাধিক অনুষ্ঠান যেখানে ইরান ও সৌদি আরবে নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রায় তিন বছর পূর্বে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। এসময় বেশ ক'জন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। এ ছাত্ররা এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। উত্তম আচার-আচরণে তাদের প্রতি আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। আমি তাদের ধর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে আগ্রহ অনুভব করি। আমি লক্ষ করলাম, নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর তারা খুব সন্তুষ্ট। তাদের ধর্ম নিয়ে আলাপচারিতায় ছিলো সততা, প্রশস্ততা এবং উন্মুক্ততা। তারা সবাই আমার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম ইতোমধ্যে এ মহান ধর্ম সম্পর্কে যা জানতাম তার বেশিরভাগই ছিলো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা মাত্র।

ক্রমান্বয়ে ইসলাম আমাকে মুগ্ধ করে তুললো। অধ্যয়ন, চিন্তা-গবেষণা হেতু এর প্রতি আমার এমন উচ্চ ধারণা ও সম্মানবোধ এলো যে, খ্রিস্টধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এমনটি কখনও ইতোমধ্যে অনুভব করি নি। অতীতে আমি কী পরিমাণ ভ্রান্তিতে ছিলাম তা অনুধাবন করে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বিশেষকরে নারীদের প্রতি ইসলামের সমধিকার দান ও সম্মানবোধ সম্পর্কে অবগত হয়ে সত্যিই আশ্চর্য হলাম। আমি বুঝতে পারলাম বাস্তব ইসলামিক জীবনব্যবস্থা ও আমেরিকার আবিষ্কৃত 'ইসলামিক মৌলবাদ' বলতে কী ছিলো।

বেশি বেশি করে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন হেতু আমার সম্মুখে প্রমাণ ও উপমা উন্মোচন হচ্ছিলো। আমার অন্তরে ক্রমান্বয়ে উষ্ণতার জন্ম নিচ্ছিলো। আমি চাচ্ছিলাম ইসলাম সম্পর্কে সবকিছু জানবো। এ মহান ধর্মের অনুসারীদের একজন হিসেবে নিজেকে দেখতে লাগলাম।

আমাকে যে জিনিসটি সর্বাধিক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে, সেটা হলো ইসলাম কী অপূর্ব প্রায়োগিক এক ধর্ম! বেঁচে থাকার প্রতিটি ক্ষেত্রে কী সুন্দরভাবে এটি দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টবাদের ডগমা (বিশ্বাস) ও থিওলজির মধ্যে যেসব মারাত্মক ভ্রান্তি ছিলো তা আমার নিকট ধরা পড়লো।

দুপুরের সময়, আগস্ট ৪, ১৯৯৪ সালে ২০ জন সাক্ষীর সামনে আমি শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করি। তখন থেকেই আমি প্রকাশ্যে মুসলিমা হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হই। আলহামদুলিল্লাহ! এ দিনে যে প্রশান্তি আমার অন্তরে অনুভব করেছিলাম, তা আমি কখনও ভুলবো না। মাত্র একটি বছর অবিাহিত হয়েছে। অথচ আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে।

চরম নির্যাতনের শিকার

ধর্মকে পরিববর্তন করায় আমাকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। পারিবারিক দরবার ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গী। সইতে হয়েছে মৌখিক গালিগালাজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হুমকি-ধমকি। অনেকবার আমার কক্ষটি তছনছ করা হয়েছে। গ্রন্থাদি গায়েব হয়েছে। খুব অপত্তিকর ফোন ম্যাসেজ এসেছে। কোনো কোনো সময় আমাকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়েছে এবং খাবর গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। খাবার হিসেবে শুধুমাত্র শূকরের মাংস ছাড়া আর কিছুই পাক করা হয় নি। থাকা-খাওয়াসহ নিজেই আর্থিক যোগান দিতে হয়েছে বেঁচে থাকতে। আমার লেখালেখি, মসজিদ ও অন্যান্য ইসলামী অনুষ্ঠানে গমনাগমন গোপনে করতে হয়েছে। কেউ সামনে থাকলে

কখনও নামায আদায় করার সাহস করতে পারি নি। ইত্যাদি বহুতরের শারীকির ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে আমাকে।

আলহামদুলিল্লাহ! সত্যধর্ম ইসলামের জন্য উপরে বর্ণিত নির্যাতনের শিকার হয়েও আমি মোটেই বিচলিত নই। আন্তরিকভাবে আমি এখন থেকে আরো বেশি প্রশান্তি কখনো অনুভব করি নি। কেউ ভাববেন না, এসব কথা ব্যক্ত করে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, ইসলামগ্রহণ একটি কষ্টকর ব্যাপার। না, না, তা মোটেই নয়। বাস্তবে ইসলাম আমাকে ইতোমধ্যে যেসব প্রতিদান উপহার দিয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমি ভাবি, না জানি পরজীবনের বেহেশতের সুখ-শান্তি আরো কতো মনোমুগ্ধকর ও প্রশান্তির।

গত এক বছরব্যাপী আমি ইসলামী জ্ঞানার্জনের ওপর খুব বেশি সময় অতিবাহিত করেছি। এছাড়া পবিত্র কুরআন শরীফের ওপর অধিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার পরিচিতি পাকাপুক্ত করেছি। আমি নিজের ওপর বেশি থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী। এখন আমি অধিক শক্তিশালী একজন নারী। নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে সচেতন। জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হতে প্রস্তুত।

এই লেখা দ্বারা কতটুকু কী অর্জন করেছি তা বলতে পারবো না। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের মহান আল্লাহর মাহাত্ম্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তিনিই সবকিছু সংঘটনে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।" (যুমার (৩৯): ২৩ [অংশ])

সত্যিকার অর্থে আমি হচ্ছি সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত একজন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের নূর দান করে হৃদয়কে আলোকিত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।[১৯]

[১৯] https://www.muslimconverts.com/converts/Asiya.htm

প্রফেসর ড. হারুন মুস্তফা লিওন

প্রাক্তন খ্রিস্টান - যুক্তরাজ্য

তিনি ছিলেন উচ্চশ্রেণির বৃটিশ বংশের সন্তান। তার উপাধি ছিলো ব্যারন। সুশিক্ষিত এ বৃটিশ বুদ্ধিজীবী ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামে দীক্ষিত হন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন প্রফেসর লিওন। ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো। তিনি একজন অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদও ছিলেন।

একজন বিজ্ঞানী হিসেবে বিভিন্ন সেমিনারে তাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হতো। তাঁকে 'ইন্টারনেশন্যাল সোসাইটি ও ফিলোলজি, বিজ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন' এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। এ সংঘটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি 'ফিলোমেথস' নামক একটি সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। উসমানী সুলতান আবদুল হামিদ ২য়, শাহ অব ইরান এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁকে বিভিন্ন মেডেল ও উপাধিতে ভূষিত করেন। বিখ্যাত এই ভিক্টোরিয়ান নও-মুসলিমের নিজের ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য শ্রবণ করবো।

তিনি বলেন, "ইসলাম ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর অনুসারীদের কখনও যুক্তির বাইরে কোনো কর্ম সমাধানের জন্য উৎসাহিত করে না। ইসলাম একটি ধর্ম যার শিক্ষা হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিসম্পন্ন ও সঠিক। অপরদিকে অন্যান্য ধর্ম মানুষকে ক্রিড (যুক্তিহীন বিশ্বাস) মেনে নিতে জোরজবরদস্তি করে। মানুষ এসব ক্রিডে বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিকতা কখনও খুঁজে পায় না বা পাওয়ার পথ থেকে বিরত করা হয়েছে। খ্রিস্টবাদের কথা বলা যায়। এখানে চার্চ হচ্ছে একমাত্র কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে মুসলমানদের বিশ্বাস (ঈমান আনতে) করতে বলা হয়েছে চিন্তা-গবেষণা করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু সৃষ্টি করেন নি যা বেআইনী বা অযৌক্তিক।" অপর এক হাদিসে তিনি বলেন: "আমি

তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলে দিচ্ছি, যদি কেউ নিয়মিত দৈনিক নামায পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, জাকাত দেয় ও হজ্জ পালন করে তবুও সে বেহেশত লাভ করবে না যতক্ষণ না তার নিয়ত খালিস হবে।”

হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম কর্তৃক প্রচারিত পবিত্র ধর্মেও অনুরূপ আইন-কানুন আছে। যেমন, “প্রথমে সবকিছু চেষ্টা করো! গ্রহণ করো শুধু ভালোটি।” কিন্তু এসব আইন-কানুন সময়ের করালগ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সূরা জুমুআর ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে: “যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।” (জুমুআ (৬২): ৫)

হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: “পৃথিবীটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। জ্ঞান হচ্ছে একটি নূর (আলো)! তবে অশুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে অস্পষ্টতা।”

মুসলমানরা বিশ্বাস রাখেন যে, ইসলাম স্বয়ং মহাসত্য। তারা বলেন, ইসলামের আলো উজ্জ্বল হয় জ্ঞান ও যুক্তির শক্তি দ্বারা। আর এ জ্ঞান আসে একমাত্র সত্য থেকে। আর সত্যকে মানুষ আবিষ্কার করে সত্যচেতনা দ্বারা। এ চেতনা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ, উম্মতকে সঠিক রাস্তায় চলতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিনগুলোতে থাকাবস্থায় একটি ঘটনা ঘটে। সেটা হলো এই: ইন্তিকালের দুদিন পূর্বের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় স্ত্রী উম্মতজননী হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সমগ্র মদীনাবাসী তাঁর অসুস্থতা হেতু ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুরুষ, মহিলা, শিশুরা ক্রন্দন করছিলেন। ক্রন্দরত ছিলেন পাকা চুলবিশিষ্ট চেহারায় ভাঁজপড়া অনেক বয়স্ক মুজাহিদ। মুহাম্মদ মুস্তফা আল-আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁদের কমান্ডার, পথপ্রদর্শক, নেতা, সঙ্গী, মেষপালক, একান্ত বন্ধুজন এবং সর্বোপরি আল্লাহর মহান নবী যিনি তাঁদেরকে মিথ্যার অন্ধকার

থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন মহাসত্যের আলোর দিকে। শিক্ষা দিয়েছেন মহাসত্যের ধর্ম ইসলাম। এ সুমহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন। তাঁদের প্রিয় নবী চলে যাচ্ছেন, এ অচিন্তনীয় ভাবনা হেতু তাদের হৃদয়ে যেনো হাতুড়ির আঘাত লাগছিলো। অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিলো চোখ ও চেহারা। তাঁরা গভীরভাবে অসহায় বোধ করছিলেন।

অবশেষে, তাঁরা সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার বস্তবতা অনুভব করলেন। একান্ত নিরাশ হয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন রাসূলের কক্ষে। অশ্রুসজল চোখে তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভীষণভাবে পীড়িত। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাবেন। আপনি আমাদের মাঝে আর থাকবেন না। আমরা আপনাকে ছাড়া কীভাবে চলবো?"

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, "তোমদের নিকট কুরআন শরীফ আছে- তোমরা এ থেকেই দিক-নির্দেশনা পাবে।" তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা নিশ্চিত যে কুরআনে করীম হবে আমাদের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আমরা কোনো ব্যাপারে আটকে গেলে এর সমাধান যদি কুরআনে না পাই তাহলে কী করবো?" এ প্রশ্নের জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা আমার হাদিসকে অনুসরণ করবে।" এবার সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, "যেহেতু আপনি আমাদের সাথে থাকবেন না এবং যে ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন তা যদি আপনার হাদিসেও পাই না, তাহলে আমরা কী করবো?" আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুবারক উত্তোলন করে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাহকে ব্যক্তিগত পথপ্রদর্শক দান করেছেন। তার পথপ্রদর্শক হচ্ছে সাধারণ চেতনা

ও হৃদয় যার সমন্বিত বস্তু হলো বিবেক। তোমরা যদি এ পথপ্রদর্শককে সঠিক রাস্তায় চালাতে সক্ষম হও তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।[২০]

এটাই হচ্ছে ইসলামধর্ম যার অনুসারী হয়ে আমি কৃতজ্ঞ। এটাই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র সত্যধর্ম, যা পুরোটাই যৌক্তিক। সম্পদের বড়াই থেকে বিরত থেকো। এটা বলো না- "কে আছে আমার মতো!" যেভাবে ফসলকে তুফান এসে ধ্বংস করে দেয়- সেরূপ তোমার সবকিছু উড়ে যেতে পারে মুহূর্তে।"[২১]

[২০] এখানে ইজতিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও তাঁর ছাত্র ফুকাহাহে কিরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় চারটি ইসলামী ফিকহ (মাজহাব) যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম সংরক্ষিত আছে এবং থাকবেও রোজ কিয়ামত পর্যন্ত।

[২১] https://beliefandislam.com/bhml/

ক্যাট স্টিভেনস - ইউসুফ ইসলাম

প্রাক্তন খ্রিস্টান - যুক্তরাজ্য

পপ গায়ক থেকে মুসলমান

বিখ্যাত এ নও-মুসলিম সম্পর্কে অল্প-বিস্তর অনেকেরই জানা আছে। এরপরও পাঠকদের খোরাক যোগাতে এ পপ (পপুলার- জনপ্রিয়) গায়কের নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি ইসলামের প্রতি তার অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী। তবে এর পূর্বে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

উইসুফ ইসলামের জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে। তার জন্মনাম ছিলো স্টিভেন ডিমিট্রি জর্জিউ। তবে পরবর্তীতে পপ গায়ক হিসেবে তিনি ক্যাট স্টিভেনস নামে পরিচিত হন। সফল এ বৃটিশ গায়ক ১৯৭৭ সালে এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দীক্ষিত হন। গিটার বাদক এ গায়ক ১৯৭৯ সালে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিজের সকল গিটার নিলামে বিক্রি করেন। এরপর গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ মুসলিম কমিউনিটির শিক্ষাব্যবস্থা ও উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে জড়িত হন। তিনি একটি ইসলামী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইউসুফ ইসলাম বর্তমানে ইসলামী সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত আছেন।

ইউসুফ ইসলামের পিতার নাম ছিলো স্টাবরোস জর্জিউ। তিনি গ্রিক-সাইপ্রাস থেকে বিলেতে পাড়ি জমান। ইসলামের মাতার নাম ছিলো ইনগ্রিড উইকম্যান। তিনি ছিলেন সুইডিশ নাগরিক। তার পিতা ছিলেন গ্রিক অর্থোডক্স খ্রিস্টান এবং মাতা ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান। ইউসুফ ইসলামের শিক্ষা শুরু হয় সেন্ট জসেফ রোমান ক্যাথলিক প্রাথমিক স্কুলে। পরবর্তীতে হ্যামারস্মিথ স্কুল অব আর্টস-এ অধ্যয়ন করেন। তবে স্টিভেন ডিমিট্রির বিশেষ আকর্ষণ ছিলো সঙ্গীতের প্রতি। তার প্রথম গানের এ্যালবাম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। সেই থেকে তিনি দীর্ঘদিন পপ মিউজিকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তিনি বলেন, “সবাই যা ইতোমধ্যে জেনে নিয়েছেন তা-ই আমাকে বলতে হচ্ছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা যা তাঁকে দান করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ তা’আলা- সত্যের ধর্ম ইসলাম।

মনুষ হিসেবে আমাদেরে দান করা হয়েছে চেতনাক্ষমতা ও একটি কর্তব্য যা আমাদেরকে করেছেন সৃষ্টির মধ্যে সেরা। এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আমাদেরকে সকল জাগতিক মরীচিকা থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত পরজীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

যদি কেউ এ সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে সবই হারালো। কারণ তাকে পুনরায় এ সুযোগ আর দেওয়া হবে না। আল্লাহর পবিত্র নূরোজ্জ্বল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, মানুষকে যখন হিসেব-নিকাশের জন্য একত্রিত করা হবে, তখন তাদের একদল আবদার জানাবে: “হে প্রভু! আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, আরেকবার সুযোগ দিন যাতেকরে আমরা আপনার ইবাদত করেত পারি।” প্রভু জাবাবে বলবেন: “আমি যদি তোমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়েও দিই- তবুও তোমরা একইভাবে চলবে।”

প্রাথমিক অবস্থায় আমার ধার্মিক হিসেবে বেড়েওঠা

আমার জন্ম হয় একটি খ্রিস্টান পরিবারে। তবে আমি বেড়ে ওঠি আধুনিক পশ্চিমা উন্নত জীবনের মধ্যে একজন পপ গায়ক হিসেবে। আমরা জানি প্রত্যেক শিশুই জন্ম নেয় তার ফিতরতের মধ্যে। অর্থাৎ ইসলামে। কিন্তু তার পিতা-মাতা এই-সেই ধর্মে বড় করে তুলেন। আমাকে খ্রিস্টবাদের ওপর বড়ো করা হয়েছিল- দেওয়া হয়েছিল এর বিভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা। আমাকে বলা হয়েছিল, আল্লাহ অস্তিত্বশীল আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব নয়। মুতরাং জিসাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি ছিলেন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুনোর দরোজা। আমি প্রথমে এসব ব্যাপার মোটামুটি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার অন্তরে তেমনটি প্রোথিত হয় নি।

আমি জিসাসের কিছু মূর্তির দিকে তাকাই। এগুলো সবই তো শুধুমাত্র প্রাণহীন পাথর! এবং যখন তারা (খ্রিস্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকরা) বলেন, গড তিনজন, তখন আমি খুব হতবুদ্ধি হয়ে যাই আরো বেশি। কিন্তু সমালোচনা আর তর্কের সুযোগ ছিলো না। আমি দেখিয়েছি, এতে বিশ্বাসী। কারণ নিজের পিতা-মাতার ধর্মকে সম্মান করা আমার দায়িত্ব ছিলো।

পপ তারকা

ক্রমান্বয়ে আমি উক্ত খ্রিস্টধর্ম থেকে দূরে সরে পড়ি। আমি সঙ্গীতচর্চা শুরু করি। আমি চাচ্ছিলাম একজন বড় তারকা হবো। মিডিয়া ও ছবিতে আমি যা কিছু দেখছিলাম তা আমাকে আড়ষ্ট করে বসে। ভাবছিলাম হয়তো এটাই আমার গড, টাকা বানানো। আমার এক চাচা ছিলেন যার ছিলো একটি অতিসুন্দর গাড়ি। ভাবলাম, তার অনেক টাকা আছে, তিনি অনেক ধনী। আমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা আমি প্রভাবিত হলাম, এটাই (ধনী হওয়া) হচ্ছে তাদের ধর্ম।

আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম- আমার জীবন এটাই হবে: অনেক টাকা রোজগার করা এবং একটি উত্তম জীবন গড়ে তুলা। আমি দেখলাম সহজে টাকা বানায় পপ তারকারা। আমি গান করতে থাকি। তবে গভীরে মানবতার প্রতি আমার মধ্যে এক বিশেষ অনুভূতি ছিলো। ভাবতাম, আমি ধনী হয়ে গরীবদেরে সাহায্য করবো। কুরআনে আছে: আমরা কোনো প্রতিজ্ঞা করি, যখন তা পূরণ হওয়ার সুযোগ আসে তখন আমরা সব ভুলে যাই, আমাদের মধ্যে লোভ এসে দানা বাধে।

সুতরাং, আমি হয়ে ওঠি বিখ্যাত। তখনও কিন্তু একটি টিনেজ যুবক ছিলাম মাত্র। সকল মাধ্যমে আমার নাম ও ছবি প্রচারিত হতে থাকে। তারা আমাকে জীবন থেকেও বড়ো করে দিলো। আমি চাচ্ছিলাম জীবন থেকে বড়ো হিসেবে বাস করতে। এটা অর্জনের একমাত্র পথ ছিলো (মদ ও ড্রাগের) নেশায় মত্ত হওয়া।

হাসপাতালে

আর্থিক সফলতা ও 'উচ্চাঙ্গবাস' এর ১ বছর পর আমি ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হলাম। আমি আক্রান্ত হলাম টিবিতে। আমাকে যেতে হলো হাসপাতালে। এসময়ই আমি ভাবতে থাকি, আমার কী হবে? আমি কী শুধুমাত্র একটি যুবক ছেলে ছিলাম যার উদ্দেশ্য ছিলো নিজের দেহের ক্ষুধাকে নিবারণ করা? এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, ঐ সময়ের বিপর্যয় ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ। নেত্র খুলে যাওয়ার একটি সুযোগ: 'আমি কেনো এ পৃথিবীতে এসেছি? আমি কেনো হাসপাতালের বেডে পড়ে আছি? আমি হন্যে হয়ে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে লাগলাম।

এসময় পশ্চিমাদের মধ্যে প্রাচ্যের মরমিবাদের ওপর বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আমি পাঠ করতে শুরু করি। প্রথম ব্যাপার আমার নিকট উন্মোচন হয় যে মৃত্যুর পরও আত্মা জীবিত থাকে- এটা ভ্রমণ করতে থাকে। ভাবলাম, হয়তো আমি উজ্জ্বল প্রশান্তির রাস্তায় এবার ভ্রমণ করবো। লেগে গেলাম মেডিটেশনে। এমনকি রূপান্তর হলাম নিরামিষাশী হিসেবে। শাক-সবজি ছাড়া আর কিছু খেতাম না। আমি এখন বিশ্বাস করি 'শান্তি ও পুষ্টক্ষমতায়'! এটা ছিলো যুগের প্রভাব। তবে হাসপাতালে থাকতে সবশেষে একটা বিষয় আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমি শুধু-শুধু দেহবিশিষ্ট একটি প্রাণী ছিলাম না।

একদিন আমি হেঁটে চলছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো মূষলধারে। আমি দৌড়াতে থাকি বৃষ্টি থেকে বেঁচে যেতে। এসময় একটি ভাবনা আসলো, 'এক মিনিট! আমার দেহ ভিজে যাচ্ছে, আমার দেহ আমাকে বলছে তুমি ভিজে যাচ্ছো!'। এটা আমাকে একটি প্রবাদবাক্য স্মরণ কেরিয়ে দেয়: দেহ হচ্ছে একটি গাধার মতো। তাকে শিক্ষা দিতে হবে কোথায় যেতে হবে। অন্যথায় গাধা তোমাকে নিয়ে যাবে যেখানে সে যেতে চায়।

এরপর আমি অনুভব করলাম যে, আমার ইচ্ছে শক্তি আছে- প্রভুপ্রদত্ত ইচ্ছেশক্তি। সুতরাং প্রভুর ইচ্ছেকে অনুসরণ করো। প্রাচ্যের ধর্ম থেকে যেসব ব্যাপার আমি শিখে নিচ্ছিলাম তা আমাকে অভিভূত করতে থাকে। এখন আমার মধ্যে খ্রিস্টবাদের ওপর কিছুটা অস্বস্থি বিরাজ করছিলো। আমি আবার

গানের দিকে মনোযোগ দিলাম। এবার আমি নিজের চিন্তা-চেতনার প্রতিফল ঘটাচ্ছিলাম সঙ্গীতে। আমার একটি গানের কথা মনে পড়ছে। এটা হচ্ছে এই: "আমি আশাকরি আমি জানতাম, আমি আশাকরি আমি জানতাম স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে কিসের দ্বারা, কিসে তৈরি হয়েছে নরক। আমি তোমাকে (প্রভু) জানতে পারি আমার শয়নে কিংবা কোনো ধূলিতে আবৃত জেলে- আর অপররা যখন পৌঁছুয়েছে বড়ো হোটেলে?" এবং আমি জানতাম, আমি পথের মাঝে আছি।

আমি আরো একটি গান রচনা করি: "গডকে পাওয়ার পথ"। আমি এবার মিউজিক বিশ্বে আরো ফেমাস হলাম। একই সময় খুব কষ্টকর সময় অতিক্রম করছিলাম যে, আমি আরো ধনী ও সুপরিচিত হচ্ছিলাম- অথচ একই সময় আন্তরিকভাবে সত্যের সন্ধানে ব্রত ছিলাম। এরপর আমি সে স্তরে উপনিত হই যে, বৌদ্ধবাদই ছিলো সঠিক। তবে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার মতো স্তরে এখনও পৌঁছাই নি। আমি তখনও দুনিয়ার প্রতি অতিবেশি সম্পৃক্ত ছিলাম। বৌদ্ধ ভিক্ষু সেজে সমাজ থেকে দূরে সরে যেতে তখনও মন চাচ্ছিলো না।

এরপর জৈন ও চিং ধর্ম নিয়ে গবেষণা করি। আমি বুঝতে চেষ্টা করি কী ছিলো, 'নাম্বারবাদ', ট্যারট কার্ডস ও জ্যোতিষশাস্ত্র? আমি পুনরায় বাইবেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি- কিন্তু কিছুই পাই নি। আমি তখনও কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এরপর ... আমি যাকে অলৌকিক বলবো, সেরূপ এক ঘটনা ঘটে। আমার ভাই জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ ভ্রমণ করেন। তিনি অনুভূতি বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, একদিকে এতো মানুষের জমজমাট উপস্থিতি (যা খ্রিস্টান চার্চ ও ইয়াহুদি সিনোগগে নেই) ছিলো অপরদিকে সেখানে বিদ্যমান দেখতে পাই এক আশ্চর্য প্রশান্তিও।

কুরআন শরীফ

আমার ভাই জেরুজালেম ভ্রমণ শেষে যখন লন্ডনে ফিরে আসেন, তিনি নিয়ে আসেন অনূদিত এক জিলদ কুরআন শরীফ। তিনি এটি আমাকে উপহার দেন। আমি মুসলমান ছিলাম না। তবে তিনি অনুভব করেন, এতে এমন কিছু আছে যা আমি হয়তো আগ্রহভরে পাঠ করবো।

শুধু আগ্রহ নয়- আমি দেখলাম এটাই তো আমি খুঁজছিলাম। আমি দেখলাম এতে আছে এমন দিকেনির্দেশনা যার অনুসন্ধানে আমি লিপ্ত: আমি কে; জীবনের প্রয়োজন কী; বাস্তব কী ও বাস্তবতা কী হবে; আমি কোত্থেকে এসেছি? সব প্রশ্নের সঠিক জবাব এতে লিখা আছে। আমি বুঝতে পারলাম কুরআনের অনুসারীরাই তো সত্যধর্মের অবলম্বনকারী। এটা এমন ধর্ম যা পশ্চিমাদের অনুধাবন থেকে আলাদা। শুধুমাত্র বুড়ো লোকের ধর্ম এটা ছিলো না। পশ্চিমা দেশে ধার্মিকরা হয়ে ওঠে কট্টর।

আমি কট্টর ছিলাম না। প্রথমে আমি বিভ্রান্ত ছিলাম দেহ ও আত্মা নিয়ে। এরপর বুঝলাম দেহ ও আত্মা পৃথক নয়। আরো বুঝলাম ধার্মিক হতে তোমাকে পাহাড়ে আরোহণের প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থেকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা তখন ফিরিশতাদের চেয়েও উপরে আরোহণ করতে পারবো। এ মুহূর্তে আমি যা চাচ্ছিলাম তা ছিলো ইসলামে দীক্ষিত হওয়া।

কুরআন পাঠ করে বুঝতে পারলাম যে, সকল নবী-রাসূল একই বার্তা নিয়েই এসেছিলেন। তাহলে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা আলাদা কেনো? আমি এখন জানি কোন্ কারণে ইয়াহুদিরা জিসাসকে মসীহ হিসেবে মানে নি। তারাই তাঁর কথাগুলোকে পরিবর্তন করেছে। এমনকি খ্রিস্টানরা পর্যন্ত আল্লাহর বাণীকে ভুল বুঝেছে। তারা জিসাসকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে।

সবকিছুর মধ্যে দেখতে পাই স্পষ্টতা। এটাই হচ্ছে আল-কুরআনের সৌন্দর্য। এটা তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করা ও যুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। সূর্য ও চন্দ্রকে উপাস্য না বানাতে বলে- বরং এগুলোর সৃষ্টিকর্তার উপসনা করতে নির্দেশ দেয়। সূর্য, চন্দ্র এবং সৃষ্ট জগৎ নিয়ে চিন্তা-

ভাবনা করতে কুরআন মানুষকে উৎসাহিত করেছে। তুমি কী অনুধাবন করেছো যে, সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে কী পার্থক্য বিদ্যমান? তারা পৃথিবী থেকে ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে অথচ আমাদের চোখে এদের আয়তন প্রায় একই বলে মনে হয়। সময় সময় একটি আরেকটির ওপর দিয়ে চলে যেতেও দেখা যায়।

নভোচারীরা মহাকাশে যেয়ে পৃথিবীর আয়তনকে দেখে বিরাট মহাকাশের তুলনায় খুবই নগণ্য। তারা এসব দৃশ্য দেখে খুব ধার্মিক হয়ে যায়। কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ।

আমি কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকি। এতে নামায, দয়া ও সেবার কথা বলা আছে। আমি তখনও মুসলমান ছিলাম না। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, কুরআনই হচ্ছে আমার সকল প্রশ্নের জবাব। স্বয়ং আল্লাহ আমার নিকট এটি প্রেরণ করেছেন। মাধ্যম বানিয়েছেন জেরুজালেমে ভ্রমণে যাওয়া আমার ভাইকে। আমি ব্যাপারটি গোপন রাখলাম। কিন্তু কুরআন বিভিন্ন স্তর নিয়েও কথা বলেছে। আমি একে অপর একটি স্তরে বুঝতে থাকি- যেখানে কুরআন বলেছে: "যারা বিশ্বাস করে, তারা অবিশ্বাসীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না এবং বিশ্বাসীরা একে অন্যের ভাই।" সুতরাং এখন আমার মন চাইলো আমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

ইসলামগ্রহণ

আমার ভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম জেরুজালেমে বেড়াতে যাবো। সেখানে পৌছুয়ে আল-আকসা মসজিদের ভেতর যেয়ে বসে পড়লাম। এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আমি জবাব দিলাম, একজন মুসলমান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম? জাবাব দিলাম, স্টিভেনস। তিনি অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি নামাযে শরীক হলাম- তবে খুব সফল হলাম না।

আমি ১৯৭৬ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার মালিবু সমুদ্র সৈকতে যাই। সাগরে সাঁতার কাটার সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সামান্যের জন্যে

আমি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ডুবে মারা যাচ্ছিলাম। গভীর পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় সব শক্তি হারাই। এরপর খুব জোরে চিৎকার দিই: “ওহ প্রভু! তুমি যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে আমি আপনার জন্য কাজ করবো।” সঙ্গে সঙ্গে একটি বড়ো ঢেউ এসে আমাকে এক ধাক্কায় সৈকতে নিয়ে যায়। আমি প্রভুর দয়ায় বেঁচে যাই। এ অভিজ্ঞতা আমাকে ইসলামগ্রহণে বিষেশভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যার বর্ণনা নিচে তুলে ধরছি।

জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে লন্ডনে নাফিসা নামক একজন মুসলিমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে বললাম, আমি মুসলমান হবো। তিনি আমাকে বললেন, সেন্ট্রাল লন্ডনের নতুন মসজিদে চলে যান। এটা ছিলো ১৯৭৭ সালের কথা। এর দেড় বছর পূর্বে আমার হাতে কুরআন শরীফ আসে।

আমি জানতাম, নিজের মাঝে সৃষ্ট সকল গৌরবকে বিসর্জন দিতে হবে। শয়নাতের অনুসরণ থেকে বাঁচতে হবে। একটি সত্যের রাস্তায় চলতে হবে। সুতরাং এক শুক্রবারদিন জুমুআর নামায শেষে উপস্থিত হলাম ইমাম সাহেবের সম্মুখে এবং ঘোষণা দিলাম শাহাদাতের। আলহামদুলিল্লাহ! এ দিনটি ছিলো ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল। এর পরের বছর আমি নিজের নাম ইউসুফ ইসলাম বলে ঘোষণা দেই। আমি সর্বদাই ‘ইউসুফ’ [জসেফ] নামটি ভালোবাসতাম। নবী ইউসুফের (আলাইহিসিসালাম) জীবনেতিহাস আমাকে খুব বেশি অনুপ্রাণিত করে। কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন কেচ্ছার মধ্যে ইউসুফ আলাইহিসসালামের কাহিনী হলো সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও অত্যাশ্চর্য।

পথনির্দেশনা দীর্ঘদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলো। যতো বেশিই চেষ্টা করি না কেনো- এটা যেনো অধরা বস্তু ছিলো। এরপর আমাকে কুরআনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হলো। আমি এখন বুঝতে পারলাম, প্রভুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারি, যা থেকে খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। একজন হিন্দু মহিলা আমাকে বললেন, “তুমি হিন্দুদেরকে বুঝতে পারবে না। আমরাও এক প্রভুতে বিশ্বাসী। তবে আমরা প্রতিমা ব্যবহার করি শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবে।” তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাহলো, প্রভু পর্যন্ত পৌঁছুনোর মাধ্যম হচ্ছে তাঁর সঙ্গে (কাল্পনিক

প্রতিমাগুলোকে) শরীক করা। কিন্তু ইসলাম এসব ভ্রান্ত প্রতিবদ্ধকতাসমূহ বিলুপ্ত করেছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে নামায। নামায হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।

সবশেষে, আমি এটা বলতে চাই যে যাকিছু আমি লিখেছি ও করছি তা সবই একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়। আমার ইসলামগ্রহণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে অপর কোনো ব্যক্তি যদি অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহলে এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আমি এটা সবাইকে অবগত করতে চাই যে ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমি কোনো মুসলমানের সংস্পর্শে আসি নি, যার দাওয়াত বা প্রভাবে আমি মুসলমান হয়েছি। আমি বরং কুরআন পাঠ করে বুঝতে পারি যে, কেউই পূর্ণাঙ্গভাবে নিষ্কলুষ নয়। একমাত্র ইসলাম হচ্ছে নিষ্কলুষ। আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করি তাহলে সফল হবো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে পরিচালিত করুন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত জীবনব্যবস্থার ওপর। আমীন।[২২]

[২২] http://tellmeaboutislam.com/cat-stevens.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Cat_Stevens#Religious_conversion

রাডকো

প্রাক্তন খ্রিস্টান-নাস্তিক - চেক রিপাবলিক

নাস্তিক থেকে খ্রিস্টান তারপর মুসলমান

"বন্ধুগণ! আমি এখন এক ব্যক্তির গল্প বলবো যে এক সময় বুক ফুলিয়ে বলতো, আমি কখনও প্রভুতে বিশ্বাস করবো না। তার ধারণা ছিলো, ধর্মে বিশ্বাসীরা হচ্ছে দুর্বল হৃদয়ের মানুষ। নিজেদের অলসতা ও অক্ষমতা লুকানোর জন্য এরা ভান করে মাত্র। মোটকথা, সে ছিলো এক কট্টর নাস্তিক। তবে সৌভাগ্যবশত, তার এক বন্ধু ছিলো যে গডে বিশ্বাস করতো।

বন্ধুটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে ধর্ম নিয়ে কোনো আলাপ করতো না। এ ব্যাপারে উভয়ে একমত হয়েছিল। কিন্তু কট্টর এ নাস্তিক একদা এক ভুল করে বসলো। তার বন্ধু কথায় কথায় তাকে চার্চে যেতে দাওয়াত করে, আর সে তা গ্রহণ করে নেয়!

চার্চে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে বসলো। উপস্থিত নারী-পুরুষ উচ্চস্বরে প্রার্থনা শুরু করলো। পাদ্রী বয়ান করলেন। একত্রে সবাই সুর করে তিন প্রভুর গুণগান গেয়ে সমগ্র চার্চ হলটি মুখরিত করে তুললো। প্রথমে নাস্তিকের মনে বিরক্তির অনুভূতি জাগ্রত হলেও পনোরো মিনিট স্থায়ী সুরের লহরী তাকে উত্তেজিত করে তুললো। এক সময় চোখ থেকে বেরিয়ে আসলো অশ্রুজল। সে অনুভব করলো এক অদ্ভুত আনন্দ ও অনুরাগ অন্তরের মধ্যে। সার্ভিস শেষে উভয় বন্ধু বের হয়ে আসলো চার্চ থেকে।

কেউ কথা বলছিলো না। একে অন্য থেকে আলাদা হওয়ার সময় নাস্তিক বললো, বন্ধু! আমি আরেকদিন চার্চে যেতে চাই। সত্যিই তারা পরের দিনই আবার চার্চে গেলো।

প্রিয়া পাঠক! আপনি হয়তো ইতোমধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়ছেন, যে নাস্তিকের কথা বলছি সে আসলে কে? হ্যাঁ, এ নাস্তিক ব্যক্তিটি হচ্ছি আমি নিজেই। ঐ সময় নাস্তিক ছিলাম কিন্তু এখন নই- আলহামদুলিল্লাহ! এখন

আমি মুসলমান। ঐ সময় আমি ধর্মবিশ্বাসী মানুষের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পোষণ করতাম না। উক্ত যে চার্চের প্রার্থনায় আমি গিয়েছিলাম তা ছিলো ১৯৮৯ সালের কথা। এসময়ই আমার আস্তিক হওয়ার ভ্রমণের শুরু। প্রথমে খ্রিস্টান হওয়া ও শেষে সত্যধর্মে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয়। আমি এখন নাস্তিক থেকে আস্তিক হওয়ার পুরো কেচ্ছা আপনাদেরে বলে দেবো। কী চিত্তাকর্ষক সে ভ্রমণটি!

আমার জন্ম হয় একটি নাস্তিক পরিবারে। তবে জন্মের পর শুধু আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে আমাকে ব্যাপটাইজ[২৩] করা হয়েছিলো। এরপর আর কোনোদিন ধর্ম সম্পর্কে কিছুই পড়িনি ও জানি নি। হাই স্কুলে পড়ালেখার সময় কমিউনিস্ট পার্টির একজন জেনারেল এসে আমাদেরে বলেছিলেন, প্রভু বলতে কেউ নেই। তার প্রতিটি কথা আমি গলদ্দকরণ করি। যদিও আমার ক্ষেত্রে এসব ব্যাপার বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। যাকিছুই তিনি বলেছিলেন নাস্তিক্যবাদের পক্ষে সবই আমি আগে থেকেই বিশ্বাস করতাম। তবে আমি লক্ষ্য করি, ঈমানদারদের প্রতি তার ঔদ্ধত্যতা, অবজ্ঞা ও ঘৃণা ছিলো অত্যন্ত প্রবল- যা আমার মাঝেও বিরাজ করতো। তবে এসব ব্যাপার ছিলো দীর্ঘ ১৬ বছর পূর্বের। এখন আমাকে ওসব অজ্ঞতার দিনগুলোর মাশুল দিতে হবে।

আমি এখন চাচ্ছিলাম, খুব ভালো একজন খ্রিস্টানে পরিণত হবো। আল্লাহ সাক্ষী, আমি খুব চেষ্টা করেছি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টবাদের ওপর আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। বাইবেলের অসংখ্য স্ববিরোধীতা আমার কাছে উন্মুক্ত হলো। এর একটি ছিলো জিসাসের ডিভিনিটি (প্রভু হওয়া)। অরপ আরেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো এই: খ্রিস্টবাদের মৌলিক একটি বিশ্বাস হচ্ছে 'অরিজিন্যাল পাপ ও এর উত্তরাধিকার'। এ দুটো বিষয় কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। যাজক-পাদ্রীরা এ দুটো ব্যাপারে আমাকে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। ক্রমে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তারা বলে, এসব ব্যাপার হচ্ছে খ্রিস্টান বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তোমাকে এগুলো

---

২৩ খ্রিস্টবাদে প্রবেশের একটি অনুষ্ঠান যেখানে নবজাতক শিশুর দেহে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দেন কিংবা এর দ্বারা গোসল করান একজন ধর্মযাজক।

বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে হবে। আর এগুলো না মানলে তুমি খ্রিস্টান হতে পারবে না। এসব প্রশ্ন করলে তুমি প্রভু থেকে দূরে সরে পড়বে।

কীভাবে ইসলামের দিকে পাড়ি জমিয়ে মুসলমান হলাম

খ্রিস্টবাদের দিকে পাড়ি জমানো ছিলো সহজ- কিন্তু এর ঈমান-আক্বীদাকে গ্রহণ করা ছিলো কঠিন ও অযৌক্তিক। অপরদিকে ইসলামের দিকে পাড়ি জমানো ছিলো খুব কঠিন- কিন্তু এর ঈমান-আক্বীদাকে গ্রহণ করা ছিলো সহজ ও যৌক্তিক।

আপনি হয়তো ভাববেন, খ্রিস্টবাদ কর্তৃক হতাশ হওয়ার পর আমি সহজেই ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছি। তা কিন্তু নয়। এর কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব সীমিত ছিলো। যেমন, মুসলমানরা গডকে আল্লাহ বলে, বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন পাঠ করে এবং তারা উপাসনা করে এক ব্যক্তিকে যার নাম ছিলো মুহাম্মদ! আমি এটুকু জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রস্তুত ছিলাম না।

সুতরাং চার্চ কমিউনিটি থেকে নিজেকে আলাদা করে 'একক খ্রিস্টান' হিসেবে কালক্ষেপণ করছিলাম। যদিও কমিউনিটিকে বিসর্জন করি, কিন্তু খ্রিস্টবাদ থেকে গডকে জেনে তাঁকে অন্তর থেকে বিসর্জন দিতে পারি নি। হৃদয়ের গভীরে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। আমি ভাবতাম, অন্তত গড আমার পক্ষে আছেন।

পরবর্তীতে আমি কিন্তু নিজেকে একের পর আরেক বোকামীর মধ্যে ফেলে দিই। অভ্যস্ত হয়ে পড়ি ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে। আমি বুঝতে পারি নি, এরূপ জীবন-যাপনের রাস্তার শেষ হচ্ছে নরক। এক বন্ধু বলেছিলো, পায়ের নিচে মাটি আছে বুঝতে হলে সর্বনিম্নে অবরোহণ করতে হয়। এ জিনিসটিই আমার ক্ষেত্রে ঘটে। আমি সত্যিই গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যাই। আমি ভাবতে পারছি, শয়তান কীভাবে হাত প্রসারিত করে বসেছিলো আমাকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিসর্জন করেন নি। তিনি আমাকে পুনরায় সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন।

জুলাই ২০০১ সাল। ইরাক থেকে আগত এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তার নাম ইব্রাহিম। খুব দ্রুত উভয়ে আলাপচারিতায় অভ্যস্ত হলাম। তিনি বললেন, আমি মুসলমান। আমি বললাম, আমি একজন খ্রিস্টান। খ্রিস্টান হওয়াটা আমার জন্য খুব প্রযোজ্য নয় ভাবলাম। কিন্তু তা ছিলো না মোটেই। আমি মুসলমান হতে চাই নি- তিনিও আমাকে মুসলিম বানাতে আগ্রহী নন।

মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দল ভাবতাম। এরপরও ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানার আগ্রহ জন্মে আমার মাঝে। আমি ভাবলাম, আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি উপস্থিত, যিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সক্ষম। সুতরাং এ সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার। আমি সাহস করে তাকে আবদার জানালাম, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে আরো বলুন। আমি জানতে চাই। বাস্তবে ইসলামের প্রতি আগ্রহের শুরু এখানেই। কিছুদিন পর ইব্রাহিম চলে গেলেন। তবে আমার অন্তরে তখন ইসলামের বীজ বপন হয়ে গিয়েছিলো।

এক পুরাতন চেক (চেক রিপাবলিকের বাসিন্দা) মুসলিম ছিলেন। তার নাম ছিলো মুহাম্মদ আলী সিলহাভী। আমি তার সম্পর্কে কিছু লেখা পাঠ করে একখানা চিঠি লিখি তার নিকট। কিছুদিন পর চিঠির জবাব পাই। চিঠির সাথে পাঠিয়ে দিলেন কিছু বইপত্র ও লিফলেট। তিনি লিখেছেন, প্রাগে স্থাপিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আমার ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে। তিনি তাদেরকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কুআনের অনুবাদ আমার নিকট পাঠিয়ে দিতে। সুতরাং এভাবেই শুরু হলো ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে পথচলা। আমি অচিরেই বুঝতে সক্ষম হলাম যে, ইসলাম কোনো যুদ্ধবাজ ধর্ম নয়। বাস্তবে এটা ছিলো একটি উত্তম শান্তির ধর্ম। আমার প্রশ্নগুলোর জবাব বেরিয়ে আসছিলো।

বেশ কিছু ঝামেলা হেতু দীর্ঘ তিন বছর পার হলো। এরপর আমি মুহাম্মদ আলী সিলহাভীর সাথে সাক্ষাতে যাই। তিনি খুব ধৈর্যসহ আমাকে বিভিন্ন ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিলেন। অবশেষে পরামর্শ দিলেন, তুমি বিনো (চেক রিপাবলিকের একশি শহর) মসজিদে চলে যাও।

বিনো মসজিদে প্রবেশ করলাম ভয়-ভীতিসহ। ভাবলাম, আমাকে একজন অপরিচিত অবিশ্বাসী হিসেবে সবাই দেখবে। কী ভুল ছিলো আমার

অন্তরের ভাবনা! সবাই যেনো দীর্ঘদিন পর কোনো আপনজনের সন্ধান পেয়েছে! খুব উষ্ণ হৃদয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন।

এবার ইসলামের সবকিছু জানতে আমি আগ্রহশীল হলাম। বুঝতে সক্ষম হলাম কী অপূর্ব যৌক্তিক ও সহজ-সরল ছিলো ইসলাম ধর্ম। ধীরে ধীরে শিখে নিলাম কীভাবে নামায পড়তে হয়। এখন তো আমি আরবি ভাষায় নামায আদায় করতে পারি।

আমি খারাপ একটি অভ্যাসকে ছেড়ে দিলাম। কারণ এটা ছিলো ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ অভ্যেসটির নাম জুয়া। আমি জুয়া খেলায় খুব পটু ও দক্ষ ছিলাম। এটা ছেড়ে দেওয়া ছিলো একটি সংগ্রাম-তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমি তখনও মুসলমান হই নি। তবে মুসলমান হিসেবে বাকী জীবন কাটাতে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমার মনে কোনো সন্দেহ থাকে নি-এটাই ছিলো সত্য ধর্ম। যদিও ২০০৩ থেকে ২০০৪ এই এক বছরব্যাপী আমি নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রস্তুতি নিই। অবশেষে আমার সিদ্ধান্ত পাকাপুক্ত হলো। মসজিদে যেয়ে শাহাতাদের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করি: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নব্বুই দশকের সেই নাস্তিক যুবক আজ মুসলমান আস্তিকে পরিণত হলো। আলহামদুলিল্লাহ!

অবশেষে আমি নিজেকে মুক্ত অনুভব করছি। আমি মুসলমান। খুব আনন্দিত। ব্যক্তিগতভাবে এখনও একশ পার্সেন্ট উত্তম পুরুষে রূপান্তর হতে পারি নি বটে। তবে চেষ্টা চলছে। আমি আবারো অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিচ্ছি: আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই, এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হচ্ছেন আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল।[২৪]

[২৪] https://www.islamreligion.com/articles/473/radko-ex-atheist-czech-part-2/

মাইকেল ডেভিড শাপিরো
প্রাক্তন ইয়াহুদি - রাশিয়া

রুশ ইয়াহুদি থেকে মুসলমান

বিভিন্ন ধর্মের ওপর অনুসন্ধান শেষে মাইকেল শাপিরো ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন ও নিশ্চিত হন- এটাই মহাসত্যের ধর্ম। সুন্দর সাবলীল ভাষায় সত্যের দিকে তার ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন। আমরা তাহলে তার নিজের ভাষায়ই এ অপূর্ব কাহিনীটি শুনে নিই।

মৌলিকভাবে আমি একজন রুশ ইয়াহুদি। আমার অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণের শুরু যখন আমার বয়স মাত্র ১৯ বছর। আমি সবেমাত্র 'সাইন্টোলজি' নামক এক অদ্ভুত জালে আটকা পড়া থেকে মুক্ত হয়েছি (হ্যাঁ, ওরা আমার ব্রেনওয়াশ করেছিলো বটে!)।

গডে বিশ্বাস আমার নিকট তখনও অনিশ্চিত ছিলো। আমি জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলাম একজন পপ তারকা হবো। তখন আমি বাস করতাম আমার প্যাসাডিনা এ্যাপার্টমেন্টে। কাজ করতাম একজন অফিস সেক্রেটারী হিসেবে। বেশ মজার না! হ্যাঁ- আমি জানি।

এক রাতের ঘটনা। আমি রান্নাঘরের দিকে হেঁটে এগুচ্ছি। সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখলাম এক তমসাচ্ছন্ন লোক! আমার মনে পড়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: "এ ভডকাটুকু (মদ) কী আজ রাতে ফ্রিজে রেখে দিতে পারবো?" লোকটি আমার হাতে ধরে করমর্দন করলো। এরপর ঘুমিয়ে পড়ি। এটা স্বপ্ন না বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিলো জানি না- তবে এদিন থেকে আমার জীবনে সূচনা হলো আকস্মিক এক পরিবর্তন ...

এরপর সত্যিই এক শ্যামলা মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনিই ছিলেন আমার জীবনে প্রথম মুসলিম যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি আলাপ শুরু করি এ ব্যক্তির সাথে তার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। আমি এসব কী শুনছিলাম

যে, দৈনিক ৫ বার নামায পড়তে হয়? এরপর জিহাদ? মুহাম্মদ (সা.) নামক ব্যক্তি কে ছিলেন?

ওয়েড নামক আমার এক খ্রিস্টান রুমমেট ছিলো। সে-ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো ধর্ম নিয়ে আলোচনায়। সবে মিলে এখন আমরা তিনজন তিন ধর্মের একত্রিত হলাম: ইয়াহুদি (আমি), খ্রিস্টান (ওয়েড) এবং মুসলিম (শ্যামল ফেলো)। আমাদের ডায়লোগ থেকে বেরিয়ে আসলো এ তিন ধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য ও অনেক সামঞ্জস্য আছে।

ক্রমে আমার আগ্রহ নারী, ড্রাগ ও পার্টি থেকে পরিবর্তিত হলো সত্যের সন্ধানে। এক অনুসন্ধান যা পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ না করা পর্যন্ত কোনো উপায় ছিলো না। এটা ছিলো গডের অনুসন্ধান। তাঁকে কীভাবে অনুসরণ করবো- সে সন্ধান।

সত্যের সন্ধানের শুরুতেই আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "ওকে। খুব সহজভাবেই শুরু করা যাক। গড ক'জন আছেন বলে আমি মনে করি?" আমি দেখলাম, এর জবাব 'একজন' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ আমি জানতাম, ভাগ-হওয়া গড একজন গড হওয়া থেকে দুর্বল হতে বাধ্য। কারণ এক গড যদি অপর গডের সঙ্গে একমত হতে ব্যর্থ হন- তাহলে উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে তর্কবিতর্ক ও রাগ-গোস্বা! সুতরাং গড একজন হতে হবে- এটাই আমার সিদ্ধান্ত।

গডের অস্তিত্ব থাকার ব্যাপারে যখন আমার মন উন্মুক্ত হলো তখন আমি শুরু করলাম 'নাস্তিক' ও 'আস্তিক' উভয় দলের বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা। শেষোক্ত দলের দিকে আমাকে যে জিনিষটি আকর্ষিত করে, তাছিলো এই প্রবাদ বাক্যটি: "প্রত্যেক ডিজাইনের আছেন একজন ডিজাইনার।" এটা মনে রেখে আমি জাগ্রত হলাম নিশ্চিতভাবে: একজন গড আছেন। আমি জানতাম না এ সিদ্ধান্তে কেনো পৌঁছুলাম- তবে আমি অনুভব করলাম এটি সত্যি।

এ নতুনপ্রাপ্ত চেতনার সঙ্গে আরো একটি দায়িত্ব-অনুভুতি জেগে ওঠলো আমার মাঝে: সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা তো মেনে চলতে হবে। সুতরাং, আমার

পরতর্বী অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হয়ে ওঠলো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস।

এবার নিজেকে প্রশ্ন করলাম: "কোথা থেকে শুরু করবো?" শত শত ধর্ম আছে। এদের মধ্যে গোটা কটিকে অনুসন্ধানের আওয়াভুক্ত করতে হবে। কীভাবে তা করবো? ভাবলাম, 'ওগুলো খুঁজে দেখো যার বিশ্বাসের মূলে আছে একত্ববাদ।' এটাতো সঠিক। আমি তো ইতোমধ্যে নির্ধারণ করেছি: গড মাত্র একজন হতে পারেন। আমি তো এক প্রভুতে বিশ্বাসী।

তাহলে ওকে। এখন আমি বৌদ্ধবাদ ও হিন্দুবাদকে বাদ দিতে পারি। উভয় বিশ্বাসের মূলে আছে বহুত্ববাদ। প্রধান তিনটি ধর্ম সম্পর্কে আমি জানি যারা নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে: ইয়াহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ ও ইসলাম। ভালো কথা, নিজেই যখন একজন ইয়াহুদি- তাহলে এটি নিয়েই শুরু করা যেতে পারে: এক প্রভু, বেশ ক'জন নবী, ১০ কমান্ডমেন্টস, তাওরাত, ইয়াহুদি সৌল (আত্মা) ... আহ, কী? 'ইয়াহুদি সৌল?'

গবেষণাকালে এই ধারণাটি আমার দৃষ্টি আকষর্ণ করে। কাহিনীটা এই: "যদি কেউ ইয়াহুদি পরিবারে জন্ম নেয়, তাহলে তার সৌল (আত্মা) হচ্ছে ইয়াহুদি। তাকে অবশ্যই ইয়াহুদিবাদের অনুসারী হতেই হবে।" এক সেকেন্ড! এটা তো বৈষম্য! নয় কি? এটা সর্বজনিন নয়।

গডই তো ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক ইত্যাদি সব আত্মা সৃষ্টি করেন। আমি মনে করতাম, সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট। সুতরাং, কেউ যদি কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাসী পরিবারে জন্ম নেয়- তাহলে গডের ওর্ডার হচ্ছে, তাকে এ ধর্মেরই অনুসরণ করতে হবে ... এমনকি ঐ ব্যক্তি যদি আবিষ্কার করে নেয় এ ধর্ম মিথ্যা! হুঁ ... আমি এ ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

অপর এক বিষয় সত্যিই আমাকে সমস্যায় ফেলে দেয়: ইয়াহুদিবাদে নরকের শাস্তি থাকার কোনো বিশেষ ধারণা নেই। তাহলে ভালো হওয়ার প্রয়োজন কী? সর্বদা পাপে লিপ্ত থাকলে অসুবিধা কিসের? আমি যদি কঠোর শাস্তির ভয় না রাখি তাহলে কোন্ কারণে আমাকে নীতিবান হতে হবে?

আগে বেড়ে আমি আবিষ্কার করলাম খ্রিস্টবাদ। ঠিক আছে: এক গড, এক পিতা, এক পুত্র ও এক হলি গোস্ট (পবিত্র আত্মা)। আবার বলি, এক গড, এক পিতা, এক পুত্র ও এক হলি গোস্ট। এসব মিলে কীভাবে ১ গড হয়? ১ + ১ + ১ = ৩। ঠিক নয় কি?

ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা, সমীকরণের পর সমীকরণ, তুলনার পর তুলনা, সাদৃশ্যের পর সাদৃশ্য- আমি এ (ত্রিত্ববাদের) ধারণাটি কখনও বুঝতে পারি নি। ওকে, আসুন- আরো কিছু অনুসন্ধান করা যাক।

পরের বড়ো আক্বীদা হচ্ছে: জিসাস আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এ কাজটি এজন্য করেছেন যে, আমরা সবাই ‘আদি পাপে’ কলুষিত। সুতরাং, জিসাস ক্রাইস্ট, বা ‘গডের পুত্রকে’ হত্যা করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায় সবাইকে নরকের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে এবং ‘আদম’ কর্তৃক ‘চাপিয়ে দেওয়া’ পাপ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে সবাইকে নিষ্পাপ হতে।

ঠিক আছে, আপনি তাহলে বলছেন: আমরা সবাই জন্মগতভাবে পাপী? অথচ পাপ হচ্ছে অন্যায় কিছু করা- তাই না? তাহলে আপনি আমাকে বলছেন, এক বছরের একটি শিশু পাপী, সে কিছু পাপকার্য করেছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! এক ব্যক্তির আমলের কারণে সমগ্র মানবজাতিকে শাস্তি ভোগ করতে হবে? এ কেচ্ছার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার কী আছে? একজন পথভ্রষ্ট হলে সমগ্র দলকে শাস্তি দাও? গড কোন্ কারণে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ আইন তৈরি করবেন? সরি, আমার যুক্তির সঙ্গে এটি কখনও সমর্থনযোগ্য হবে না।

ঠিক আছে, জিসাস মরেছেন এজন্য যে তিনি ‘মানবজাতিকে ভালোবাসেন’। এক মিনিট, বাইবেলে লিখা আছে, জিসাস বলেন: “পিতা! আপনি কেনো আমাকে পরিত্যাগ করলেন?” সুতরাং, বাহ্যতঃ জিসাস বুঝতে পারেন নি কোন্ কারণে তাঁকে নিশৃংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিলো। কিন্তু তোমারা বললে, “তিনি মানবজাতিকে ভালোবাসেন এজন্য স্বেচ্ছায় নিজেকে কুরবানী করেছেন।” যাক, আমি এরূপ কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, পরের ধর্মবিশ্বাস কোনটি?

ইসলাম। 'ইসলাম' অর্থ আত্মসমর্পণ। এর মূল আক্বীদাগুলো হচ্ছে এই: গড একজন, গডকে দৈনিক ৫ বার উপসানা করতে হবে, ধনীরা ২.৫% বাৎসরিক জাকাত দিতে হবে গরীবদেরকে, রামাদ্বান মাসে উপবাস করা (আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ... এবং আরো কিছু কারণে) এবং মক্কা শহরে যেয়ে হজ্জ পালন করা যদি তোমার সামর্থ থাকে। ওকে, এ পর্যন্ত অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কিছুই কঠিন নয়।

এখানে আমার যুক্তির সঙ্গে কোনো সংঘাত নেই। কুরআন হচ্ছে একটি কিতাব যাতে আছে আকর্ষণীয় অনেক 'মিরাকল' (মু'জিযা) এবং চিরন্তন জ্ঞান-প্রজ্ঞা। এতে আছে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য যা আবিষ্কৃত হয়েছে আধুনিক যুগে। অথচ কুরআন এসেছে চৌদ্দ শত বছরেরও বেশি পূর্বে।

ওকে। আমার প্রাথমিক পূর্বাপেক্ষিত ধর্মীয় মাপকাঠিতে ইসলাম উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে আমি চাচ্ছিলাম, এ সম্পর্কে আরো গভীর কিছু প্রশ্ন করতে। এটা কী সর্বজনিন একটি ধর্ম? হ্যাঁ, অবশ্যই। যে কেউ ইচ্ছে, অতি সহজে এর মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে-বুঝতে সক্ষম। কোনো 'সমীকরণের পর সমীকরণ' কিংবা 'তুলনার পর তুলনার' প্রয়োজন নেই। এটা কী বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল? হ্যাঁ, কুরআনে শত শত ভার্স (আয়াত) পাওয়া যায়, যেগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

গবেষণাকালে অসংখ্য যৌক্তিক তথ্য পাঠ করেছি। একটি মাত্র শব্দ আমার দৃষ্টি সর্বাধিক বেশি আকর্ষণ করেছে- "ইসলাম"। এ ধর্মের নামকরণ। আমি লক্ষ্য করলাম স্বয়ং কুরআনে এ নামটি একাধিকবার লিখিত আছে।

তবে, পূর্বে গবেষণাকৃত উভয় ধর্মের নাম আমি একবারও দেখতে পাই নি তাদের ধর্মগ্রন্থে। ওল্ড টেস্টাম্যান্টে দেখি নি 'ইয়াহুদিবাদ' কিংবা নতুন টেস্ট্যামেন্টে দেখি নি 'খ্রিস্টবাদ'। এটা ছিলো বিরাট! কেনো আমি ঐ দুটি গ্রন্থে ধর্মের নামগুলো খুঁজে পেলাম না? বাস্তবে এ গ্রন্থদ্বয়ে ধর্মের কেনো নাম ছিলো না। চিন্তা করলাম ... Judaism শব্দটি ভেঙ্গে "Juda+ism" (ইয়াহুদিবাদ) এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়। অনুরূপ Christianity শব্দটি ভেঙ্গে "Christ+ianity" এ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। সুতরাং শব্দের

প্রথমাংশ Juda কে? তিনি ছিলেন হিবরু জনগোষ্ঠির নেতা যখন আল্লাহ তা'আলা মানবতার প্রতি তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন। সুতরাং এ ধর্মের নামকরণ হয়েছে 'একব্যক্তির নামানুসারে'। ওকে, এবার দেখা যাক Christ কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি প্রভুর বার্তাকে ইয়াহুদিদের নিকট পৌঁছুয়ে দেন। সুতরাং এ ধর্মটিরও নামকরণ 'একব্যক্তির নামানুসারে' হয়েছে।

সুতরাং, আমরা এটা নিশিচতভাবে প্রমাণ করলাম যে, উভয় ধর্মের নামকরণ হয়েছে প্রবর্তকদের নামানুসারে। এরপর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ism' ও 'ianity'। তবে, এ দুটো ধর্মের মূল গ্রন্থে নামগুলো না থাকায় আমি অবাক হয়েছি। এটা তো বেশ অদ্ভুত ব্যাপার!

আমি ঘরে ঘরে যেয়ে কিছু বিক্রি করবো। দরোজায় দাঁড়িয়ে কী বললো, আপনি কি ..... এটি কিনবেন? এর যৌক্তিক পাল্টা প্রশ্ন কী হবে না, "এটা ..... কী?" যে পণ্যের নাম নেই- তা বিক্রি করে পয়সা কামানো যাবে কী করে?

নামকরণ হচ্ছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর পরিচিতির জন্য মৌলিক একটি বিষয়। ধর্ম যদি পালনের জন্য হয়ে থাকে, এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এটি প্রচার করা জরুরি মনে করা হয়, তাহলে এটার একটি নাম থাকা কী গুরুত্বপূর্ণ নয়?

আরোও ভাবার বিষয়, স্বয়ং মহান গড কী তাঁর মনোনিত ধর্মের নাম ব্যক্ত করবেন না- তাঁরই নাজিলকৃত গ্রন্থে? হ্যাঁ, এটাই আমার পয়েন্ট। খ্রিস্টানিটি ও জুদাইজম পবিত্র গ্রন্থদ্বয়ে লিখিত হয় নি। মানুষ এসব নামকরণ করেছে। আল্লাহ সমগ্র মানবতার জন্য একটি ধর্ম অবতরণ করবেন আর তার নামকরণ করা থেকে নিবর থাকবেন- এ ধারণাটি বিশ্বাস করা আমার নিকট কখনও সম্ভব হবে না।

এখানে এসে, পবিত্র, যৌক্তিক ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে খ্রিন্টানিটি (খ্রিস্টবাদ) ও জুদাইজম (ইয়াহুদিবাদ) তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অন্ততঃ আমি অধমের নিকট এটি উন্মোচন হয়েছে স্বতঃসিদ্ধভাবে।

ইসলাম হচ্ছে “একমাত্র” ধর্ম যার নাম তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। এটাই তো আমার জন্য বিরাট ব্যাপার।

এ মুহূর্তে এসে আমি অনুধাবন করলাম- ইসলামই হবে আমার ধর্ম। ইসলামকেই আমি অনুসরণ করবো। এরপর আমি শাহাদাতের বাণী পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাই। আমি সত্যকে পেয়েছি। আমি অন্ধকার থেকে বেরিয়েছি। আমি এসে গেছি নূরের মাঝে …।[২৫]

[২৫] https://www.islamreligion.com/articles/1427/michael-david-shapiro-ex-jew-russia/

ডন্যাল্ড ডব্লিউ ফ্লাড

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

কীভাবে লাস-ভেগাসের বাসিন্দা জুয়ার রুলেট গবেষণা করে মুসলমান হলেন- আমরা তার নিজের কথায় শুনবো।

আমি একসময় ভাবতাম, আমার বেড়েওঠা একটি উত্তম জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। কারণ মাসনিক ও শারীরিকভাবে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। একজন সচরাসর আমেরিকান যুবক হিসেবে আমার জীবন-স্টাইল ছিলো অনেকটা ফূর্তি-আমোদপ্রিয়: ভালোবাসতাম সঙ্গীত, উৎসবমূখর পারিপার্শ্বিকতা, নারী, ক্রীড়া, ভ্রমণ, নৃতাত্ত্বিক খাবর ও বিদেশি ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি। তবে, আমি একটি পর্যায়ে এসে অনুভব করলাম, ‘আধ্যাত্মিকভাবে’ হয়ে গেছি নিঃস্ব। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, ‘এখন কী হবে? জীবনে এসব ছাড়াও আরো অনেককিছু নিশ্চয়ই আছে’। এই আত্মচেতনা হেতু বিভিন্ন ব্যাপারে অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা পাই।

এক প্রিয় বন্ধুর পরামর্শে চলে যাই তিন-মাস দীর্ঘ একটি ভ্রমণে। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও কানাডায় এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন ও চিন্তা-গবেষণা করা। জীবনের উদ্দেশ্য কী তা আবিষ্কার করা। স্বভাবের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করার পর এ সিন্ধানে পৌঁছুলাম যে, এ মহাবিশ্ব এমনিতেই হতে পারে না- একজন সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় আছেন। সুতরাং, এ ভ্রমণটি আমার প্রভু-বিশ্বাসী চেতনাকে আরো শক্ত করে দিলো।

বাড়িতে ফিরে পুনরায় শহুরে ব্যস্ত জীবন আমাকে অশান্ত করে তুললো। কিছুটা পরিত্রাণ পেতে ধ্যানকে [মেডিটেশন] বেছে নিলাম। ধ্যানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি লাভ করি। কিন্তু এ অনুভূতি ছিলো ক্ষণস্থায়ী- যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেছি মেডিটেশন থেকে তখনই সেই অনুভূতিও বিদায় হয়েছে। মনের প্রশান্তিকে সাথে নিয়ে চলতে পারি নি। এছাড়া সব সময় মেডিটেশনে লেগে থাকাও কঠিন ছিলো। ফলে এর প্রতি আকর্ষণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

শীঘ্রই আমি ভাবলাম, সত্য হয়তো আত্ম-উন্নয়নের মধ্যে নিহিত। সুতরাং আমি হয়ে ওঠলাম প্রণোদনা দানকারী একজন ক্ষুধার্ত পাঠক। অংশগ্রহণ করতে থাকি এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে। এছাড়া টিভি বিজ্ঞাপনে প্রচারিত ইউনাইটেড স্টেট আর্মির স্লোগান “হও, যা তুমি হতে সক্ষম (Be all you can be)’ এর অনুপ্রেরণা মুতাবিক জীবন-যাপনে অগ্রসর হলাম। এসময় আমি অগ্নি-কদম (fire-walking), আকাশ-ডুব (skydiving) এবং মার্শাল আর্ট ইত্যাদি সাহসী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হই। অধ্যয়ন ও চ্যালেঞ্জিং ক্রিয়া-কলাপ থেকে আত্ম-বিশ্বাস বাড়লেও আমি কিন্তু সত্যোপলব্ধি থেকে অনেক দূরে ছিলাম।

এরপর আমি বিভিন্ন দর্শনের ওপর গ্রন্থাদি পাঠ করতে থাকি। এতে ছিলো অনেক আকর্ষণীয় ধারণা ও রীতিনীতি। কিন্তু আমি কোনো একটি দর্শন খুঁজে পাই নি যার ওপর পূর্ণাঙ্গ ভসরা ও বিশ্বাস রাখতে পারি। এরপরও, সবগুলোর সমন্বিত একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ থিওরি আবিষ্কারের চেষ্টা করি। এটা হয়ে ওঠলো এক ধরনের ‘ছেড়াভাঙ্গা ধর্মবিশ্বাস’, যার মূলে ছিলো ভালো ন্যায়নীতিসম্পন্ন আচরণ। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, ভালো নৈতিকতা ভালো ছিলো, কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিলো না ‘জীবনের উদ্দেশ্যের রহস্য’ কী, তা উন্মোচন করতে। সেটা ছিলো জীবনকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মধ্যে নিহিত।

এর কিছুদিন পর একটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশে কাজে যোগ দিই। এসময় আমার হাতে বেশ অবসর সময় ছিলো। আমি এ সময়টুকু অধ্যয়ন ও জীবন নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় কাটিয়েছি। সত্যের সন্ধানে জড়িত থাকাকালে আমি একটি গ্রন্থের সন্ধান পেলাম যাতে বর্ণিত হয়েছে প্রভুর নিকট একান্ত অনুশোচনার প্রয়োজনীয়তা। আমি এ কাজটিতে অগ্রসর হলাম এবং অনুভব করলাম মানুষের প্রতি অবিচারের কারণে সত্যিকার অনুতাপ। এটি এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে।

এর ক’দিন পর মুসলিম কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলাপ হলো। আমি তাদের বললাম, আমেরিকায় থাকতে অনেক বেশি স্বাধীন ছিলাম। এখানে তেমনটি অনুভব করছি না। একজন বললো, “ভলো কথা, এটি নির্ভর করছে

'স্বাধীনতা' বলতে আপনি কী বুঝাচ্ছেন। আপনার দেশে সন্তানদেরে নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা বাড়িতে যতোই দেওয়া হোক না কেনো, বাইরে গেলেই তারা একটি সমাজের সম্মুখীন হয় যা ছিলো ঐ নীতি-নৈতিকতা বিরুদ্ধ। অপরদিকে মুসলিম দেশে, নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা বাড়িতে সন্তানদেরে যেটি দেওয়া হয় সাধারণত বাইরে গেলেও তারা তা দেখতে পায়। তাহলে বলুন, বাস্তবে কে সঠিকভাবে স্বাধীন?" তার এ যুক্তিতর্ক থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, ইসলামী দিকনির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মনুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ রাখার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়- তা মোটেই মানবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে ছিলো না- বরং এর দ্বারা মানবিক স্বাধীনতাকে সংজ্ঞাকরণ ও মর্যাদাশীল করা হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু জানার সুযোগ এলো আমি যখন একদল মুসলিমের সঙ্গে এক সাথে খাবর খেতে যাই। এক পর্যায়ে আমি বললাম, মধ্যপ্রাচ্যে আসার আগে আমি আমেরিকার লাস-ভেগাস শহরে বাস করেছি। আমেরিকা থেকে আগত একজন মসুলিম বললেন, "একজন ভালো মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করাকে নিশ্চিতকরণ আপনার জন্য একান্ত জরুরি।" আমি সাথে সাথে তাকে অনুরোধ জানালাম, আরো কিছু বুঝিয়ে বলুন। তিনি বললেন, "আপনি যদি একজন অ-মুসলিম হিসেবে মারা যান তাহলে এটা হবে রুলেট (জুয়া খেলার টেবিলে) খেলার মতো। যেখানে আপনি আপনার সকল চিপ (সমস্ত জীবন এবং যে ধর্মে বিশ্বাসী তার আমল) একটি মাত্র সংখ্যায় রেখে দিলেন এ আশায় যে, হয়তো প্রভুর দয়ায় আপনি বিচরাদিবসে রক্ষা পেয়ে স্বর্গে চলে যাবেন। অপরদিকে, আপনি যদি একজন ভালো মসুলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে এটা হবে আপনার সকল চিপ রুলেট টেবিলের সর্বত্র যেনো ছড়িয়ে দিলেন। এতে প্রতিটি সংখ্যাই নির্ধারিত হবে। ফলে, কোন্ সংখ্যার ওপর বলটি পড়ে তাতে কিছু আসে যায় না- আপনি নিরাপদ। অন্য কথায়, ভালো মুসলিম হিসেবে জীবন কাটিয়ে মারা গেলে একটি নিশ্চয়তা নিয়ে গেলেন যে. আপনাকে নরকে যেতে হবে না। একই সময়, এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ যার বিনিময় হবে স্বর্গ।" লাস-ভেগাস শহরের একজন অতীত-বসবাসকারী হিসেবে আমি এই মর্মভেদী উপমাকে রুলেট খেলার সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত করতে পারি।

এ পর্যায়ে এসে আমি নিশ্চিত হলাম যে, যে সত্যকে আমি অনুসন্ধান করছি, তা লাভ করার পথ হচ্ছে ওসব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হওয়া, যেগুলো গড তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অবতরণ করেছেন। সুতরাং, খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের মাধ্যমে আমার অনুসন্ধান আরো জোরদার হলো।

যদিও আমি একজন খ্রিস্টান হিসেবে বড়ো হয়েছি, আমি কিন্তু খ্রিস্টবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছি ও এর প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছি। আমি অনুভব করলাম, এমন একটি রহস্যময় ধর্মের উত্তরাধিকার হয়েছি, যা ছিলো অনুধাবনের ঊর্ধ্বে। এ কারণেই আমি নামেমাত্র খ্রিস্টান ছিলাম- কাজে নয়। এছাড়া, খ্রিস্টান বিশ্বাস (বা অবিশ্বাস) হেতু আমি বুঝতে পারি যে, মূলত আমি একটি নন-ধর্মাবলম্বী স্তরে উপনিত হয়েছি। এরপরও, সত্যের সন্ধানী হওয়ায় আমার একটি সুযোগ এলো- পিতা-মাতার মাধ্যমে প্রাপ্ত এ ধর্মবিশ্বাসের উপর অনুসন্ধান করার।

খ্রিস্টবাদের ওপর মুসলিম ও নন-মুসলিম কর্তৃক প্রচারিত বুকলেট, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি পড়ে-দেখে-শুনে অবিশ্বাস্যভাবে আমি শত শত শ্লোক বাইবেলে দেখতে পেলাম যা খ্রিস্টবাদী বিশ্বাসের মধ্যে মিল-সাদৃশ্যের চরম অভাব থাকাকে উন্মোচন করেছে। এসব তথ্য থেকে এটাই পরিলক্ষিত হলো যে, জিসাসের পূর্বে গড একক ছিলেন; জিসাস এক গডের কথাই প্রচার করেছেন। কিন্তু জিসাসের পর খ্রিস্টবাদের 'ত্রিত্ববাদ' অনুপ্রবেশ করেছে এক গডের পরিবর্তে। জিসাসের পূর্বে গড ছিলেন পুত্রহীন। অনুরূপ জিসাস বলেছেন, তিনি ছিলেন গডের বার্তাবাহক- কিন্তু তাঁর সময় পরে, খ্রিস্টবাদ জোর দিয়ে বলেছে, জিসাস ছিলেন গডের পুত্র বা স্বয়ং গড।

একত্ববাদের ব্যাপার হলো, প্রথম প্রভু-নির্দেশনা বলে: জিসাস একত্ববাদে বিশ্বাসী- "শুনো, হে ইসরাইল, প্রভু আমাদের গড হচ্ছেন একজন।" (মার্ক ১২:২৯) অনুরূপ, বাইবেলে আরো অসংখ্য শ্লোক আছে যার দ্বারা জিসাসের গড (ডিভিনিটি) হওয়াকে রদ করেছে। দৃষ্টান্ত হচ্ছে: জিসাস স্বীকার করেছেন, শুধুমাত্র গডের ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া নিজে নিজে

কোনো মিরাকল (মু'যিজা) সংঘটনে অপারগ[২৬]। লক্ষ্যণীয় বিষয়, জিসাস বাইবেলে বলেন, তিনি উপাসনা করেছেন[২৭]। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, "গড হয়েও জিসাস কীভাবে গডের নিকট প্রার্থনা করতে পারেন?" প্রার্থনাকারী গড- স্ববিরোধিতা! এছাড়া জিসাস বলেছেন, তাঁর শিক্ষাদান নিজের নয় বরং একজনের যিনি তা প্রেরণ করেছেন[২৮]। যৌক্তিকভাবে, যদি তিনি বলেন যাকিছু বলছেন তা তাঁর নয়- তাহলে তিনি একজন প্রফেট যিনি গডের পক্ষ থেকে বাণী প্রাপ্ত হন। ঠিক যেরূপ অতীতে (এবং পরে) নবীরা প্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া, জিসাস স্বীকার করেন যাকিছু তিনি করেন তা তাঁর গড শিখিয়েছেন[২৯]। আমি আবারো নিজেকে প্রশ্ন করি, "জিসাস কিভাবে শিখবেন এবং একই সময় প্রভু হবেন?" মুসলিমদের সঙ্গে আমার আলোচনাকালে জেনেছি, তারা জিসাস এক গডের ওপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। যেমনটি কুরআন শরীফের এই আয়াতে বলা হয়েছে:

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।" (ইখলাস (১১২): ১)[৩০]

বাইবেলের কিছু শ্লোকে জিসাসকে গডের একজন নবী হিসেবে বলা হয়েছে দেখে আমি অবাক হই।[৩১] অনুরূপ, আমি জিসাসের ইসলামিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে জানলাম যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন নবী ও বার্তাবাহক। কুরআনে করীমে আল্লাহ বলেন:

"মরিয়ম-তনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর তার জননী একজন ওলীয়া, তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে।" (মাইদাহ (৫): ৭৫)

---

[২৬] মেথিউ ১২:২৮; লুক ১১:২০; জন ২:২, ৫:৩০; এক্টস ২:২২।

[২৭] মেথিউ ২৬:৩৯; মার্ক ১:১৫; লুক ৫:১৬, ৬:১২।

[২৮] জন ৭:১৬, ১২:৪৯, ১৪:২৪ ও ৩১।

[২৯] জন ৮:২৮।

[৩০] আরো দেখুন, কুরআন ৪:৪৮, ৫:১১৬ এবং ৩৯:৬৭।

[৩১] মেথিউ ১৩:৫৭, ২১:১১, ৪৫-৪৬; মার্ক ৬:৪; লুক ৪:৪৩, ১৩:৩৩, ২৪:১৯; হিব্রুজ ৩:১।

খৃস্টবাদের আরেকটি সাধারণ বিশ্বাস যে, জিসাস ক্রাইস্ট হচ্ছেন গডের পুত্র। বাইবেলের মতে গডের যে কোনো প্রফেটকে 'গডের পুত্র' বলা ছিলো কৃষ্টিগত ব্যাপার। জিসাস নিজেকে কিন্তু মানুষের পুত্র বলেছেন- গডের জন্ম-দেওয়া পুত্র বলেন নি।[৩২] স্পষ্টত জিসাসকে 'গডের পুত্রে' পরিণত করেছেন সেন্ট পল। তিনিই জিসাসের শিক্ষাকে বিকৃত করেছেন।[৩৩]

আরো ব্যাপার হচ্ছে, জিসাস 'জন্মদাতা দ্বারা' জন্মাননি যেমনটি জনে বলা হয়েছে (জন ৩:১৬)। শব্দটি হচ্ছে 'begotten'। এ শব্দটি বাইবেলের রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভারসনে তুলে ফেলা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আধুনিক বাইবেলেও এ শব্দটি অনুপস্থিত। আরো কথা হচ্ছে, আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কুরআনে বলেছেন, তাঁর কোনো পুত্র নেই।[৩৪] তবে, গড এটাও ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আদম ও জিসাসকে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে:

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।" (আলে ইমরান (৩): ৫৯)

বাইবেলে এসব পরিবর্তন ছাড়াও পরবর্তীতে রোমান সম্রাট ও পাদ্রীগণ আরো কিছু মিথ্যা কথা যুক্ত করেছেন যার সঙ্গে জিসাসে যা বলেছিলেন তার কোনো সম্পর্কই নেই। এগুলোর মধ্যে মারাত্মক একটি হলো ত্রিত্ববাদ। যেখানে বলা হয়েছে, জিসাস হচ্ছেন 'তিনজন' গডের মধ্যে একজন [পিতা, পুত্র ও হলি গোস্ট]।[৩৫] বাইবেলে এ শ্লোকটিই হচ্ছে ত্রিত্ববাদ সত্য হওয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী প্রমাণ। কিন্তু এ বিশ্বাসটি জিসাস ও তাঁর সাগরিদগণ এবং খ্রিস্টান পণ্ডিতরা কখনও ঘোষণা করেন নি।

বাস্তবে, ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব নিকিয়ায় অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টানদের তুমুল তর্কাতর্কি পরে এ ত্রিত্ববাদী মতবাদটি গৃহীত হয়েছিল।

---

[৩২] মেথিউ ১৩:৩৭; লুক ১২:১০।

[৩৩] এক্টস ৯:২০।

[৩৪] কুরআন ১৯:৮৮-৯২।

[৩৫] জন (১) ৫:৭।

লক্ষ্যণীয়, এ শ্লোকটি এখন আধুনিক বাইবেল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এছাড়া, কুরআন ইহাহুদি ও খৃস্টানদের নির্দেশ দিচ্ছে, আল্লাহর ওহিকে অবিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে ও ত্রিত্ববাদকে বিশ্বাস না করতে।[৩৬]

আরো একটি সম্পর্কিত বিতর্ক সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। সেটা ছিলো 'আদি পাপ' (original sin) এবং জিসাসের 'ক্রুসিফিক্সনের' মাধ্যমে মুক্তিলাভ। মনে হয়, জিসাসের আগমনের পূর্বে এই আদি পাপের কোনো বিশ্বাসই উপস্থিত ছিলো না। এছাড়া, জিসাসের পূর্বে মুক্তি লাভ করা হতো প্রভুর আনুগত্যতার মাধ্যমে। আর জিসাসের পরে মুক্তি লাভের উপায় হয়ে যায়, তাঁর ক্রুসিফিক্সনের দ্বারা। তারা এটাই বলে।

তবে, আমি আবিষ্কার করেছি যে, খ্রিস্টবাদের এই বিশ্বাসটি খুব শক্তভাবে পুরাতন বাইবেলে (ওল্ড টেস্ট্যামেন্ট) খণ্ডন করা হয়েছে।[৩৭] এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ ধারণাটি পরিকল্পিতভাবে আক্বীদার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে- ফলে, খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের পাপের হিসাব-নিকাশ রোজ কিয়ামতে প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপন করা থেকে এড়িয়ে যেতে পারে।[৩৮] আমার দৃষ্টিতে বিষয়টি উন্মোচন হয় যে, জিসাস বলেছেন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ দ্বারা মুক্তি লাভ করতে পারে।[৩৯] কুরআনেও বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল মুতাবিক প্রতিদান দেওয়া হবে।[৪০] তবে স্বার্থপর খিসস্টানরা এ গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এই বলে যে, মুক্তিলাভ হয়ে গেছে জিসাসের ক্রুসিফিক্সনের মাধ্যমে![৪১]

ক্রুসিফিক্সনের মাধ্যমে সালভেশন (মুক্তি) লাভের থিওরিতে বলা হয়েছে, জিসাস নিজেই ক্রুসিফাই হতে এগিয়ে আসেন মানবতার মুক্তির বিনিময়ে। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ কারণে জিসাস গডের

---

৩৬ কুরআন ৩:১৯, ৪:১৭১, ৫:৭৩।

৩৭ এজেকিয়েল ১৮:২০; জেরেমিয়াহ ৩১:৩০।

৩৮ দেখুন এফসিয়ান্স ১:৭; রোমান্স ৩:২২-২৬, ৪:২৫, ১০:৯।

৩৯ মেথিউ ৫:১৯-২০, ৬:৪, ৭:১২, ১৯:১৭।

৪০ কুরআন ৩:২৫, ৪১:৪৬, ৭৪:৩৮।

৪১ রোমানস ৩:২৮; জন (১) ২:১-২।

নিকট সাহায্য চাইলেন সৈন্যরা তাঁকে আটক করার আগে?: "... ওহ পিতা! আমাকে এখন রক্ষা করুন।" অনুরূপ, কেনো বাইবেল বলে, ক্রুসে থেকে জিসাস চিৎকার দেন গডের সাহায্য চেয়ে: "... আমার গড! আমার গড! কেনো তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?" (মেথিউ ২৭:৪৬) এছাড়া, জিসাস কীভাবে সকল মানুষের মুক্তির জন্য ক্রুসিফাই হলেন যখন তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধুমাত্র ইসরাইলের বংশধরদের জন্য?[৪২] এগুলো সুস্পষ্ট সঙ্গতিহীনতা!

কুরআনে বলা আছে, তারা তাঁকে ক্রুসিফাই করে নি। এটা ছিলো অপর এক ব্যক্তি যে দেখতে জিসাসের মতো।[৪৩] এটাই যদি সত্যি হয় তাহলে জিসাসের সাথীদের নিকট ক্রুসিফিক্সনের পরও জিসাসকে দেখার ব্যাপারটির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। তিনি যদি সত্যিই ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তিনি সাথীদের কাছে আধ্যাত্মিকভাবে আসতেন। অথচ লুক ২৪:৩৬-৪৩ -এ আছে, তাঁর তথাকথিত ক্রুসিফিক্সন শেষে জিসাস সশরীরে সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেমতে, আমি জনালাম যে, সেন্ট পল জিসাসের পুনরুত্থান হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৪] সেন্ট পল এটাও স্বীকার করেছেন, পুনরুত্থান ছিলো তারই নিজস্ব গসপেল।[৪৫]

আমি বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি যে, সেন্ট পল ও অন্যান্যরা ইয়াহুদিদের কর্তৃক জিসাসের বার্তাকে অগ্রাহ্য করায় অনেকটা হতাশ হয়ে যান। সুতরাং তারা তাদের আহ্বানকে জেন্টাইলদের (অ-ইয়াহুদীদের) মধ্যে প্রচার করতে থাকেন।[৪৬] তারা দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হন। সেখানে তখন পৌত্তলিকতা ও বহুত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো। ক্রমান্বয়ে জিসাসের

---

[৪২] মেথিউ ১০:৫-৬, ১৫:২৪। এটা সুস্পষ্ট হলো তিনি ও তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীই কিছু বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠির স্বার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন একমাত্র রাসূল যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখন তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই।

[৪৩] কুরআন ৪:১৫৭-১৫৮।

[৪৪] রোমান্স ৫:১০-১১; এক্টস ১৭:১৭-১৮।

[৪৫] তিমতি (২) ২:৮।

[৪৬] অথচ জিসাস বা ঈসা আলাইহিসসালাম এসেছিলেন ইয়াহুদিদের নবী হিসেবে। তিনি বিশ্বনবী হয়ে আসেন নি।

বাণীকে তারা প্রয়োজনে পরিবর্তন করেছেন যাতেকরে তখনকার রোমান ও গ্রিকদের চাহিদা পূরণ করা যায়।[৪৭]

বাইবেল লেখা যোগ-বিয়োগ করা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এ কাজটিই করেছেন বাইবেলের মূল লেখকগণ।[৪৮] আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটি নিয়ে আলেচনা করেছেন কুরআন শরীফে:

"অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।" (বাক্বারাহ (২): ৭৯)

বাইবেলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আরেক গুরুত্ব বিষয় আমি অবগত হই বাইবেলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে। আমি আবিষ্কার করি যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে আছে (যদিও যাজকরা মূল ট্যাক্সট পরিবর্তন করেছেন)। জিসাসের পরে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটবে তা বলা হয়েছে।[৪৯] মুসলিম গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন, তাঁর পরে যার আগমন ঘটবে তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা জিসাস দিয়েছেন তা একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন। এ ব্যাপারে কুরআনে একটি আয়াত নাজিল হয়েছে যাতে বলা হয়েছে জিসাস কী বলেছিলেন:

"স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললেন: হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী

[৪৭] দেখুন ১ কর. ৯:১৯-২৩।

[৪৮] রেভেলেশন ২২:১৮-১৯।

[৪৯] ডিউটারোমনি ১৮:১৮-১৯: ইসায়াহ ২৯:১২; জন ১৪:১২-১৭, ১৬:৫-৬; এক্টস ৩:২২।

তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল: এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।” (সাফ (৬১): ৫)

আহমদ হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি নাম। এ নামটির মূলও একই ধাতু থেকে সৃষ্টি।

কুরআন শরীফে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমি লক্ষ করলাম, কুরআন শরীফ আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস আনতে নির্দেশ দিয়েছে। যেমন:

“বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।” (আরাফ (৭): ১৫৮)

আমি এটাও জানলাম যে, কুরআন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে:

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।” (আহজাব (৩৩): ৪০)

যদিও কুরআনে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তথাপি মুসলমানগণ পূর্ববর্তী সকল নবীদের ওপর বিশ্বাস রাখেন। এছাড়া তাঁদের ওপর যে কিতাবসমূহ নাজিল

হয়েছিল (ওগুলোর অপরিবর্তিত আসল বাণী) সেটাও মুসলমানদের বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত।[৫০]

আল-কুরআন: সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব

আমি অনুধাবন করলাম যে, পূর্বেকার আল্লাহর অবতরণকৃত বাণীগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হেতু এবং আগের নবীগণকে মানবজাতির বিশেষ কিছু দলের জন্য প্রেরিত হওয়ার ফলে, জিসাস ক্রাইস্ট পরেও আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ আরেকজন নবী প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর ওপর নাজিল করেছেন সর্বশেষ কিতাবও (আল-কুরআন)। তিনি চেয়েছেন, সমগ্র মানবজাতিকে একই বিশ্বাস-আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত করা। একমাত্র এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এক আল্লাহর প্রার্থনা করা কোনো শরীক ছাড়া। মুসলমানদের মতে পবিত্র কুরআন হচ্ছে চিরস্থায়ী পথপ্রদর্শনা গোটা মানবজাতির জন্য। এতে আছে জিসাস ক্রাইস্টের ওপর যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি। কুরআনে ঈসা (জিসাস) নামটি এসেছে ২৫ বার। এমনকি একটি সূরার নামকরণ হয়েছে জিসাসের মাতা মরিয়মের নামে।

এই ওহির্জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অবতরণকৃত তার নিশ্চয়তা পাই নিচের আয়াতগুলো থেকে:

"আর কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্যই এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে।" (ইউনুস (১০): ৩৭)

এবং

"নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য।" (হাক্কাহ (৬৯): ৫১)

---

[৫০] কুরআন ২:১৩৬।

অনুরূপ, আমি কুরআনের পরিবর্তন হয়েছে কী না এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলাম। কারণ পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে এটাই হয়ে ওঠে সর্বাধিক বিরাট সমস্যার কারণ। আমাকে এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, কুরআন কখনও পবির্তন করা হবে না। ঘোষণা দিয়েছেন মহাপ্রভু:

“আমি (আল্লাহ) স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ (কুরআন) অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।” (হিজর (১৫): ৯)[৫১]

আমি কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছি কুরআন শরীফ থেকে, যা নিশ্চিত প্রমাণ খাড়া করেছে যে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কালাম (কথা)। এখানে আছে আয়াতসমূহ যেগুলো মানব ভ্রূণের ক্রমোন্নতির বর্ণনা এসেছে।[৫২] বর্ণনা এসছে পাহাড়,[৫৩] বিশ্বের সৃষ্টিক্রিয়া,[৫৪] মানব মগজ,[৫৫] মহাসাগর,[৫৬] গভীর সমুদ্র এবং অভ্যন্তরীণ ঢেউ,[৫৭] আকাশের মেঘমালাসহ[৫৮] বহু বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। এটা ব্যাখ্যাতীত যে, চৌদ্দ শতবছরেরও বেশি পূর্বে কেউ এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অধিকাংশ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এই বিংশ শতকে এসে। সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এসব ব্যাপার কারোর জানা ছিলো না- তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর আল্লাহ যেহেতু এগুলোর সৃষ্টিকর্তা- তিনি এসব জানবেন, তা তো আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

[৫১] আরো দেখুন, কুরআন ৪:৮২।

[৫২] কুরআন ২৩:১২-১৪।

[53] কুরআন ১৬:৫, ৭৮:৬-৭

[54] কুরআন ২১:৩০, ৪১:১১

[55] কুরআন ৯৬:১৫-১৬

[56] কুরআন ২৫:৫৩, ৫৫:১৯-২০

[57] কুরআন ২৪:৪০

[58] কুরআন ২৪:৪৩

ইসলাম: পূর্ববর্তী সকল অবতরণকৃত ধর্মের নির্যাস ও শীর্ষবিন্দু

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, মানবজাতিকে যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তাহলো তাঁর উপাসনা করা। তিনি কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন:

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (জারিয়াত (৫১): ৫৬)

এ সম্পর্কে পশ্চিমা একজন সুপরিচিত ইসলামী গবেষক বলেন: "আজকের মানবজাতির নিকট যে ধর্মবিশ্বাসে পূর্ণাঙ্গ প্রভু-উপাসনা পদ্ধতি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ইসলাম। এমনকি 'ইসলাম' নামটির অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহর ইচ্ছের ওপর আত্মসমর্পণ'। যদি ইসলামকে একত্ববাদী তৃতীয় ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, বাস্তবে এটি মোটেই নতুন কোনো ধর্ম নয়! এটাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা প্রচার করে গেছেন অতীতের সকল নবী-রাসূল। আদম, ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুসসালামের ধর্ম ছিলো এ ইসলামই।"[৫৯]

তিনি আরোও বলেছেন: "যেহেতু একজন মাত্র প্রভু আছেন এবং মানবজাতি হচ্ছে একটি জাতি, তাই মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ধর্মকে নির্দিষ্ট করেছেন তা মাত্র একটি হওয়াই স্বাভাবিক। মানবিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজন-চাহিদা হচ্ছে সমরূপ। আর মানবিক স্বভাব-চরিত্র আদম ও হাওয়া এ গ্রহে পদার্পণের পর থেকে বদলে যায় নি।"[৬০]

আল্লাহর বার্তা সর্বকালেই একই হওয়ার ব্যাপারে সত্যটি যখন আমার নিকট উন্মোচন হয়ে গেলো, তখন অনুধাবন করলাম যে, সকল মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের সন্ধান করা। যে সমাজে ও ধার্মিক পরিবেশে জন্ম ও

---

[৫৯] The Purpose of Creation, Dr. A. A. B. Philips, p. 49, Dar Al Fatah, Sharjah, UAE, 1995. See Quran 3:67; 3:84.
[৬০] Ibid . p. 50.

বেড়েওঠা হয়েছে শুধুমাত্র সেসব ব্যাপার বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। মা-বাবার ধর্ম অনুসরণ করতে হবে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে। কুরআন বলে:

"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। ..." (ইউসুফ (১২): ৪০)

ফিতরত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব এক আল্লাহর উপাসনা করা- তথা মুসলমান হিসেবে জন্ম নেওয়া) সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"প্রত্যেক শিশু ফিতরতের (নিষ্কলুষ মানব স্বভাব) ওপর জন্ম নেয়। কিন্তু মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজকে দীক্ষিত করে। ঠিক যেরূপ একটি পশু তার শাবককে জন্ম দেয় নিষ্কলুষভাবে। তোমরা কী শাবককে কর্তন অবস্থায় জন্ম নিতে দেখো?" (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (রূম (৩০): ৩০)[৬১]

এছাড়া আমি শিখে নিলাম যে, ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন:

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।" (আলে ইমরান (৩): ৮৫)

---

[৬১] আরো দেখুন কুরআন ১:১৭০, ১০:১৯, ৩১:২১, ৪৩:২৩, ৪৯:৬, ৫৩:২৩।

আমি নিশ্চিতভাবে জানলাম, মানুষ আল্লাহর পথনির্দেশনাকে উপেক্ষা করে নিজেই নিজের জীবনবিধান বানিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে। অবশেষে কিন্তু, সে জানবে যে, এটা মূলত মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়- যা তাকে বোকা বানিয়েছিলো।

এক ভ্রমণকারী

আমি যখন কুআন অধ্যয়ন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করছিলাম, আমি লক্ষ করলাম ইসলাম মানুষকে এ জীবনে ভ্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তার ‘আসল বাড়ি’ হচ্ছে পরজীবনে যার কোনো শেষ নেই। আমরা এখানে এসেছি অল্প কিছুদিনের জন্য। এখান থেকে পরকালের জন্য কোনো কিছু নিয়ে যেতেও অপারগ একমাত্র ঈমান ও আমল ছাড়া। সুতরাং, মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে ভ্রমণকারী হিসেবে যে জমিনের উপর চলাফেরা করে কিন্তু এর প্রতি আকর্ষিত হয় না। মুসাফির হিসেবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, জীবন্ত থাকার অর্থ হচ্ছে পরীক্ষার মধ্যে থাকা। এ কারণেই জীবনে আছে ক্লেশ-কষ্ট, আনন্দ, বেদনা ও অনুপ্রেরণা। ভালো-মন্দের এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণাগুণকে জাগ্রত করা। অথচ, এসব পরীক্ষা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না- যদি না আমরা চেষ্টার ত্রুটি করে বসি। আমাদেরকে ধৈর্যসহ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। যাকিছু আমাদের ওপর পতিত হয় তা সবই তিনি আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।

স্বর্গীয় রাস্তা

বেহেশত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ছিলো আমার নিকট খুবই অর্থপূর্ণ। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে এটি অর্জন। এই চিরপ্রশান্তির বাসস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কুরআনে পাকে বলেন:

"কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" (সাজদাহ (৩২): ১৭)

আমি এটাও বুঝলাম যে, একটি অনন্দ অনুভব করবে বেহেশতিরা যার তুলনা নেই, তা হচ্ছে আল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত। আমি ভাবি, এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী কোন্ রূহগুলো হবে? বেহেশত লাভ হচ্ছে সর্বাধিক অমূল্য বিনিময়। আমাকে বলা হয়েছে, মূল্য হচ্ছে সত্যিকার ঈমান ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ।

আমি উপলব্ধি করি যে, মানবজাতিকে এক আল্লাহর ইবাদত করতেই হবে ন্যায়নিষ্ঠ হতে ও আধ্যাত্মিক উন্নত স্তরে আরোহণ করে বেহেশতে প্রবেশ করতে। এর অর্থ হচ্ছে, মানবসন্তানকে অনুধাবন করতে হবে, ইবাদত হচ্ছে খাবারগ্রহণ ও শ্বাস-নিঃশ্বাসের সমতূল্য। এটা প্রভুর কোনো লাভের জন্য করা হয় না। অধিকন্তু, আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করে বুঝার চেষ্টা চালাতে হবে, আল্লাহ তা'আলা কোন ধরনের মানুষ হতে আমাদেরকে পছন্দ করেন এবং সে মুতাবিক আমল করা। এটাই হচ্ছে বেহেশত লাভের রাস্তা।[৬২]

একটি বাঁধাকে অতিক্রম

এ পর্যায়ে আমি ৮০% নিশ্চিত হয়ে গেছি মুসলাম হতে। কিন্তু একটি ব্যাপার তখনও আমাকে বাঁধা দিচ্ছিলো। আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুরা কী ভাববে? আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে? কিছুদিন পরই আমার এ চিন্তার ব্যাপারটি একজন মুসলমানকে বললাম। তিনি বললেন, ভাই! বিচারদিবসে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। না তোমার পিতা, না মাতা না পরিবারের অন্য কোনো সদস্য বা বন্ধু-বান্ধব।[৬৩] সুতরাং, তুমি যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে ইসলামই

[৬২] দেখুন কুরআন ২:১১১-১১২, ১০:৬৩-৬৪।

[৬৩] দেখুন কুরআন ৩১:৩৩, ৮২:১৮-১৯।

হচ্ছে একমাত্র সত্যধর্ম, তাহলে তুমি একে আলিঙ্গন করো ও জীবন অতিবাহিত করো ঐভাবে যেভাবে তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

সুতরাং, এটা আমার নিকট স্বচ্ছ হয়ে ওঠলো যে, আমরা সবাই মূলত একই নৌকোর আরোহী। প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এরপর অবশ্যই আমাদেরকে নিজের ঈমান ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত করা হবে।[৬৪]

একটি অর্থপূর্ণ ভিডিও টেপ

আমার সত্যানুসন্ধানের এ পর্যায়ে এসে আমি ইসলামকে আলিঙ্গন করতে প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছি। ভিডিও টেপে জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ক একটি ইসলামী বক্তৃতা দেখলাম। এ বক্তৃতার মূল বিষয় ছিলো: জীবনের উদ্দেশ্য একটিমাত্র শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়: ইসলাম (আল্লাহর ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ)।

অপর একটি অতিরিক্ত বিষয় ছিলো এটি: অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের মতো ‘ইসলাম’ শব্দটি কোনো ব্যক্তি বা স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো না। নিচে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তা’আলা এ ধর্মের কথা উন্মোচন করেছেন:

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। ...” (আলে ইমরান (৩): ১৯)

যে কেউ ইসলামকে গ্রহণ করে, সে হয়ে যায় মুসলমান। তার বর্ণ, লিঙ্গ কিংবা জাতীয়তা যা-ই থাকুক না কেনো সে একজন মুসলমান। ইসলাম ধর্ম সর্বজনিন হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে এটি।

সত্যের সন্ধানের পূর্বে আমি ইসলামকে একটি পছন্দের ধর্ম হিসেবে ঐকান্তিকভাবে বিচেনায়ই নেই নি। এর কারণ ছিলো গণমাধ্যমে ইসলাম নিয়ে প্রতিনিয়ত নেতিবাচক উপস্থাপন। একইভাবে, উক্ত ভিডিও টেপে এটা

[৬৪] কুরআন ২৯:৫৭, ৩:১৮৫।

উন্মোচণ করা হয় যে, যদিও ইসলামকে উচ্চ নীতি-নৈতিকতার ধর্ম হিসেবে তুলে ধরা হয়- তথাপি এ ধর্মাবলম্বী সকল সুসলমান এ উচ্চ মানদণ্ডকে ধরে রাখতে পারছেন না আজকাল। আমি জানতাম, একই কথা অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমি অবশেষে বুঝতে সক্ষম হই যে, কোনো ধর্মবিশ্বাসকে শুধুমাত্র এর অনুসারীদের ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। কারণ কোনো মানুষই ভুলের উপরে নয়। এ বিবেচনায়, ইসলামকে এর অনুসরণকারীদের ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা যাচাই করতে পারি না। করা ঠিকও নয়। তবে যাচাই করতে হবে এর অবতরকৃত কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং এর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্ম তথা সুন্নাহ দ্বারা।

উক্ত ভিডিও বক্তৃতা থেকে শেষ যে বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছি তাহলো, কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব। আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি যে আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন তার জন্য উচিৎ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা:

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর (কৃতজ্ঞ হও)।” (নাহল (১৬): ৭৮)

আল্লাহ তা’আলা এটাও বলেছেন কৃতজ্ঞতা হতে হবে ঈমানের মাধ্যমে। তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন, তাঁর বান্দাদেরকে শাস্তি দিয়ে তিনি কিছুই অর্জন করেন না। না তিনি কিছু প্রাপ্ত হন যখন কেউ তাঁর শুকরিয়া আদায় করে ও তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন:

“তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক? আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।” (নিসা (৪): ১৪৭)

মহাসত্য নিজেই উন্মোচন হলো

উক্ত ভিডিও টেপটি শেষ হওয়ার পরই আমি দেখলাম মহাসত্য আমার মাঝে উন্মোচন হয়ে গেছে! আমি অনুভব করলাম, পাপের এক বিরাট ভর আমার কাঁধ থেকে অপসারিত হয়ে উড়ে গেছে। এছাড়া আমি যেনো টের পেলাম আমার আত্মাটি পৃথিবী থেকে উপরের দিকে আরোহণ করছে। দুনিয়ার কৃত্রিম স্বাদ ও হর্ষকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। আখিরাতের অনন্ত সুখ-শান্তির সম্মুখে এগুলো অতি নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করছে। এ অভিজ্ঞতা ও সেসাথে দীর্ঘদিনের যৌক্তিক অনুসন্ধান 'জীবনের উদ্দেশ্য কী' এ প্রশ্নের জবাব উন্মোচন হলো আমার মাঝে। এটা উন্মোচন করে, নিঃসন্দেহে ইসলামই ছিলো মহাসত্য। এর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেলো আমার 'আধ্যাত্মিক জগতের' শূন্যতা- ঈমান, উদ্দেশ্য, দিকনির্দেশনা ও আমল দ্বারা।

সুতরাং আমি ইসলামের তোরণ দিয়ে প্রবেশ করলাম শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করে: "আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।" হয়ে গেলাম মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ!

আমাকে বলা হলো উক্ত শাহাদাতের বাণী সকল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস ও সেসঙ্গে তাঁদের প্রতি নাজিলকৃত সকল আসমানী কিতাব ও বাণীকে (তাদের অবিকৃত অবস্থায়) বিশ্বাস করাও বুঝায়। এর দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সর্বশেষ ধর্মকে গ্রহণ করা হলো। এ শেষ ধর্ম যার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর ওপরই মহাসত্যের বাণীসহ নাজিল হয় সর্বশেষ আসমনী কিতাব আল-কুরআনুল করীম।

আমার নিকট সত্বঃসিদ্ধভাবে উন্মোচন হলো যে, যদি ঈসা আলাইহিসসালাম সর্বশেষ নবী হতেন ও বাইবেল (ইঞ্জিল) সর্বশেষ আসমানী কিতাব হতো তাহলে আমি খ্রিস্টবাদ গ্রহণকালে এ সাক্ষ্য প্রদান করতাম। কিন্তু তা না করে যথার্থই আমি নবীকূল শিরোমণি ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিলকৃত আল্লাহর বাণীকে অনুসরণ করলাম। একে ও এর নবীকে অনুসরণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

একজন নও-মুসলিমের ছাপ

আমার এ মহাসত্যের সন্ধানকালে যে শিক্ষা সব শিক্ষাকে অতিক্রম করে প্রকাশ হয়েছে তাহলো, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যতো বস্তু আছে তা সবই মতিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। যে কেউ এ ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছেন, তার জন্য একমাত্র রাস্তা হলো, শুধুমাত্র এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সমর্পণ করায় আমি অনুভব করেছি আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে, অপরদের সাথে ও সবশেষে নিজের সাথে। স্বভাবতই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আমার প্রভুর দয়ায়, আমি উদ্ধার পেয়েছি অজ্ঞতার গভীরতা থেকে এবং পদার্পণ করেছি সত্যের আলোতে। ইসলাম- সর্বযুগ, সকল মানুষ ও স্থানের সত্যধর্ম। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সফল করতে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাকে ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত করে যেদিন সে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট ফিরে যাবে।

ইসলামের রাস্তা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ খুলে যায়। সে তার প্রভুর নৈকট্য পেয়ে ধন্য হয়। এছাড়া লাভ করে মহাসুখের অনন্ত জীবন বেহেশতের মাঝে। অপর এক বোনাস হচ্ছে, ইহকালের জীবনও হয়ে যাবে অনেকটা সুখ-শান্তির।

এক প্রতারণামূলক আনন্দ

ইসলামকে আলিঙ্গন করায় আমি অনুভব করেছি দুনিয়াবী জীবনের প্রতারণার স্বরূপকে- আরো একটু বেশি। যেমন, ইসলামের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার মুক্তি। এজন্য একজন মুসলিম নিজেকে ‘আবদুল্লাহ’ (আল্লাহর দাস বা গোলাম) বলে। এর কারণ হলো, আল্লাহর গোলামী হেতু

মানুষ অন্যান্য সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদিও আধুনিক মানুষ ভাবে, সে স্বাধীনতা লাভ করেছে- বাস্তবে সে তার আকাঙ্ক্ষার গোলামে পরিণত হয়েছে। সাধারণত সে তার জাগতিক জীবনে প্রতারণার মধ্যে পড়ে গেছে। সে নেশাগ্রস্ত হয়েছে বেশি থেকে বেশি অর্জন করতে ধন-সম্পদ, নারী, বাড়ি, গাড়ি, ড্রাগাসক্তি ইত্যাদি। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সিস্টেমের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে মিথ্যা প্রয়োজন আবিষ্কারের মাধ্যমে, যা পাওয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করতে বলে জরুরত মনে করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কী সুন্দরভাবে:

"আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পাদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।" (ফুরক্বান (২৫): ৪৩-৪৪)

সঙ্গত কারণেই, আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপণাকে অস্থায়ী এ দুনিয়ার ফূর্তি-আমোদের মাঝে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এতেকরে পরকালের অশেষ জিন্দেগিকে চিরশান্তির বেহেশতের জীবন লাভকে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারি। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে বলেছেন:

"মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?- যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।" (আলে ইমরান (৩): ১৪-১৫)

অতএব, এ দুনিয়ায় আসল প্রতিযোগিতা সম্পদ লাভ কিংবা সুনাম-খ্যাতি অর্জন নয়- বরং, সঠিক আমল দ্বারা কে কতটুকু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

করা যায়, সে প্রতিযোগিতাই হবে উত্তম।[৬৫] জানা থাকা প্রয়োজন, প্রত্যেকের রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আছে।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌছুনোর সঠিক রাস্তা

এ জগতে অনেক ধর্ম বিদ্যমান। কে কোনটির অনুসারী হবে তা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সে হচ্ছে একজন বণিকের মতো যার সম্মুখে উপস্থিত আছে অনেক ধরণের পণ্য। কোনটি দ্বারা সে বাণিজ্য করবে সেটা তার পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। স্বভাবতই সে ঐ পণ্যটি পছন্দ করবে যার দ্বারা সর্বাধিক বেশি লাভবান হওয়া যায়। তবে বণিকের এটাও জানা যে, লাভবান হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার পণ্যটির চাহিদা থাকতে পারে- ফলে সে বেশ লাভবান হবে। তবে এর বিপরীতও হতে পারে। এ পণ্যে বিনিময় করে অনেক টাকা লোকসান হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

অপরদিকে, আল্লাহর একত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী কেউ যে তার নিজকে প্রভুর ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করেছে (একজন মুসলমান)- সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত যে, সে যদি পথপ্রদর্শনের গাইডবুকদ্বয় (আল-কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ) অনুসরণ করে, তাহলে অব্যশই সফল হবে। তার জন্য এ সফলতার বিনিময় অপেক্ষা করছে রাস্তা শেষে আগত অনন্ত জীবনে। সৌভাগ্যবশত, চলার শুরুতেই এ সফলতার নিদর্শন প্রকাশ হয়ে যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যদি কেউ আন্তরিকভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (ইসলামগ্রহণ) এর পরই শুরু হবে নতুনভাবে পাপ-পুণ্যের হিসাব। তার উত্তম আমলের বিনিময় হবে দশ থেকে সাতশত গুণ বেশি।

[৬৫] কুরআন ২৮:৭৭।

আর একটি পাপের জন্য একটি পাপই লিখা হবে যদি না আল্লাহ তা'আলা সেটি ক্ষমা করেন।" (সহীহ বুখারী)

উপসংহার

আমার এ সত্যানুসন্ধানী গবেষণা থেকে এটাই আমি উপসংহারে বলবো যে, আল্লাহতে আমাদের বিশ্বাস ও আমলই নির্ভর করছে অনন্ত জীবনে আমরা কোন্ অবস্থায় থাকবো। আমাদের সৃষ্টিকর্তা সবাইকে সমান সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের অবস্থা যাই হোক, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে শেষবিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতির জন্য দুনিয়াতে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে বলেন:

"আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও- যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।" (আলে ইমরান (৩): ১৩২-১৩৩)

আমরা আন্তরিকভাবে জীবনের সত্যকে কামনা করি, যা হচ্ছে ইসলাম (আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজেকে আত্মপমর্পণ করা)। আল্লাহ আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবেন- ইনশাআল্লাহ! তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, জীবনকে ও তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে নিয়ে গবেষণা ও অনুসরণ করতে। কারণ তিনিই হচ্ছেন, সর্বযুগের মানুষের জন্য রোল-মডেল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন নিয়ে গবেষণা করা। যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, কুরআন হচ্ছে দরোজায় অনবরত কড়া নাড়ার মতো, কিংবা উচ্চস্বরের ডাক- যার উদ্দেশ্য ওদেরকে জাগ্রত করা যারা ঘুমিয়ে আছে। কারণ, তারা দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যের মাঝে ডুবে গেছে। কড়া-নাড়া ও উচ্চরব একটার পর আরেকটা ঘটে যাচ্ছে: জাগো! চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখো! চিন্তা করো! ভেবে দেখো! এখানেই আল্লাহ!

এখানে আছে পরিকল্পনা, পরীক্ষা, জবাবদিহিতা, হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান, কঠিন শাস্তি ও চিরন্তন পরমানন্দ!

এটা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, সর্বাপেক্ষা উত্তম যে রাস্তায় এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে মরতে চাই, তাহলো একজন পরহেজগার মুসলমান হিসেবে! যখন কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুয়ে যায় যে, ইসলামই হচ্ছে মহাসত্য- তার জন্য ইসলামে দীক্ষিত হওয়াকে এক মুহূর্তের জন্য দেরি করা উচিৎ হবে না। কারণ সে যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে। তখন তো বেশি দেরি হয়ে যাবে।[৬৬]

ইসলামকে আলিঙ্গনের কয়েক মাস পর পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে আয়নার মতো ভেসে ওঠেছে যা আমেরিকান মুসলমানরা কীভাবে বেঁচে থেকে মরতে হবে, সে ব্যাপারে আমাকে বলেছিলেন:

“এরই ওছিয়ত করেছেন ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।” (বাক্বারাহ (২): ১৩২)

এবং

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান (৩): ১০২)[৬৭]

---

[৬৬] দেখুন কুরআন ২৩:৯৯-১০০, ৬৩:১০-১১।

[৬৭] https://www.islamreligion.com/articles/1871/viewall/donald-w-flood-ex-christian-usa/#_ftnref9347

ডায়ান চার্লস ব্রেজলিন

প্রাক্তন খ্রিস্টান-নাস্তিক - আমেরিকা

কট্টর ক্যাথোলিক মহিলা বাইবেল পড়ে ঈমান হেরে ইসলামে দীক্ষিত

ডায়ান চার্লস ব্রেজলিন একজন কট্টর রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ছিলেন। একদা কিছুটা সমালোচনার দৃষ্টিতে বাইবেল পাঠ করে ঈমান হারান। এতে এক প্রভু থাকার ব্যাপারে বিশ্বাস অন্তরে থেকে যায়। এরপর অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ওপর অধ্যয়ন করে খুঁজে পান সত্য ইসলামের মধ্যে। সত্যানুসন্ধান ও ইসলামগ্রহণের তাঁর এ অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী এখন নিজের ভাষায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন সেভাবেই তুলে ধরছি।

আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, কীভাবে মুসলমান হলাম? আমি সবসময় জবাবে বলে থাকি, বাস্তবে আমি সর্বদাই এটা অনুভব করতাম যে এক ও একমাত্র প্রভুকে বিশ্বাস করতাম। তবে এ অনুভূতির অর্থ কী তা আমি তখনই অনুধাবন করি যখন আমি শুনতে পেলাম একটি একত্ববাদী ধর্ম আছে যার নাম ইসলাম ও এর একটি আসমানী গ্রন্থ আছে যার নাম আল-কুরআন।

তবে আমাকে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে দিন আমার আমেরিকান কৃষ্টিগত ধর্মবিশ্বাস আইরিশ ক্যাথলিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে।

ক্যাথোলিক আমি ছিলাম অবশ্যই

দীর্ঘ তিন বছর খ্রিস্টান মিশনারী ট্রেনিং নিয়েছিলেন আমার পিতা। তিনি ছিলেন তেরো জন ভাইবোনোর মধ্যে সবার বড়ো। সবার জন্ম হয় বসটন এলাকায়। তার দুজন বোন নান (খিস্টান মঠের সেবিকা) হয়েছিলেন। এছাড়া তার খালাও (মায়ের বোন) নান হন। আমার পিতার ছোটভাইও সেমিনারিতে (মিশনারী ট্রেনিং সেন্টার) গিয়েছেন। তবে ৯ বছর পর পদত্যাগ করেন। আমার দাদী প্রত্যহ ভোরে উঠে ড্রেস পরে নিকটস্থ টিলা বেয়ে উপরে উঠতেন

সেখানে স্থাপিত চার্চের প্রাতঃকালীন উপসনায় যোগ দিতে। এসময় পরিবারের অন্যান্য সবাই থাকতেন ঘুমের ঘোরে। আমার মনে আছে দাদী ছিলেন একজন কঠোর, দয়ালু, নীতিবান, শক্তিশালী মহিলা ও খুব গাম্ভির্যপূর্ণ। সে দিনগুলোর জন্য এরূপ চরিত্রের মানুষ পাওয়া ছিলো বিরল। আমি নিশ্চিত যে, তিনি আমার সম্মুখে কখনও ইসলাম সম্পর্কে কিছু উচ্চারণ করেন নি। আল্লাহ তাকে সেভাবেই বিচার করুন, যেভাবে তার অন্তরে বিশ্বাস ছিলো। অনেকেই আছে যারা কখনও ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয় কিন্তু, অন্তরে এক প্রভুর বিশ্বাস রাখে ও উপাসনা করে। তবে তারা অবশ্যই নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাবলাম্বী হিসেবেই পরিচিত।

আমাকে একটি ক্যাথোলিক নার্সারি স্কুলে ভর্তি করা হয় ৪ বছর বয়সে। পরের ১২ বছরই এখানে লেখাপড়া করেছি। এখানে ত্রিত্ববাদের ভারী ডৌজ দিয়ে আমাকে কট্টর ক্যাথোলিকে পরিণত করা হয়। সবদিকে এখানে সেখানে ঝুলন্ত দেখতাম ক্রুস। এগুলো ঝুলতো নানদের গলায়, ক্লাসরুমের দেওয়ালে, দৈনিক যে চার্চে যেতাম সেখানে এবং আমার বাড়ির প্রায় প্রতিটি কক্ষে শোভা পেতো এই ক্রুসটি। এছাড়া হলি ছবির (পবিত্র ছবি - আইকোন) মর্যাদা সম্পর্কে কী আর বলবো। যেদিকে তাকাতাম সেদিকেই দেখতে পেতাম টাঙ্গানো আছে শিশু জিসাস ও তাঁর মায়ের ছবি: কোনোটিতে তিনি খুশি, কোনোটিতে বেজার- তবে সবটিতেই পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ নারী হিসেবে অঙ্কিত। মঝে মধ্যে সেন্ট ও আ্যাঞ্জেলদের (খিস্টান সিদ্ধপুরুষ ও ফিরিশতা) ছবিও এখানে সেখানে শোভা পেতো।

আমার মনে পড়ে লাইলাক ও লিলিফুল তুলে এনে সাজিয়ে রাখতাম বাড়ির উপরতলার বারান্দায় রাখা মাদার মেরির বড়ো মূর্তির পায়ের নিকটস্থ ফুলদানিতে। এটি আমার বেডরুমের পাশেই ছিলো। আমি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করেছি, ফুলের ঘ্রাণ উপভোগ করেছি, দৃষ্টিপাত করেছি মূর্তির মাথার দীর্ঘ বাদামী চুলের প্রতি।

আমার ১২তম জন্মদিনে মা আমাকে বাইবেলের একটি কপি উপহার দিলেন। ক্যাথোলিক হিসেবে ভেটিকান কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত গ্রন্থাদি ছাড়া আর কিছু পাঠ করতে অনুৎসাহিত করা হতো। অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে চিন্তা-

গবেষণা ছিলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এরপরও আমি পাঠ করেছি মুক্তভাবে। আশা ছিলো এমন কিছু পড়বো যা ছিলো আমার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তবে বাইবেল পড়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হলাম- এটা কী প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত না মানুষের রচনা? বুঝা কঠিন ছিলো। অপরদিকে তখন তো 'প্রভুর প্রেরিত কিতাব' হিসেবে একমাত্র বাইবেলই ছিলো আমার নাগালের মধ্যে।

আমি যখন মধ্য-টিনেজে তখনই চার্চের উপস্থিতি কমে যায়। আর বিশ বছরে পদার্পণ করার সময় আমার মধ্যে তো মূলত কোনো ধর্মবিশ্বাসই ছিলো না। এসময় আমি বৌদ্ধবাদ ও হিন্দুবাদের ওপর বেশ পাঠ করেছি। এছাড়া স্থানীয় ব্যাপ্টিস্ট চার্চেও গিয়েছি কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু এদের কোনোটিই আমাকে ধরে রাখতে পারে নি। সময় চলে যেতে লাগলো। আমি ধর্মহীন- তবে একটি দিবসও কাটে নি 'গডের সঙ্গে আলাপ' না করে। বিশেষকরে ঘুমোনোর পূর্বে আমি সব সময়ই গডকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাতাম। এভাবে গডের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কেউ আমাকে বলে নি- এটা ছিলো স্বাভাবিক।

অন্যরা

মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতিকালে আমি সর্বপ্রথম কুরআন সম্পর্কে অবগত হই। তখন পর্যন্ত সকল আমেরিকানের মতো যা জানতাম তা ছিলো: আরবারা একদল রহস্যময় মানুষ, ধূসর রাক্ষস- যাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমাদের সভ্যতাকে ধ্বস করা! ইসলাম কখনও উল্লেখিত হয় নি। শুধুমাত্র রুক্ষভাব, নোংরা আরব এবং মরুভূমির উট ও তাঁবু- এসব কথাই শুনেছি। শিশু থাকতে ধর্মশিক্ষার ক্লাসে আমি চিন্তা করতাম, খ্রিস্টান ছাড়া 'অন্যরা' কে বা কোন ধর্মাম্বলী ছিলো?

জিসাস কানা, গ্যালিলি ও নাজারাতে বিচরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চোখের রং নীল- অন্যরা কে ছিলো? আমি তখনই ভাবতাম, এখানে কোথাও কোনো একটা 'মিসিং লিংক' বিদ্যমান। আরব-ইসরাইলী যুদ্ধ হয় ১৯৬৭

সালে। সে সময় আমরা সবাই 'অন্যদের' সর্বপ্রথম দেখার সুযোগ পাই। তাদেরকে অধিকাংশ মানুষ মনে করতো দুশমন। কিন্তু কেনো যেনো, আমি তাদের পছন্দ করতাম। আজো আমি এর কারণ বলতে পারবো না। শুধু এটুকু, তারা আমার মুসলিম ভাই-বোন ছিলেন।

আমার বয়স তখন ৩৫ বছর যখন কুরআনের প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করি। আমি এ নিয়তে এটি খুলেছিলাম যে, ভাসাভাসাভাবে পাঠ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাবো। মুসলমানদের বাসস্থান ও ধর্মকর্ম হবে আমার মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য উপকারী। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে খুলতেই দৃষ্টিতে পড়লো সূরা মু'মিনূন (বিশ্বাসীরা)। বিশেষ করে এই আয়াতগুলোর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো:

"আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। অতএব, তাদেরকে কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন।" (সূরা মু'মিনূন (২৩) : ৫২-৫৪)

প্রথমবার পাঠ করেই আমি বুঝতে পারি, এ কথাগুলো ছিলো সত্যসিদ্ধ-স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ। এর দ্বারা সব মানবতার নির্যাস উন্মোচন হয়েছে। আমি ইতিহাসে যা পাঠ করেছিলাম তা প্রমাণিত হয়েছে।

মানবতা সত্যকে অবজ্ঞেয়ভাবে অস্বীকার করেছে। বিশেষ হওয়ার তাদের অবনরত ব্যর্থ প্রতিযোগিতা এবং অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা সবই এ কটি কথার মধ্যে বলা হয়েছে। জাতিভিত্তিক দেশ, জাতীয়তাবাদ, কৃষ্টি, ভাষা- এসব দিয়ে সবাই নিজেকে অপর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা মূলত ভ্রান্ত। বাস্তবে এসব পরিচিতি আমাদের আসল পরিচিতিকে ঢেকে রেখেছে। মানবতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই- আমরা সকলেই তো এক প্রভুর বান্দাহ মাত্র যিনি সবকিছু ও সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।

আমি এখনও জিসাস (আ.) ও তাঁর মাতা মরিয়মকে (আ.) ভালোবাসি

শিশু থাকতে আমরা বলতাম, "ও হলি (পবিত্র) মেরি, মাদার অব গড (গডের মাতা), আমাদের জন্য উপসনা করুন- কারণ আমরা পাপী, এখন ও আমাদের মৃত্যুর সময়- এ্যামেন।" এ কথাগুলো "হেইল মেরি" নামক উপাসনা বইতে ছিলো। আমি এখন বুঝতে পারছি মেরিকে কতটুকু অবজ্ঞা করা হয়েছে তাঁকে 'প্রভুর মাতা' হিসেবে ভ্রমাত্মক উপস্থাপনা করে। তাঁকে সকল নারীদের থেকে মনোনীত করা হয়েছে মহান এক নবীর জন্মমাতা হিসেবে কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই। এ মর্যাদাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ও যথার্থ। আমার মাতা মেরির সাহায্যের জন্য সর্বদা আবেদন জানাতেন। তিনি এরূপ করা এই বলে বৈধতা দিতেন যে, তিনিও একজন মা ছিলেন এবং আরেক মায়ের দুঃখ-বেদনা বুঝেন।

আমার মা ও অন্যান্যদের বুঝা উচিত, সে সময় এই পবিত্র মেরিকে ইয়াহুদিরা কী জঘন্যভাবে অপবাদ দিয়েছিল। তারা তাঁকে সর্বাধিক কঠিন পাপী হিসেবে সাব্যস্ত করে- আর তা ছিলো ব্যভিচার। মেরি (আ.) এ সবই সহ্য করেছেন। কারণ তিনি জানতেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর পক্ষে আছেন- তিনি নির্দোষ।

মেরি (আ.) এর ঈমানী শক্তি ও গডের দয়া ও তাঁর উপর নির্ভরতা হেতু তিনি চিরন্তনভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং স্থান করে নিয়েছেন সকল উত্তম নারীদের স্তরে। একই সময়, তাঁকে খ্রিস্টানরা যে 'মাদার অব গড' বলে তা কী ঐ ইয়াহুদিদের অভিযোগ-অপবাদ থেকেও মারাত্মক নয়?

মুসলমান হিসেবে আপনি মেরি ও জিসাসকে ভালোবাসতে পারেন। তবে আল্লাহকে ভালোবাসা দ্বারা আপনি আরো বেশি উপকৃত হবেন। আপনি লাভ করবেন চিরসুখের বেহেশত। তাঁর আইন-কানুনকেই মানা হচ্ছে আপনার জন্য ফরয। একদিন তিনি তোমার বিচারক হবেন যখন কেউ তোমার সাহায্যকারী পাবে না। তিনিই তেমোকে, জিসাসকে ও তাঁর পবিত্রাত্মা মাতাকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এবং মসগ্র মানবজাতিকে। নবী-রাসূলদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং জীবিত সবাইও একদিন মারা যাবে- কিন্তু প্রভু আল্লাহ কখনও মরবেন না।

জিসাস (আরবিতে ঈসা) আলাইহিসসালাম একবারও গড হওয়ার দাবি করেন নি। তিনি বরং বার বার বলেছেন, আমি প্রেরিত। আমার যৌবনকালের শুরুতে যে ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা আমি পেয়েছিলাম, সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে সক্ষম হই যে, এর মূল ছিলো চার্চের দাবি- জিসাস যেটুকু স্বীকার করেছেন তার চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন। চার্চের পাদ্রীরা একটি আক্বীদা সৃষ্টি করেছেন যাতেকরে তারা ত্রিত্ববাদের ধারণাকে প্রমাণ করতে পারেন। মূল আসমানী কিতাবদ্বয় তাওরাত ও ইঞ্জিলকে পরিবর্তন করেই ত্রিত্ববাদকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

সত্যসিদ্ধ ব্যাপার হচ্ছে, জিসাস ক্রাইস্ট একজন নবী ছিলেন। হ্যাঁ, একজন বার্তাবাহক, যিনি এনেছিলেন এক আসমানী কিতাব সে একজনের পক্ষ থেকে যিনি তাঁকে প্রেরণ করেন। জিসাসকে (আলাইহিসসালাম) যদি আমরা এরূপ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করি, তাহলে এটা সহজ হয়ে যায় শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ও তাঁর প্রবর্তিত ইসলামকে গ্রহণ করা। তিনি তো জিসাসের পরের একজন ভাই ছিলেন। একই মিশন নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করেন। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁরই উপাসনা করতে বলেছেন- যা ইয়াহুদিরে প্রতি প্রেরিত জিসাসও আহ্বান জানান। নবী-রাসূলদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে তর্কবিতর্কের কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। তাঁরা কোথায় কোন দেশ ও জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, সেটাও মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আরব, ইয়াহুদি, আর্য, হলুদ বা নীল, দীর্ঘকায় না বেঁটে এসব কিছুই আসে যায় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক ছিলেন কী না।

ইসলামকে জানার পর যখনই আমি জিসাস আলাইহিসসালাম নিয়ে ভাবি, আমি অনুভব করি একটি সম্পর্ক- যে সম্পর্কের মূলে হলো একই বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত একটি পারিবার। দেখুন, জিসাস ছিলেন ‘মুসলমান’- যে তাঁর প্রভুর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পিত করেছেন।

দশ কমান্ডমেন্টের প্রথম দুটি বলে:

১. আমি তোমাদের প্রভু, আমার সম্মুখে তোমরা মিথ্যা প্রভু উপস্থিত করো না।

২. তোমরা তোমাদের প্রভু গডের নাম নেবে না বিফলভাবে।

যে কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সঠিক অর্থ জানে, সে সাথে সাথে উপরোক্ত কমান্ডমেন্টের সাথে মিল পেয়ে যাবে। সুতরাং আমরা একত্রিত করতে পারি সকল নবী-রাসূলের জীবনবৃত্তান্তকে এবং বক্রতা করার প্রবণতাকে চিরতরে বন্ধ করতে পারি।

"তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।" (মরাইয়াম (১৯): ৮৮-৯০)

ইসলামে আমার ভ্রমণ

দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হলো অনুসন্ধান ও কুরআন অধ্যয়নের মাঝে। এরপরই আমি সিদ্ধান্ত নিই ইসলামে দীক্ষিত হতে। অবশ্য বস্ত্র পরিধান ও অভ্যেস পরিবর্তনের ব্যাপারে আমি ভীত ছিলাম। ডেইটিং (পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তারিখ নির্ধারণ), মদপান ইত্যাদি ছিলো আমার নিত্যদিনের অভ্যাস। এছাড়া গান-বাজনা ও নৃত্য ছিলো আমার জীবনের বড়ো একটি অংশের অন্তর্ভুক্ত। বিকিনি ও মিনি স্কার্ট পরায় আমি হয়ে ওঠি বিখ্যাত! অবশ্য এসব অভ্যেসে জড়িত থাকাকালে আমি কোনো মুসলমানের সাক্ষাৎ পাই নি। আমি যে এলাকায় বাস করতাম সেখানে একজনও মুসলমান ছিলেন না সে যুগে। এরপর একদল অভিবাসী এলো বাড়ি থেকে অন্তত ঘণ্টাখানেকের

ড্রাইভ দূরত্বে যাদের কেউই ইংরেজি বলতে পারতো না। সমগ্র রাজ্যের মধ্যে একটিমাত্র মসজিদ ছিলো আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ভাবতাম, শুক্রবার দিন ওখানে গেলে মুসল্লিরা আমার দিকে অদ্ভূত দৃষ্টিতে তাকাবে- ভাববে আমি হয়তো গোয়েন্দার সদস্য! এসময় এবং এখনও অনেক গোয়েন্দা মুসলিম যে কোনো সবাবেশে উপস্থিত থাকে।

মোটকথা আমাকে সাহায্য করার মতো একজনও মুসলিম আমেরিকান ছিলো না। আমার জীবনের এ পর্যায়ে পিতার মৃত্যু হলো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। আমি তার মৃত্যশয্যায় পাশেই ছিলাম। বুঝতে পারলাম মৃত্যুর ফিরিশতা তার আত্মাকে কীভাবে বের করে নিয়ে গেছেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। তার কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরছিলো। একটি জীবন ছিলো তার বিলাসিতার- আনন্দনৌকো, কান্ট্রি ক্লাব, দামি গাড়ি ... নিজের ও মায়ের জন্য- ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থেকে তার জীবনটি কেটেছে। এসব বস্তু লাভের অর্থ আসতো ব্যাংকে রাখা টাকার সুদ হিসেবে। সব আজ শেষ হয়ে গেলো।

আমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠলাম। ভাবলাম, সময় এখনও আছে। আমি জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবো। আর অন্ধভাবে বেঁচে থাকতে চাই না। এর কিছুদির পরই আমি মিশরে আসি। আরবি ভাষার ওপর ধৈর্যসহ বেশ কিছুদিন অধ্যয়ন করি। এরপর সুস্পষ্ট মহাসত্য আবিষ্কৃত হয়ে গেলো: আল্লাহ এক ও চিরন্তন; কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি, না তিনি কারো জন্ম দেন- তাঁর মতো কেউ নেই।

মানুষের সমধিকারে বিশ্বাসও একটি কারণ ছিলো এ সত্যধর্মের প্রতি আকর্ষণের। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ হচ্ছে একটি চিরুনির দানার মতো- সব সমান। আর সর্বোত্তম সে যে সর্বাপেক্ষা বেশি পরহেজগার। কুরআনও আমাদেরকে বলছে: সর্বোত্তম সে যে সর্বাধিক পরগেজগার। ধর্মানুরাগ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর ভীতির মধ্যে নিহিত। তাঁকে জানা হচ্ছে তাঁকে ভালোবাসা। আমি আরবি ভাষা শিক্ষা করা শুরু করি, আল্লাহর কথাগুলো পাঠ করতে যেরূপ যে ভাষায় তা অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের শিক্ষা আমার জীবনের প্রতিটি উপাদানে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমি আর জাগতিক কোনো বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছিলাম না। না গাড়ি, না বস্ত্র, না কোনো বিলাস ভ্রমণ আমাকে লোভাতুর করেছে মিথ্যা ও বাতিল আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগ্রত হয়ে। অথচ ইতোমধ্যে আমি এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আমি অবশ্য একজন বিশ্বাসী হিসেবে ভালো জীবন-যাপনে অভ্যস্ত আছি। কিন্তু যেরূপ বলা হয়: এটি আর হৃদয়ে প্রোথিত ছিলো না। শুধু বাহ্যিকতা। পূর্বকালীন বন্ধু ও পরিবার-পরিজনকে হারানোর ভয় আর আমার মাঝে নেই। যদি আল্লাহর ইচ্ছে হয় এদেরকে নিকটে এনে দিতে- তাহলে তা-ই হোক। কিন্তু আমি জানি, ঠিক যাকিছু আমার প্রয়োজন তা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। বেশিও নয়, কমও নয়। এখন আমি আর উদ্বিগ্ন কিংবা দুঃখবোধ করি না। না আমি নিজেকে বড়ো ভাবি, যাকিছু আমার জীবনে ঘটেছে তাঁর ইচ্ছায়। আমি অনুভব করছি আল্লাহর অনুগ্রহ হেতু নিরাপদ আছি। তিনি তো এক আল্লাহ্, যাকে আমি আগে থেকেই জানতাম কিন্তু নাম কী তা জানতাম না।

আমেরিকার জন্য একটি দুআ

আমি মহান অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি: হে প্রভু! প্রত্যেক আমেরিকানকে তোমার একত্বের বার্তাকে সহজ-সরলভাবে শুনার সুযোগ দিন। আমেরিকানরা ইসলামের আসল স্বরূপ এখনও অবগত নয়। তারা প্রায় সবসময় রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সর্বদাই তারা মানুষের কার্যকলাপকে গুরুত্ব দেয়। এখন সময় এসেছে নবী-রাসূলদের ক্রিয়া-কলাপ ও বাণী নিয়ে ভাবনার। তাঁরা তো মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করে গেছেন। নিঃসন্দেহে এ যুগে আমেরিকানদের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। মহাসত্যের আলো আমাদের সবার বিশেষ উপকারে আসবে। কেউ ইসলামকে গ্রহণ করুক বা না, সত্যের আলোকে ঢেকে রাখলে কিংবা অপরকে এ আলোর পথে চলতে বাঁধাদান নিঃসন্দেহে আরো ক্ষতিকর হবে।

আমি আমার দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত আছি। আমি এ ব্যপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, ইসলামকে আরো শেখার চেষ্টা থেকে পুরো সমাজ বেশি থেকে বেশি উপকৃত হবে- ক্ষতির লেশমাত্র আশঙ্কা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৎ আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করুন। আমীন।[৬৮]

[৬৮] https://www.islamreligion.com/articles/108/viewall/diane-charles-breslin-ex-catholic-usa/

মুহাম্মদ উমর রাও

প্রাক্তন ব্রাহ্মণ - ভারত

হিন্দু (ব্রাহ্মণ) থেকে ইসলামের ছায়ায়

তিনি মুসলমানদের খুব বেশি ঘৃণা করতেন। ইসলামকে বাতিল প্রমাণ করতে কুরআন অধ্যয়ন করেন। উদ্দেশ্য ছিলো কুরআন আসমানী কিতাব নয়- তা প্রমাণ করা। কিন্তু এ অনুসন্ধানই তার জন্য হয়ে ওঠে সত্যোপলব্ধির ওয়াসিলা। ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছেন অল্প বয়সেই। শুনুন তিনি কী বলেন।

আল্লাহর অনুগ্রহে আমি আল্লাহর ধর্ম অনুসরণ করছি। আমি এখন মুহাম্মদ উমর রাও- ভারতের অধিবাসী। আজ থেকে ৬ বছর পূর্বে ইসলামকে আলিঙ্গন করেছি। তখন আমার বয়স মাত্র ১৮ ছিলো। আমি চাচ্ছিলাম ইসলামে ভ্রমণের কাহিনী সবার সাথে শেয়ার করবো। এ থেকে হয়তো অমুসলিমরা উপকৃত হবেন। তারা হয়তো আমার মতো সত্যের অনুসন্ধান করে ইসলামকে আবিষ্কার করবেন। ইতোমধ্যে আমি আমার কাহিনী দু'জন বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! তারা উভয়ে কুরআন অধ্যয়ন শেষে ইসলামগ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

আমার অতীত

আমার জন্ম হয় মধ্যবিত্ত একটি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। আমার মা-বাবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন (বাবা- টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ও মাতা-শিক্ষিকা)। আমি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করি মামার কাছে। এভাবেই আমি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণে পরিণত হই। আমার পুরো পরিবারই সবসময় মুসলিমবিরোধী ছিলেন। এটি আমার মাঝেও গভীরভাবে প্রোথিত হয়।

কয়েক বছরের জন্য আমি আরএসএস-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমি সব সময় মুসলিমদেরকে খুব বেশি ঘৃণা করতাম। তাদের কোনো পাবলিক সমাবেশের নিকটে উচ্চ ভলিয়মে গান-বাজনা বাজাতাম যাতে তাদের অসুবিধা হয়! এমনকি তাদের আযান যাতে সবাই শুনতে পায়না সেজন্য স্পিকারের ভলিয়ম বাড়িয়ে দিতাম। আমি শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতাম, উপস্থিত হতাম হিন্দু মন্দিরসমূহে। উপাসনা করতাম বিভিন্ন দেব-দেবির। একজন কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ হিসেবে আমার কার্যকলাপ পরিবারের সবাই খুব পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন এ কাজগুলো অব্যাহত রাখতে।

ইসলামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

একদা গ্রীষ্মকালে আমার মাতা আমাকে একটি মুসলিম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করতে বলেন। আমি অস্বীকৃতি জানালাম, কারণ শিশু থাকাকাল থেকেই আমি মুসলিমদের ঘৃণা করে আসছিলাম। সুতরাং আমার মাতা এ কাজে যোগ দিতে জোরজবরদস্তি করেন নি। ফলে কয়েক গ্রীষ্মকালে আমি অ-মুসলিম প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। আমি আমার মা-বাবাকে এর দ্বারা সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম হই। পরে আমি এরূপ পার্ট-টাইম কাজ ছেড়ে দিই। আমি চাচ্ছিলাম ভালো স্থায়ী কাজ করবো। তাই শুরু করি পড়ালেখা। এদিকে, ২ মাসব্যাপী আমার মা ও বোন এক মুসলিম ভাইয়ের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তারা উভয়ে খুব বেশি উচ্চ প্রশংসা করেন প্রতিষ্ঠানের মুসলিম মালিকের ব্যাপারে।

আমি কিন্তু উক্ত লোকটিকে মুসলিম হওয়ায় সর্বদা ঘৃণা করতাম। আর আমার মা ও বোন তার প্রশংসা করবেন- এটা আমার নিকট অসহনীয় ছিলো। কিন্তু আমার পরিবার উক্ত মুসলিম লোকটির প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চাপ সৃষ্টি করলেন। সুতরাং, সবশেষে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও আমি মুসলিমের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেই কাজ করতে। তার প্রতিষ্ঠানে যেয়ে মুসলিম ব্যক্তিটির প্রতি আমার ঘৃণার মাত্রা আরো বেড়ে গেলো- কারণ সেখানে কর্মরত অনেকেই হিন্দু থেকে ইসলামে দীক্ষিত ছিলো। আমি তখন একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আমি মুসলিমকে শিক্ষা দিতে চাইলাম এটা প্রমাণ করে যে,

আমার ধর্ম তারটি থেকে উত্তম ও সত্য ছিলো। আমি এবার শুরু করি গভীর অধ্যয়ন।

তবে তার ধর্মকে বাতিল প্রমাণ করতে হলে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন অধ্যয়ন তো জরুরি। তাই আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী অনূদিত কুরআন ক্রয় করে অধ্যয়ন শুরু করলাম। এতেই সুবহানাল্লাহ! আমার জীবনটি বদলে গেলো চিরকালের জন্য। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। নিজের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহের দাঁনা বাঁধলে আমার অন্তরে। আমি বুঝতে সক্ষম হলাম যাকিছুই আমি বিশ্বাস ও পালন করছিলাম তা সবই ছিলো বাতিল! আমার ধর্মবিশ্বাস মূলত কল্পনা ও পৌরানিক কাহিনী বৈ কিছু নয়! সবই মিথ্যা মানবতৈরি কেচ্ছা-কাহিনী। আমার মনে হাজার প্রশ্ন এসে হানা দেয়। আমি কোথায় যাচ্ছিলাম? এখন কী করি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী? দায়িত্ব কী? এ মহাসত্যের খবর কেনো আমাদের সবার নিকট পৌঁছুলো না? সুতরাং বাকি যদিন ছাত্র ছিলাম, আমি এসব প্রশ্নের জবাব পেতে অনুসন্ধানে লিপ্ত হই।

আমি আমার পিতা-মাতা অন্যান্যদের প্রশ্ন করা শুরু করলাম: কে মহাশক্তিধর প্রভুকে দেখেছে তাঁর প্রতিকৃতি তৈরি করতে? সবাই জবাব দেয় কেউ দেখেনি। অবশেষে আমার ধর্মবিশ্বাসে পৌরানিক কাহিনীগুলো আমাকে এ ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তি দেয়। যেমন গণেশ, চমুনদেশওয়ার, রাম ও সিতার কাহিনী। এগুলো একটিও আমার কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় নি। আমি আর এগুলোকে প্রভু ভাববার কল্পনাও করি নি।

আমি একবার মা-বাবাকে প্রশ্ন করলাম: বেদে বলা আছে প্রতিমাপুঁজা করা বৈধ নয়। তাহলে কেনো আমরা প্রতিমাপুঁজায় লিপ্ত আছি? মা বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এটি করেছেন তাই আমরাও করি। পরের দিন আমি কুরআনের দুটি আয়াত পাঠ করলাম:

“আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে- কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ- দাদাদেরকে দেখেছি- যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।” (বাক্বারাহ (২): ১৭০)

... এবং

“আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়- যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।” (বাক্বারাহ (২): ১৩৪)

আমি এগুলো পাঠ করে একটি বিষয় অনুধাবন করে অবাক হলাম: আমি তো মায়ের কাছে প্রশ্ন করে এ উত্তরই পেলাম। এ আয়াতদ্বয় আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত করলো। আমি ধীরে ধীরে প্রতিমাপূজা বন্ধ করে দিলাম। আমি কোনো পূজায়ই অংশ নেই নি। আমি জানতে পেরেছি কুরআন অধ্যয়ন করে যে, শিরক (শরীক করা) হচ্ছে এমন পাপ যা মাফ হয় না। আমি ইসলামের শিক্ষার ওপর গোপনে আমল করা শুরু করি। এরপর দেখলাম সূরা বাক্বারার কিছু আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু লোক আছে ইসলামকে গ্রহণ করে নেয় যেখানে তারা উপকৃত হয়- এরা সত্যিকার অর্থে ইসলামে দীক্ষিত হয় নি। তারাই হচ্ছে মুনাফিক। এছাড়া এই আয়াতাংশটি:

“... আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” (মাইদাহ (৫): ৩)

আমি অনুধাবন করলাম যে, আমার অন্তরে যে প্রশ্নগুলো ছিলো তার প্রত্যেকটির জবাব এ কুরআনেই আছে।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে, যাকিছু অল্প জ্ঞান আমার ছিলো তা দিয়েই আল্লাহর বাণীকে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট পৌঁছাতে শুরু করি। এদিকে আমি বি.ই. ডিগ্রি দিচ্ছিলাম। এভাবে সত্যকে নিজের পরিবারের মধ্যে প্রচার করে ভবিষ্যতে উপকার পাওয়া যাবে ভাবলাম। কিন্তু ডিগ্রির শেষ বছরে আমাকে দেওয়ালে ঠেলে দেওয়া হলো। এরপর বাধ্য হয়ে পরিবারকে পরিত্যাগ করতে হলো। তবে আমার বোনটি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে আমার নিকট চলে আসলো। নিজেদের গৃহের বাইরে দুজনকে এক বছররেরও বেশি সময় থাকতে হয়েছে। এসময় আমাদের নিয়মিত কোনো আয় ছিলো না।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিলেন এবং ঈমানের ওপর সুদৃঢ় রাখলেন।

আল্লাহ তা'আলা যেমনটি কুরআন শরীফে বলেছেন:

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (আনকাবুত (২৯): ২)

কিছুদিন পর, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সুযোগ উন্মুক্ত করেছেন। আমি আগের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছি এ কারণে যে, ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারতাম না। অধিকাংশ কাজের সুবিধা আসে মেকানিক্যাল সেক্টর থেকে যেখানে আমাকে কাজের চাপে নামাযকে পরিত্যাগ করতে হতো। এ কাজ ছাড়ার এক বছরের অধিক সময় পর আমি আরেকটি কাজ পাই যেখানে নামায আদায় করতে কোনো অসুবিধা ছিলো না। আল্লাহর অনুগ্রহে ২০০০ রুপির বিনিময়ে কাজ শুরু করেছিলাম। এখন আমি আরো একটি ভালো কাজে যোগ দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা পূরণ করে দিয়েছেন। আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই। বাকি জীবন প্রভুর ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবো এটাই একমাত্র আশা।[৬৯]

[৬৯] https://www.islamreligion.com/articles/559/muhammed-umar-rao-ex-hindu-brahmin/

ইভোন রিডলি

প্রাক্তন খ্রিস্টান - যুক্তরাজ্য

বৃটিশ সাংবাদিকের ইসলামগ্রহণের কাহিনী

ইভোন রিডলি ছিলেন একজন বৃটিশ সাংবাদিক। তালিবানরা আফগানিস্তানের শাসক থাকতে তিনি গোপনে সেখানে প্রবেশ করেন বৃটিশ একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে। তবে তাঁর এ প্রবেশ ছিলো বে-আইনী। তালিবানরা তাকে আটক করে জেলে ভরে রাখে। জেলে থাকাকালে তিনি কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই তালিবানরা তাকে ছেড়ে দেয়। বের হয়ে তিনি তার বন্দীকর্তাদের উত্তম আচরণে মুগ্ধ হওয়ার কথা গণমাধ্যমে প্রচার করেন। পরবর্তীতে তার ইসলামগ্রহণের কাহিনী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানান ভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। অবশেষে 'মুসলিম নিউজ' পত্রিকায় তিনি ইসলামের দিকে ভ্রমণের কথা নিজেই বর্ণনা করেন। নিচে আমরা সে বর্ণনাটি তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, ইসলাম হচ্ছে এ যুগের সর্বাপেক্ষা বেশি ভুল-বুঝার ধর্ম। এজন্য দায়ী খ্রিস্টান গোঁড়া ও মৌলবাদী কর্তৃক শত শত বছরের মধ্যযুগীয় স্টাইলের প্রোপাগান্ডা।

সুতরাং মুসলমান হচ্ছি, এ সংবাদ হেতু মোটেই আশ্চর্য হই নি মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে এতো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া ও হৈচৈ দেখে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেছে, আমি নাকি ১০ দিন তালিবানদের জেলে থাকার ফলে 'স্টকহোম সিন্ড্রোমে'[৭০] ভূগছি! বিশেষকরে মনে রাখা দরকার যে, কাবুলের জেলখানায় ঐ ১০ দিনের শেষ ৪ দিন আমার কেটেছিলো ৬ জন বাইবেল-

---

[৭০] বন্দীকর্তা ও বন্দীর মধ্যে হৃদ্যতার জন্ম নেওয়াকে বলে Stockholm Syndrome।

প্রেমিক খ্রিস্টানদের সঙ্গে। সুতরাং স্টকহোম সিন্ড্রোম থিওরি এখানেই উড়ে যায়।

সত্য কথা হলো, আমার বন্দীকর্তারা হয়তো আল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আমাকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দিয়ে। আমাকে বিদায় দিয়ে তারা বেশ আনন্দিত হয়েছিল বলে মনে করি। কারণ আমি অধিকাংশ সময় তাদের সঙ্গে খারাপ ও অভিযোগপূর্ণ আচরণ করেছি। তাদের কেউ কেউ হয়তো এখনও আমার কঠোর আচরণে মানসিকভাবে আক্রান্ত আছে!

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার চিন্তা যখন আমার মনে জেগে ওঠে তখন আমার মধ্যে মৌলিক একটি সমস্যা দেখা দেয় ... আমি সে দিনটি শুরু করেছিলাম শূকরের মাংস ভক্ষণ করে ও শেষ করেছি এক গ্লাস উইস্কি পান করে! আমাকে একজন যিনি ‘গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম’ বললেন, এসব ব্যাপার অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে- আর অবশ্যই হয়েছে।

তবে আমার আধ্যাত্মিক ভ্রমণ, যা সকল দীক্ষিত বা প্রত্যাবর্তনকারীর মতো আমি ও আমার প্রভুর মধ্যে অত্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার ছিলো। দুর্ভাগ্যবশত এখন এটি একটি পাবলিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলে দিতে। এ ব্যাপারে মানুষ আর ভুল ধারণা ও ভুল তথ্য থেকে যাতে বিভ্রান্ত না হয়।

আমার ইসলামগ্রহণের কাহিনীটি অকালিকভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হয়ে যায়। ফলে অনেক মুসলমান ও অসুমলিমদের কাছ থেকে আমার নিকট ই-মেইল আসতে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তি আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কেউ কেউ তেমন ইতিবাচকি ছিলেন না কিন্তু।

এটা সত্য যে, আমার এ ভ্রমণের শুরু হয় আফগানিস্তানের জেলখানায়। সেখানে তালেবানরা তাদের দেশে বেআইনীভাবে প্রবেশ ও গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন করতে চেয়েছিল। আমি বুরকা পরে সেখানে প্রবেশ করায় তাদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি যায়।

দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার দেভাষীর নাম ছিলো হামিদ। আমাকে বললো, আজ একজন বিশেষ ব্যক্তি আসছেন। তাকে সম্মান

দেখাতে ভুলবেন না। আমার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বেড়ে গেলো যখন দেখলাম লম্বা সাদা জামা পরনে ও মাথায় সাদা পাগড়ীওয়ালা এক ব্যক্তি আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি অবশ্য বুঝতে পারি সহজেই- তিনি ছিলেন একজন মুসলিম আলিম। তিনি আমাকে কোন্ ধর্ম অনুসরণ করি জিজ্ঞেস করলেন। জবাব দিলাম প্রটেস্ট্যান্ট (খ্রিস্টান)। এরপর জিজ্ঞেস করলেন ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা কী ছিলো এবং আমি কী এ ধর্মে দীক্ষিত হতে রাজী আছি?

আমি ভয় পেয়ে যাই। কট্টর মৌলবাদীদের হাতে জেলে বন্দী হয়েছি আজ ৫দিন হলো। আমি সব সময় ধর্ম বিষয়টি উপেক্ষ করে গেছি। আমি ভাবলাম, সুবিধাজনক জবাব না দিলে হয়তো আমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে! কিছুক্ষণ ভেবে আমি জবাব দিলাম, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ইসলামে দীক্ষিত হতে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তবে এ মুহূর্তে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় এরূপ জীবন-পরিবর্তনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব কঠিন ব্যাপার। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে পৌঁছুয়ে আমি ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করবো।

কাবুলের জেলে আমার সঙ্গে আরো ৬ জন খ্রিস্টান ছিলো। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, তারা কিছু মুসলমানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। আমি নিজেও একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হিসেব বড়ো হয়েছি। আমি চার্চে যেয়ে উপাসনার গান গেয়েছি, রোববারের স্কুলে শিক্ষকতা করেছি- কিন্তু আমার সহবন্দীদের খ্রিস্টান বিশ্বাস অনেকটা কট্টর তালেবানী ইসলামী বিশ্বাসের মতোই ছিলো।

আমার মনে পড়ছে, এক রাতে আমি জেল কক্ষের বাইরে বারান্দায় বসা ছিলাম। আমার বাম কানে বেজে ওঠে খ্রিস্টানদের প্রার্থনার গানের সুর ও ডান কানে শুনতে পাই রাতের নামায আদায়ের ডাক- সুমধুর কণ্টের আযান ধ্বনি। ভাবলাম, আমি বুঝি দুই মৌলবাদী ধর্মবিশ্বাসের মাঝখানে পড়ে গেছি!

রাতটি ছিলো পরিষ্কার। আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখি অসংখ্য তারা মিটুমিটু করছে। চিন্তা করলাম, আমি একটি সমান্তরাল বিশ্বে আটকা পড়ে আছি। আমার পরিণতি না জানি কী হবে?

কয়েকদিন পর আফগান তালেবান এক-চোখা আধ্যাত্মিক নেতা মুল্লা উমরের সরাসরি নির্দেশে আমাকে 'মানবিক' গ্রাউন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়। আমার বন্দীকর্তারা আমার সঙ্গে উত্তম ও সম্মানসূচক আচরণ করেছিল যদিও আমি তাদেরকে গালিগালাজ করেছিলাম। সুতরাং ঐ মুসলিম আলিমকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মুতাবিক আমি তাদের ধর্ম নিয়ে সত্যিই গবেষণা শুরু করি। এটা ছিলো একাডেমিক অনুসন্ধান মাত্র। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে প্রতিটি ব্যাপার জেনে ও পাঠ করে আমি অভিভূত হয়ে যাই।

আমি কয়েকজন ইসলামিক গুণিজনকে যাদের একজন ছিলেন ড. জাকি বাদাওই, অনুরোধ জানাই আমাকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে। এমনকি শায়খ আবু হামযা মিসরীও আমাকে কয়েকটি বই উপহার দেন, যার সঙ্গে আমি আলাপ করি অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর।

এ সম্পর্ক হেতু অনেকে ভেবেছিলো যে, আমি পরবর্তীতে হয়তো আল-কায়েদা মাদরাসা খুলে দেবো! এর ফলে 'ওয়াচ অব টেরর' নামক একটি আমেরিকান ওয়েভসাইটে আমার স্থান হয়ে যায়। সুতরাং আমি হয়তো এখন আমেরিকার ওসব অপদার্থ গোয়েন্দাদের কাছে কট্টর একজন ভয়ঙ্কর মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছি!

আমি অবশ্য কিছুদিন পূর্বে ড. মুহাম্মদ আল-মাসারীর সঙ্গে এক উত্তম আলোকপ্রাপ্তিমূলক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। আমার জন্য একটি উপকারী রেফারেন্স পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় ইন্টারনেটের নিউ মুসলিম চ্যাট নামক একটি ওয়েভসাইট। এটি আমাকে উৎসাহ দান করেছে যারা আমার মতো ইসলামে দীক্ষিত হতে আগ্রহী ছিলেন।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওবস ভাই-বোনদের যারা এই প্রসেসে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এদের একজনও মুসলমান হয়ে যেতে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন নি। প্রত্যেক মুসলাম ও নও-মুসলিম আমাকে বলেছেন, আপনি সময় ক্ষেপণ করুন, বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিন।

এ বছরের শুরুতে আমার জন্য একটি বড়ো টার্নিং পয়েন্ট এলো, যখন ইসারইলীরা ম্যাঙ্গার স্কয়ারে ‘চার্চ অব নেটিভিটি’র ওপর আক্রমণ করে। অথচ এ চার্চটি ছিলো খ্রিস্টানদের সর্বাধিক পবিত্র একটি স্মৃতিসৌধ।

প্রক্যেক বছর হাজার হাজার খ্রিস্টান যিশু খ্রিস্টের জন্মের ওপর নাটক করে থাকে। এটা ছিলো খ্রিস্টবাদের একটি লালিত চিহ্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইসরাইলী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চার্চ অব নেটিভিটিতে[৭১] হামলার ন্যুনতম প্রতিবাদও করে নি চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজনও নেতা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যিনি নিজের পরিবারবর্গ নিয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় ছবি তুলতে ভালোবাসেন, প্রচার করেন খ্রিস্টান মূল্যবোধ- তিনিও নীবর ছিলেন। শুধুমাত্র রোমান ক্যাথোলিক পৌপ এই ঘটনার নিন্দা জানানোর সাহস দেখিয়েছেন। আমি অবাক ও ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছি এ ঘটনায়। এবং বুঝতে পেরেছি যে, চার্চ অব ইংল্যান্ডের ধর্মীয় গুরুদের সবাই ছিলেন মেরুদণ্ডহীন!

ইসলামে অন্তত আমার কোনো মাধ্যম বা ভায়ার প্রয়োজন নেই। চাইলে আমি আমার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারি।

একদিকে কোনো মুসলমান বা নও-মুসলিম আমাকে চাপ দিচ্ছিলেন না মুসলাম হয়ে যেতে- অপরদিকে বাস্তব চাপ আসছিলো অনেক অমুসলিমদের কর্তৃক ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন আমার সাংবাদিক বন্ধু-বান্ধব যারা মনে করেন তারা নৈরাশ্যবাদী, শক্ত-কামড়যুক্ত, শক্ত-নেশাগ্রস্থ পৃথিবীর পর্যবেক্ষক। ধর্ম- সে যে ধরনেরই হোক তাদেরকে অস্বস্তি দেয়- আর ইসলাম, ভালো কথা, এটাতো তাদের জন্য আরো জঘন্য!

আমি ইতোমধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত, মতামত প্রকাশক, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিকভাবে সচেতন মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে সমগ্র যুক্তরাজ্যব্যাপী সাক্ষাৎ করেছি। তথাকথিত নারীবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায় মুসলিম নারীদের মধ্যে

---

[৭১] ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে স্থাপিত একটি পুরাতন চার্চ। অধিকাংশ খ্রিস্টান মনে করেন, এখানেই জিসাস ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শক্ত ভ্রাতৃত্ববোধের সম্মুখে। এ দেশে তাদের শক্ত আত্মপরিচিতি ও কণ্ঠধ্বনি বিদ্যমান। তবে এটা সত্য, পৃথিবীব্যাপী অনেক মুসলিম মহিলা এখনও দমনপীড়নের শিকার। কিন্তু এটির মূল কারণ সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির কৃষ্টি ও কুরআনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি আক্ষেপ করি যখন তালেবানরা আমাকে আটক করে তখন যদি ইসলামে নারীর অধিকার যে কতো উচ্চে তা জানতাম (যদিও আমি এখনও একজন নবিস মাত্র), তাহলে তালেবানদের জিজ্ঞেস করতাম কেনো তারা নারীদেরকে নিজের দেশে এতো অবজ্ঞা করে?

কুরআন শরীফ এটা স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, সকল মুসলমান নারী ও পুরুষ মূল্যায়নে, আধ্যাত্মিকভাবে ও দায়িত্বে সমান অধিকার রাখে। নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা সদব্যবহার ও সমধিকার নিশ্চিত করেছেন। শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধায় তাদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। অন্তত, আমার বিশ্বাস তা-ই।

মুসলিম মহিলাদেরে জন্য আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে উচিৎ সম্পদ বণ্ঠন ও তালাক নিষ্পত্তির আইন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। হয়তো এ থেকেই সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার ডিভোর্স আইনজ্ঞরা প্রেরণা পেয়েছিলেন।

কুরআন কাল বা আজ লিখা হয়েছে বলে মনে হয়। যে কোনো গ্রীন পার্টির ইশতেহার এ থেকে বের করা যেতে পারে। এটা পারিপার্শ্বিকতার জন্য বন্ধুভাবাপন্ন এবং একুশ শতকের জন্য সত্যিকার প্রেরণা। অথচ প্রায় পনেরো বছর পূর্বে নাজিলকৃত এই মহাগ্রন্থের একটি অক্ষরও আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় নি। সুবহানাল্লাহ! অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে এর কোনো তুলনাই হতে পারো না। ওগুলো তো বার বার মানুষ রদবদল করে আসছে।[৭২]

(ইভোন রিডলি ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে ইসলামে দীক্ষিত হন।[৭৩])

[৭২] http://www.way-to-allah.com/en/journey/ridley.html; muslimnews.co.uk
[৭৩] http://www.bbc.co.uk/insideout/northeast/series4/yvonne_ridley_iraq.shtml

মুহাম্মদ আলী - ক্যাসিয়াস ক্লে

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকান বক্সিং ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান

হ্যাঁ, মুহাম্দ আলী। তাঁর নাম কে না শুনেছেন। বিশ্ববিখ্যাত এ বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ১৯৬৫ সালে ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি একদা বলেন: "আমার জীবনে অনেক সুন্দর ক্ষণ এসছে। কিন্তু একটি ছিলো সবার উর্ধ্বে। আমি যখন আরাফাতের দিন (হজ্জের সময়) রহমতের পাহাড়ে আরোহণ করলাম তখন যে মনের মধ্যে কী আশ্চর্য অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তার তুলনা নেই। অবিশ্বাস্য, ভাষায় প্রকাশ করার অতীত সে আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকতা আমাকে সত্যিই একেবারে আড়ষ্ঠ করে নেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ একসাথে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছিলেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ক্ষমা করে দিতে। এটা ছিলো এক আধ্যাত্মিক মহাউল্লাসপূর্ণ অভিজ্ঞতা। চোখের সামনে দেখছিলাম কতো রঙ্গের মানুষ! রাজা, প্রজা, রাষ্ট্রনায়ক, গরীব, ধনী সবাই পরে নিয়েছে দু টুকরো সাধারণ সাদা কাপড়। এক আল্লাহর ইবাদত করছেন কোনো আত্মগৌরব কিংবা নিঃস্বতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে। আমার নিকট এটাই ছিলো ইসলামের সাম্যতার একটি উৎকৃষ্ট বাস্তব উপমা।"

আমেরিকার সুপরিচিত এই বক্সারের ইসলামগ্রহণের কাহিনী ছিলো সে যুগের টক-অব-দ্যা-টাউন। তাঁর মতো আর কাউকে এতো বেশি মিডিয়া কাভারেজ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

মুহাম্মদ আলীর জন্ম হয় ১৯৪২ সালে কেনটাকির লুইসভিলে। তাঁর জন্মনাম ছিলো ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে। তার আফ্রিকান-আমেরিকান মা-অনুসরণ করতেন ব্যাপ্টিস চার্চ ও পিতা অনুসরণ করতেন মেথোডিস্ট চার্চ। খুব অল্প বয়সেই তিনি বক্সিং খেলা শুরু করেন। তার ইচ্ছে ছিলো মা-বাবাকে একটি গাড়ি উপহার দেওয়া। তার বয়স যখন মাত্র বিশ কিংবা এর একটু বেশি, তখনই অনেকে বলেছেন ক্যাসিয়াস ক্লে সর্বকালের সর্ববৃহৎ বক্সার। রোমে অনুষ্ঠিত ১৯৬০ সালের অলিম্পিক খেলায় তিনি আমেরিকার পক্ষে

বক্সিং চ্যাম্পিয়ান হোন। তখন তিনি হয়ে যান আমেরিকান মানুষের জন্য আপনজন। প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মাত্র ১৮ দিন পূর্বে ক্লে "কৃষ্ণ মুসলিম" (Black Muslims) নামক একটি দলে যোগ দেন। এ দলটিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ম্যালকম এক্স[৭৪]। ধর্মপরিবর্তন শেষে তার মধ্যে বাহ্যত পরিবর্তন আসে। নিজের সফলতা সম্পর্কে উচ্চবাচ্য কমিয়ে তার আধ্যাত্মিক উন্নয়নে ইসলামের গুরুত্ব নিয়েই বেশি কথা বলা শুরু করেন।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরই নিজের নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ আলী রাখেন। তিনি সব সময় বলতেন ইসলামগ্রহণ ও নাম পরিবর্তন ছিলো তার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে তার ইসলামগ্রহণের সময় 'নেশন অব ইসলাম'[৭৫] আমেরিকায় জনপ্রিয়তা হারায়। তখনকার বক্সিং কমিশন তার ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং সবার 'হিরো' আলীকে নিয়ে সবাই সন্দেহ করতে থাকে।

তবে, কিছুদিন পর নেশন অব ইসলামের নেতৃত্বে গণ্ডগোল বাঁধে। ইলাইযা মুহাম্মদ ও ম্যালকম এক্স একে অন্য থেকে দূরে সরে পড়েন। এ সময় আলী তার বন্ধু ম্যালকমের ওপর ভীষণ হতাশ হন এবং ইলাইযা মুহাম্মদকে সমর্থন করেন। তিনি মনে করতেন, ইলাইযা ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ১৯৬৭ সালে আলী সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক হিসেবে তার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ বৈধ ছিলো না। ফলে নিউ ইয়র্ক রাজ্য অ্যাথলেটিক কমিশন তার বক্সিং লাইসেন্স স্থগিত করে দেয়। সেসাথে তার চ্যাম্পিয়ানশীপ উপাধিও তুলে নেয়।

---

[৭৪] আমেরিকান মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও মানবাধিকার নেতা। জন্ম ১৯২৫, মৃত্যু (হত্যার শিকার) ১৯৬৫।

[৭৫] Nation of Islam - একটি আফ্রিকান-আমেরিকান রাজনীতিক ও ধর্মীয় মুভমেন্ট। ১৯৩০ সালে মুসলিম নেতা ওয়ালেস ফার্দ মুহাম্মদ মিশিগ্যান রাজ্যের শিকাগো শহরে এ মুভমেন্টের জন্ম দেন।

তবে পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ান হন কয়েক বার। অধিকাংশের মতে বয়স বেশি হওয়ার পরও তিনি বক্সিং রিংয়ে অংশগ্রহণ করায় কম্পনরোগে (পার্কিংসন ডিজিজ) আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে মুসলাম হিসেবে তার জীনব-যাপনের ওপর তিনি প্রায়ই গণমাধ্যমে কথা বলতেন। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভ্রমণে যান। সবাই তাকে স্বাগত জানায়। এদিকে সরকারী গোয়েন্দা তার পেছনে লেগে থাকে। কারণ তারা মনে করতো তিনি গোপনে নেশন অব ইসলামের সঙ্গে জড়িত আছেন। তবে এ সংস্থার বর্ণবাদী কর্মকাণ্ডকে তিনি কখনও মেনে নেন নি। তবে কালো আমেরিকানের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন।

মুহাম্মদ আলী ২০১৬ সালের ৩ জুন মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছেন। ইসলামিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি মোটা অঙ্কের অর্থদান করেছেন। এর মধ্যে শিকাগোর প্রথম মসজিদ- মসজিদে ফাতিরে অনেক টাকা দান করেন। ইতিহাসের এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মুহাম্মদ আলী। তিনি বলেন- আমি নিজেকে বড়ো মনে করি না, অপরকে বড়ো করে আল্লাহর সান্নিধ্য চাই। আল্লাহ তা’আলা এ বিখ্যাত নও-মুসলিমকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।[৭৬]

[৭৬] http://tellmeaboutislam.com/muhammad-ali.html

ডা. আলী সালমান বেনোইস্ট

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ফ্রান্স

এক চিকিৎসক বর্ণনা করেন, কোন্ কারণে খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামকে গ্রহণ করলেন

মেডিসিনের একজন ডাক্তার ও ফ্রান্সের একটি ক্যাথোলিক পরিবারের সন্তান আমি। আমার বৈজ্ঞানিক বেকগ্রাউন্ড ও পেশা আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে খুব একটা প্রস্তুতি বা চিন্তা-গবেষণার সুযোগ দেয় নি। এর অর্থ নয় যে, আমি গডে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু খ্রিস্টবাদ ও বিশেষকরে ক্যাথোলিক খ্রিস্টবাদের কিছু বিশ্বাস ও আমল আমাকে তাঁর (গডের) উপস্থিতি থেকে দূরে রাখে। সুতরাং আমার একত্ববাদের প্রতি হৃদয়ানুভূতি হেতু আমি খ্রিস্টানদের কেন্দ্রীয় দুটি বিশ্বাস তথা ত্রিত্ববাদ ও জিসাস ক্রাইস্টের প্রভূত্ব হওয়াকে মেনে নিতে পারি নি।

এদিক থেকে চিন্তা করলে তখনও ইসলাম সম্পর্কে কিছু না জেনেও আমি শাহাদাতের প্রথম অংশ তথা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই] এর ওপর বিশ্বাসী ছিলাম। যেমন নিচের আয়াতে বলা হয়েছে:

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি; এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।” (ইখলাস (১১২): ১-৪)

সুতরাং, প্রথমত অধিবিদ্যামূলক কারণে আমি ইসলামের অনুসারী ছিলাম। অন্যান্য কারণও আমাকে এর প্রতি আকর্ষিত করে। যেমন, ক্যাথোলিক পাদ্রীদের প্রতি আমার অনীহা যারা দাবি করে থাকে, গডের পক্ষ থেকে তাদের এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, চাইলে তারা কারোর পাপ ক্ষমা

করে দিতে পারে। এছাড়া, আমি কখনও ক্যাথোলিক কৃত্যানুষ্ঠান 'কমিউনিয়ান' (Communion) গ্রহণ করি নি। কারণ, এ অনুষ্ঠানটি সত্যিই একটি অন্ধকার যুগের অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়- যেখানে, হলি ব্রেড দ্বারা জিসাস ক্রাইস্টের দেহকে বুঝানো হয় এবং লাল মদকে মনে করা হয় ক্রাইস্টের রক্ত! অপর যে বিষয়টি আমাকে খ্রিস্টবাদ থেকে সরিয়ে নিয়েছে তাহলো, শারীরিক পবিত্রতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীবরতা। বিশেষ করে উপাসনার সময় এর গুরুত্বের ব্যাপারে কেউ কিছু বলে না। এখানে আমার কাছে মনে হয় গডের সম্মুখে চরম বে-আদবী হয়। তিনি আমাদেরকে একটি আত্মা দিয়েছেন ঠিকই, সে সাথে একটি দেহও তো দিয়েছেন। আত্মাকে পবিত্র করতে বেশ আগ্রহী হয়েছি ঠিকই কিন্তু দেহকে পবিত্র করার ব্যাপারে উদাসীনতার অধিকার আমাদের নেই।

তবে আমার জন্য ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মূল কারণ ছিলো কুরআন শরীফ। ইসলামগ্রহণের পূর্বেই আমি কুরআন অধ্যয়ন শুরু করি। তবে মনের গভীরে লুকানো ছিলো সচরাচর পশ্চিমা সমালোচনামূলক উদ্দেশ্য। কিন্তু কুরআনের ভাষা, সাহিত্য ও খাস করে মিস্টার মালিক বেননাবী রচিত একটি বই পাঠ করে আমি নিশ্চিত হই যে, কুরআন হচ্ছে সম্পূর্ণটাই ওহির্জ্ঞান। আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী কিতাব। দীর্ঘ ১৪ শত বছর পূর্বে অবতরণকৃত কুরআনের কিছু আয়াত আছে যার ভাব ও তথ্যাদি আজকের সর্বাধিক আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এটাই আমাকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত ও নিশ্চিত করে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সত্যধর্ম। ফলে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল) এর ঘোষণা দেই ধিদ্বাহীন চিত্তে।

এরপর ১৯৫৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী আমি নিজেকে উপস্থিত করি প্যারিসের মসজিদে। আমি ইমাম সাহেবকে সাক্ষী রেখে শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে যাই। প্যারিস মসজিদের মুফতি আমাকে একজন মুসলমান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নামকরণ করেন আলী সালমান।

আলহামদুলিল্লাহ! আমার নতুন ধর্মবিশ্বাস হেতু আমি খুবই আনন্দিত। সুতরাং আবারও উচ্চারণ করছি: আশহাদুআল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” - “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেনো ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দাহ ও বার্তাবাহক।”[৭৭]

[৭৭] https://www.islamreligion.com/articles/1176/dr-ali-selman-benoist-ex-catholic-france/

মারগ্যারেট মারকাস

প্রাক্তন ইয়াহুদি - আমেরিকা

ইহাহুদী থেকে ইসলামে ভ্রমণের এক অপূর্ব কাহিনী

আমেরিকান নও-মুসলিম মারগ্যারেট মারকাস। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি ইসলামে ভ্রমণের এক অপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা দেন। নিচে এর চুম্বকাংশ তুলে ধরছি।

প্রশ্ন: আপনি অনুগ্রেহ করে আমাদেরকে বলুন, কীভাবে ইসলামের প্রতি আপনার আগ্রহ জন্মে?

উত্তর: আমি ছিলাম মরাগ্যারেট পেগি মারকাস। ছোট্ট শিশু থাকতে সঙ্গীতের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিলো প্রবল। বিশেষ করে ক্লাসিক্যাল ওপেরা ও সিম্ফোনি ছিলো তখনকার পশ্চিমা দুনিয়ায় উচ্চ মার্গের সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত। স্কুলেও মিউজিক ছিলো আমার প্রিয় বিষয়। আমি সব সময় এ বিষয়ে উচ্চ মার্ক পেতাম। একদা রেডিওতে এ্যারাবিক মিউজিক শ্রবণ করি। আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগে। সুতরাং আরো কিছু শুনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। আমি মা-বাবাকে বার বার আবদার জানাতে থাকি কিছু এ্যারাবিক মিউজিক এনে দিতে। অবশেষে আমার পিতা আমাকে নিউ ইয়র্কের সিরিয়ান এলাকায় নিয়ে যান। আমি সেখান থেকে বেশ কিছু এ্যারাবিক মিউজিকের রেকর্ড ক্রয় করি।

আমার মাতা-পিতা ও পড়শীরা মনে করতেন, আরবি ভাষা ও এর মিউজিক ছিলো ভীষণভাবে অদ্ভুত ও তাদের কানে যন্ত্রণাদায়ক। সুতরাং যখনই রেকর্ড বাজাতাম, তারা দাবি জানাতেন যে, আমার কক্ষের দরোজা-জানালা বন্ধ করতে হবে।

আমি ১৯৬১ সালে যখন ইসলামে দীক্ষিত হলাম তখন নিউ ইয়র্কের মসজিদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে বিখ্যাত ক্বারী আবদুল বাসিতের কণ্ঠে

কুরআনের তিলাওয়াত শুনতাম বিমুগ্ধ হয়ে। কিন্তু জুমুআর নামাযে অবশ্য ইমাম সাহেব কোনো টেপ বাজাতেন না। এদিন আমাদের একজন বিশেষ অতিথি ছিলেন। বেঁটে, সাধারণ বস্ত্র পরিহিত এক কালো যুবক যে নিজেকে যানজিবর থেকে আগত ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেয়। তার কণ্ঠে শ্রবণ করলাম সূরা আর-রাহমানের তিলাওয়াত। আমি ইতোমধ্যে এত সুমধুর মনোমুগ্ধকর কুরআন তিলাওয়াত শুনি নি। এ যুবক কী বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কণ্ঠস্বর কেড়ে নিয়ে আসলো?

মাত্র ১০ বছর বয়সেই ইসলামের প্রতি আমার ভ্রমণের শুরু। আমি একদিন ইয়াহুদি রোববারের স্কুলে উপস্থিত হলাম। শিক্ষক ইয়াহুদি ও মুসলিম আরবদের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমার ইয়াহুদী পাঠ্যবই থেকে জানতে পারলাম যে, প্রফেট আব্রাহাম (আ.) ছিলেন আরব ও ইয়াহুদিদের পূর্বপুরুষ। আমি এখন শত শত বছর পর জানতে পারি যে, খ্রিস্টানদের নির্যাতন তাদের জীবনকে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছিল। তবে মুসলিম স্পেনে ইয়াহুদিদের স্বাগত জানানো হয়। আর এই মুসলিম আরবরাই হিব্রু কৃষ্টিকে তার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

ইয়াহুদি ‘জোয়োনিজম’ সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু আমি মনে করেছিলাম, ইয়াহুদিরা ফিলিস্তিনে ফিরে যাচ্ছিলো সেখানকার সেমিটিক পড়শীদের সঙ্গে ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক আবার জোরদার করতে! আমি ভাবলাম, মুসলিম আরব ও ইয়াহুদিরা এবার মধ্যপ্রাচ্যে আরেক স্বর্ণযুগের সূচনা করবে।

ইয়াহুদি ইতিহাসের প্রতি আমার ভীষণ আগ্রহ থাকাসত্ত্বেও রোববারের স্কুলে আমি খুব একটা খুশি ছিলাম না। এ সময় নিজেকে আমি ইউরোপীয় ইয়াহুদি হিসেবে মনে করতাম যারা হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি জার্মানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। একই সময় আমি আশ্চর্য হই যে, আমার ক্লাসমেট ও তাদের মাতা-পিতা কেউই নিজেদের ইয়াহুদি ধর্মকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলো না। সিনোগগে দেখতাম, প্রার্থনাকালে শিশু-কিশোররা নিজেদের প্রার্থনার বইয়ের ভেতর লুকানো কমিক বুক পড়ে হাসাহাসি করতো।

বাড়িতে, ধর্মীয় পরিবেশ ছিলো সর্বনিম্নে। আমার বড়ো বোন রোববারের স্কুল এতোই ঘৃণা করতো যে, মা তাকে ভোরবেলা বেড থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতেন স্কুলে। সে সর্বদা কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসিয়ে দিতো। অবশেষে আমার মাতাপিতা তাকে উপেক্ষা করেন। ইয়াহুদিদের হাই হলি দিবসে সিনোগগে না যেয়ে ও ইয়োম কাপুরের উপবাস না করে আমাদেরে নিয়ে যেতেন পারিবারিক পিকনিক পার্টিতে কিংবা উত্তম রেস্টুরেন্টে ভোজন করতে। আমরা যখন মা-বাবাকে বুঝতে সক্ষম হই যে, সানডে স্কুলে যাওয়া আমাদের জন্য সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়, তখন তারা 'এ্যাথিক্যাল কালচার মুভমেন্ট' নামক এক মানবতাবাদী সঙ্ঘে যোগ দিলেন।

আমি এই এ্যাথিক্যাল কালচার সঙ্ঘের স্কুলে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দেই। আমার বয়স ১৫ বছরের সময় পর্যন্ত যেতে থাকি। এখানে থাকাকালেই আমার মধ্যে ট্র্যাডিশনাল, দলবদ্ধ সকল ধর্মবিশ্বাস হয়ে ওঠে গুরুত্বহীন।

আঠারো বছর বয়সে আমি না বুঝে স্থানীয় এক জায়োনিস্ট ইয়ুথ সঙ্গের সদস্য হই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি জায়োনিজম অর্থ কী ছিলো। এরা চাচ্ছিলো ইয়াহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে ঘৃণার মাত্রা চরমে নিয়ে যেতে, যাতে উভয় দলের মধ্যে কখনও বিরোধ মিটমাট না হয়। আমি ঘৃণাভরে এ মারাত্মক সঙ্ঘ থেকে ইস্তিফা দেই।

আমি যখন বিশ বছর বয়সে নিউ ইয়র্ক ভার্সিটির ছাত্রী তখন আমার একটি নির্বাচিত বিষয় ছিলো ইসলামে ইয়াহুদিবাদ। আমার শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর রাবাই এ্যাব্রাহাম আইজাক কাটশ। তিনি ছিলেন হিব্রু স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তিনি খুব চেষ্টা করেন এটা বুঝাতে যে, ইসলাম ইয়াহুদিবাদ থেকেই এসেছে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত নিয়ে গবেষণা করে ছাত্রদেরকে তার থিওরি বুঝাতে চেষ্টা করেন। বলতেন, এসব আয়াত ইয়াহুদিদের থেকে ধার করা। তার আসল উদ্দেশ্য ছিলো এটাই বুঝানো যে, ইয়াহুদিবাদ ছিলো ইসলাম থেকে সুপেরিয়ার। কিন্তু আমি তার এ থিওরির বিপরীতটাই অনুধাবন করি।

আমি শীঘ্রই আবিষ্কার করি যে, জায়োনিজম (ইয়াহুদীবাদ) মূলত বর্ণবাদ ও জুদাইজমের গোষ্ঠিতন্ত্র একটি সমন্বিত রূপ। আধুনিক জাতিভিত্তিক জায়োনিজম আমার দৃষ্টিতে আরো খারাপ মনে হয়েছে যখন আমি জানতে পারি, অত্যল্প যদি কেউ থেকেই থাকে- জায়োনিস্ট নেতারা নিজেদের ধর্মকর্মে অভ্যস্থ ছিলো। এরপর আমি যখন জানলাম, আমেরিকার সকল গুরুত্বপূর্ণ ইয়াহুদি নেতারা জায়োনিজমের সমর্থক, যাদের মধ্যে একটুও প্রতিক্রিয়া ছিলো না ফিলিস্তিনের আরবদের ওপর ভীষণ নির্যাতন হচ্ছে জেনে ও বুঝে। আমি অন্তরে নিজিকে আর একজন ইয়াহুদি ভাবতেও পারি নি।

জেনিথার সাথে সাক্ষাৎ

প্রফেসর কাটশের ক্লাসে আমার সাক্ষাৎ ঘটে জেনিথা নামক এক বিশেষ মেয়ের সঙ্গে। পুরো ক্লাসে আমরা দুজনই ছিলাম মেয়ে- বাকি সব যুবকদের মাথায় ছিলো কলো টুপি- তাদের উদ্দেশ্য ইয়াহুদি রাবাই (আলিম) হওয়া। আমি জেনিথাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তার মা-বাবা ১৯১৭ সালে রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। যাক সে ক্রমান্বয়ে আমার বান্ধবী হয়। তার পুরো নাম ছিলো জেনিথা লেইন। তবে কিছুদিন ক্লাস করার পর কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। আর কোনোদিন সে ক্লাসে ফিরে আসে নি।

কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ায়ার পর একদিন সে আমাকে ফোন করে। আমি তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বার বার অনুরোধ জানালো নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজামে যেয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে আরবি ক্যালিগ্রাফির ওপর এক বিশেষ প্রদর্শনী চলছিলো। এছাড়া প্রাচীন কুরআনের আলোকিত একটি পাণ্ডুলিপিও ছিলো। আমি তার দাওয়াতে চলে যাই মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামে প্রদর্শনী উপভোগকালে সে আমাকে বললো ইয়াহুদি ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছে। তার দুজন ফিলিস্তিনী বন্ধু শাহাদাতের বাণী উচ্চারণকালে সাক্ষী ছিলো।

আমি কিছুটা অবাক হই। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোন কারণে ইসলামকে গ্রহণ করে নিলে?" সে বললো, কিডনি ইনফেকশন হেতু প্রফেসর কাটশের ক্লাস পরিত্যাগ করে। তার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মারাত্মক অবস্থা ধারণ করায় মা-বাবাসহ সবাই মনে করলো সে আর বাঁচবে না। জেনিথা আরো বলে, "এক দুপুরে আমার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর ওঠলো। আমার বেডের পাশে টেবিলের ওপর ছিলো এক জিলদ হলি কুরআন। যেহেতু আরবি জানতাম তাই আমি এটি হাতে তুলে নিয়ে কিছু আয়াত পাঠ শুরু করি। এতে আমার অন্তরে গভীরভাবে আন্দোলন শুরু হয়। এতোই শক্তভাবে গভীর ছিলো এসব আয়াতের প্রভাব- আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি কেনো যেনো অনুভব ও সাহস পেলাম যে, আমি বেঁচে থাকবো। কিছু শক্তি ফিরে পাওয়ার পরই আমার দুজন বান্ধবীকে খবর পাঠালাম, আমি ইসলামে দীক্ষিত হবো। ধন্য হবো শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করে।"

জেনিথা সত্যিই সুস্থ হয়ে ওঠলো। আমি তার কাহিনী শুনে অবাক হলাম। অবশ্য তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরো ঘন হলো। আমরা একসাথে বাইরে যাই। সিরিয়ান রেস্টুরেন্টে যেয়ে খাবরও খেয়েছি।

এরপর প্রফেসর কাটশের ক্লাসে লেকচার শুনেছি বটে কিন্তু অবসর সময়ে আমি পুরাতন বাইবেল, তালমুদ ও কুরআন-হাদীস নিয়ে গবেষণা করতে থাকি। আমি আবিষ্কার করলাম ইয়াহুদিবাদ ছিলো একটি মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ধর্ম। আমি নিজেকে আর এ ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে মোটেই চাই নি। একমাত্র ইসলামই ছিলো আমার নিকট সত্যধর্ম। তাই অচিরেই ইসলামে দীক্ষিত হলাম।

প্রশ্ন: ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে আপনার পরিবার কী কখনও বাঁধাদান করেছিল?

উত্তর: আমি অনেক দিন পূর্বে (১৯৫৪ সালে) ইসলামে দীক্ষিত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার পরিবার-পরিজন নানান পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। আমাকে সতর্ক করা হয়, ইসলাম আমার জীবনকে আরো জটিল করে তুলবে। এটা ইয়াহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদের মতো ছিলো না যেগুলো হলো আমেরিকান কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আমাকে আরো বলা

হলো, ইসলাম আমাকে নিজের পরিবার ও কমিউনিটি থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। ঐ সময় আমার বিশ্বাস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো না এসব চাপকে সহ্য করতে। তবে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হেতু আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। দীর্ঘ ২ বছর আমি বাড়ির বাইরে যাই নি। এসময় প্রাইভেট চিকিৎসা নিতে থাকি। কিন্তু অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আমার পিতা-মাতা প্রাইভেট ও পাবলিক হাসপাতালে প্রেরণ করে আমার চিকিৎসা অব্যাহত রাখেন। একদিন আমি হাসপাতালের বেডে নীরবে প্রভুর দিকে মনোযোগ দিই। আমার ভয় হচ্ছিলো অচিরেই পৃথিবী ছেড়ে যাবো। খুব কায়মনোবাক্যে বললাম, "হে প্রভু! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি- যদি ভালো করে দাও তাহলে আমি ইসলামকে গ্রহণ করে নেবো।"

আলহামদুলিল্লাহ! আমার আশা আল্লাহ তা'আলা পূরণ করেছেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি ও ইসলামকে কবুল করেছি। ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কের মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাতে আমি তৎপর হয়ে ওঠি। আমার সৌভাগ্য থাকায় অনেক উত্তম মুসলিম ভাই ও বোনদের সঙ্গে আমার সক্ষাৎ ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্ন মুসলিম ম্যাগাজিনে সময় সময় প্রবন্ধ-নিবন্ধও লিখেছি।

প্রশ্ন: মুসলমান হওয়ার পর আপনার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবরা আপনার প্রতি কীরূপ আচরণ করেন?

উত্তর: আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও তাদের বন্ধু-বান্ধব মনে করলেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কারণ আমি এ বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে কথাই বলছিলাম না। তাদের ধারণা, ধর্ম হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত শখের মতো। কিন্তু যখনই আমি পবিত্র কুরআন পাঠ করলাম তখন বুঝলাম, ইসলাম নিছক কোনো হবি (শখ) ছিলো না- বরং এটাই ছিলো স্বয়ং জীবন!

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআন আপনার জীবনে কিরূপ প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর: একটি ঘটনা বলি। এক রাতে আমি খুব ক্লান্ত ও নিদ্রাহীন অবস্থায় ছিলাম। খুব একটা ভালো লাগছিলো না। আমার মাতা কক্ষে ঢুকে বললেন, আমি লার্চমন্ড পাবলিক লাইব্রেতি যাচ্ছি। তোমার জন্য কোনো বিশেষ বই

আনবো? আমি বললাম, দেখে নিবেন পবিত্র কুরআনের ইংরেজি কোনো অনুবাদগ্রন্থ আছে কী না? মা এক কপি পবিত্র কুরআন নিয়ে ফিরে আসলেন। আমি এতোই আনন্দিত হলাম যে, তার হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে আনলাম এ মহাগ্রন্থটি। এ রাতে আর ঘুমাই নি- সারারাত পাঠ করেছি পবিত্র কুরআন শরীফ।

আমি আট বছর কাটাই প্রাইমারী স্কুলে, চার বছর সেকেন্ডারীতে এবং এক বছর কলেজে। আমি এসময় শিখেছি ইংরেজি ব্যাকরণ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, লাতিন ও গ্রিক ভাষা। শিখেছি পাঠীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি। অধ্যয়ন করেছি ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ইতিহাস, পড়েছি মৌলিক বিজ্ঞান ও বোয়োলজির ওপর। মিউজিক ও কলাবিদ্যা নিয়েও পড়ালেখা করলাম- কিন্তু, আমি আমার প্রভু সম্পর্কে কোনো কিছুই জানলাম না। চিন্তা করতে পারেন, আমার এক পাকিস্তানী আইনজীবী কলম-বন্ধুর নিকট স্বীকারোক্তি করে পত্র লিখেছিলাম, কোন্ কারণে আমি একজন নাস্তিক হই! আমি লিখেছি, দেখো ভাই, এমন এক গডে বিশ্বাস করতে আমি কল্পনা করতে পারি না যিনি ছিলেন গাঢ় লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ, বসে আছেন তাঁর সিংহসানে স্বর্গলোকে! তিনি আমাকে জাবাবে লিখলেন, এরূপ অদ্ভুত কথা আমি কোত্থেকে শিখলাম? প্রতিউত্তরে জানালাম, রোমের সিসিটিন চ্যাপেলের ছাদে মাইকেলাঞ্জেলো কর্তৃক ‘সৃষ্টি’ ও ‘আদি পাপ’ অঙ্কনটি দেখো নি?

কিন্তু পবিত্র কুরআনে আমি পাঠ করলাম:

“আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।” (বাক্বারাহ (২): ২৫৫)

আরো পাঠ করলাম:

"যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।" (নূর (২৪): ৩৯-৪০)

প্রথমে কুরআন পাঠকালো আমার মাঝে যে ধারণা জন্মে তাছিলো- এটাই হচ্ছে একমাত্র সত্য ধর্ম, সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক, অকৃত্রিম, মীমাংসাহীন বা মুনফিকী থেকে মুক্ত।

১৯৫৯ সালে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে যেয়ে ইসলামী গ্রন্থাদি পাঠ করতাম। সেখানে চোখে পড়ে মিশকাতুল মাসাবীহ হাদিসগ্রন্থের চারখণ্ডে সমাপ্ত ইংরেজি অনুবাদ। আমি সেখান থেকে জানতে পারি যে, সংশ্লিষ্ট হাদিস ছাড়া কুরআনের আয়াতসমূহ ভালোভাবে জানা সম্ভব নয়। কারণ, যে নবীর নিকট আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি ছাড়া আর কে এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

মিশকাত শরীফ অধ্যয়ন করে আমি নিশ্চিত হই যে হলি কুরআন ছিলো সম্পূর্ণটাই আসমানী কিতাব। আমি এটাও নিশ্চিত হই যে, কুরআন সম্পূর্ণটাই আল্লাহর কথা- এখানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে একটি কথাও যুক্ত হয় নি। আমার নিকট এখন জীবন-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন হয়ে গেছে!

শিশু থাকতে মৃত্যুকে খুব বেশি ভয় করতাম। আমি সময় সময় রাতের গভীরে মা-বাবাকে জাগিয়ে তুলতাম। প্রশ্ন করতাম, কেনো আমাকে মরতে হবে? মরণের পর আমার কী হবে? তারা বলতেন এটাই স্বাভাবিক। সবাইকে তা মেনে নিতে হয়। আমার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুর পর জীবনকে

অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিতেন। বলতেন, বিচারদিবস, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি ছিলো অতীতের কল্পকাহিনী। এতে আমি ভীষণভাবে হতাশ হতাম। মৌলবাদী ইয়াহুদিবাদের পরকাল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অনেকটা অস্পষ্ট। আর বাইবেলে ব্যাপারটি আরো যুক্তিহীন ও অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু কুরআনে সবকিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমি সব সময়ই অনন্তকাল স্থায়ী বেঁচে থাকার কোনো পথ আছে কি না সে বিষয়ে হন্যে হয়ে খুঁজে দেখেছি। একমাত্র পবিত্র কুরআনই আমাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করেছে।

প্রশ্ন: মুসলিম হওয়ার পর আরবদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী বলুল?

উত্তর: বছর পার হচ্ছিলো। আমি বুঝতে সক্ষম হলাম- আরবরা ইসলামকে আবিষ্কার করে নি- বরং ইসলামই আরবদের বিখ্যাত ও জ্ঞানবান বানিয়েছে। যদি না সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটতো, আরবারা আজ একটি অজানা-অখ্যাত জাতিতে পরিণত হতো। আর যদি না কুরআন আরবি ভাষায় অবর্তীর্ণ হতো, আরবি ভাষাও আজ গুরুত্বহীন বা এমনকি বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

প্রশ্ন: ইয়াহুদিবাদ ও ইসলামের মধ্যে আপনি কী কোনো ধরনের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন?

উত্তর: বাস্তবে ইসলাম ও ইয়াহুদিবাদের মধ্যে সম্পর্ক ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ থেকেও শক্ত। উভয় ধর্মে একত্ববাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ (যদিও ইয়াহুদিরা একজন নবী উজাইরকে (আ.) প্রভুর আসনে বসিয়ে ফেলেছে।)। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু সামঞ্জস্য বিদ্যমান, যেমন: আসমানী কিতাবের নির্দেশনাবলী মানার ক্ষেত্রে গুরুত্ব, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁকে ভালোবাসা, পাদ্রীবাদকে অগ্রাহ্য করা, বিয়ের অনুমতি, আরবি ও হিব্রু ভাষায় সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি।

তবে পার্থক্য হলো: ইয়াহুদিবাদ রাজনীতি দ্বারা এতোই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোনটি কী তা বুঝা কঠিন। জুদাহ নামক একটি গোষ্ঠি থেকে জুদাইজম শব্দটি এসেছে। একজন জ্যু (ইয়াহুদি) হচ্ছে ঐ গোষ্ঠির এক সদস্য। এই

ধর্মের নামকরণই নিশ্চিত কেরেছে এটি কোনো সর্বজনিন ধর্ম নয়। একজন জ্যু কখনও শুধুমাত্র প্রভুর একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে জ্যু হতে পারবে না- তাকে জন্ম নিতে হবে জুইশ পরিবারে! এমনকি জন্ম নেওয়া ইয়াহুদি যদি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় সে নাস্তিক- তথাপি তার ইয়াহুদি ভাইদের নিকট সে ইয়াহুদিই থাকবে। ইয়াহুদির ঔরসে জন্ম নিলে ইয়াহুদি ছাড়া আর কিছুই হওয়া যায় না!

ধর্মকে রাজনীতিকরণ করতে করতে তারা এ পর্যায়ে পৌঁছুয়েছে যে, ইয়াহুদির নিকট গড হচ্ছেন - ইসরাইলের গড। তিনি অন্য কারোর গড নন। ইয়াহুদি আসমানী কিতাব আর কারোর জন্য নাজিল হয় নি- শুধুমাত্র ইয়াহুদিরে জন্য। দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাসসালাম পূর্ণাঙ্গ নবী ছিলেন না- তারা ছিলেন ইয়াহুদি বাদশাহ। একমাত্র ইয়োম কিপুর (ইয়াহুদি প্রায়শ্চিত্ত দিবস) ছাড়া ইয়াহুদিদের হানুক্কাহ, পুরিম ও পিসাক ইত্যাদি উৎসব ধর্মীয় থেকে অতিবেশি রাজনীতিক গুরুত্ব বহন করে। এসব কারণে ইয়াহুদিবাদ কখনও ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে নি। ইয়াহুদিবাদ একটি গোষ্ঠির ধর্ম। ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানবতার ধর্ম।

প্রশ্ন: আপনি কী কখনও কোনো ইয়াহুদির সঙ্গে ইসলাম নিয়ে কথা বলেছেন?

উত্তর: একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। নিউ ইয়র্কের ইসলামী সেন্টারের ড. শরেবিয়াহ একদিন এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে আমাকে পরিচিত করে দেন। আমি তার সাক্ষাৎ পাই ইসলামী সেন্টারের অফিসকক্ষে। লোকটি যে অর্থোডক্স ইয়াহুদি ছিলো তা তার পরনের বস্ত্র, মাথার হেট, মুখের দাড়ি ইত্যাদি দেখে সহজেই বুঝা যাচ্ছিলো। তার বগলে ছিলো ইডিশ সংবাদপত্র দ্যা ডেইলি ফরওয়ার্ড। সে বললো, তার নাম সামুয়েল কস্টেউইটজ। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এ মসজিদে কী করছেন? সে বললো, আর বলে লাভ নেই। কোথাও শান্তি না পেয়ে এখানে এসেছি। পাঁচ বছর পূর্বে তার মাতার মৃত্যুর পর থেকে সে অসহায় অনুভব করছে ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। সে বললো আজকের সব ইয়াহুদি নির্লজ্জ মুনাফিকে পরিণত

হয়েছে। এমনকি ইসরাইলে নাকি শূকরের ফার্ম আছে। সে সিনোগগে যেয়ে শান্তি পায় নি। তাই মসজিদে এসেছে কিছুটা শান্তি পাওয়ার আশায়!

আমি তার সাথে আলাপকালে ইয়াহুদিদের কিছু মিথ্যা অভিযোগ ও বিশ্বাস নিয়ে কথা বললাম। এটা কে বা কারা বাইবেলে লিখেছে যে, নূহ আলাইহিসসালাম মদের নেশাযুক্ত ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ), দাউদ আলাইহিসসালাম ব্যভিচারী (নাউযুবিল্লাহ) ছিলেন, সুলাইমান আলাইহিসসালাম মূর্তিপূজক ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ, পবিত্র কুরআন এদের সকলকে উচ্চ মর্যাদাশীল আল্লাহর নবী-রাসূল বলে সম্মানিত করেছে। তাঁদের চরিত্র ছিলো ওসব অভিযোগ থেকে অনেক উর্ধ্বে।

আমি আরেকটি বিষয়ও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কেনো তারা (ইয়াহুদি-খ্রিস্টানগণ) ইসহাক আলাইহিসসালামকে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কুরবানী করেছিলেন বলে? অথচ বাইবেলই বলছে, যাকে কুরবানী দিতে চাইছিলেন তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিমের প্রথম পুত্র। আর ইসমাইল যে ইসহাকের তুলনায় ১৩ বছরের বড়ো ছিলেন তাতো সকলেরই জানা। বাইবেলের কিছু গবেষক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিবি হাজেরার গর্ভে জন্ম-নেওয়া ইসমাইল নাকি অবৈধ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। নবীর আবার অবৈধ সন্তান হয় কী করে? অথচ কুরআন বলছে উভয় স্ত্রী হাজেরা এবং সারাহ ছিলেন ইব্রাহিমের (আ.) আইনসঙ্গত সম্মানিতা স্ত্রী।

মিস্টার কস্টেলউইটজ আমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান এসব সত্য কথা তার কাছে বলার জন্য। ড. শরেহবাহ তাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দাওয়াত দেন। সে বললো, ইসলাম সত্যধর্ম সে জানে। কিন্তু ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে না এই ভয়ে যে, পরিবার-পরিজন থেকে সে চিরতরে বহিষ্কৃত হয়ে কঠোর নির্যাতনের শিকার হবে। সে যখন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন এ ভদ্র ও দয়ালু লোকটির প্রতি আমার মনে দরদ হচ্ছিলো।

প্রশ্ন: আপনার জীবনে ইসলাম কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে করেন?

উত্তর: আমাকে ইসলাম চূড়ান্ত মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছে। ইসলামে আমি পেয়েছি যাকিছু সত্য, ভালো ও সুন্দর ছিলো। ইসলাম আমাকে মানব জীবন ও মরনের অর্থ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যা অন্যান্য ধর্মে সত্যকে করা হয়েছে বিকৃত, বক্র, সীমিত ও অসম্পূর্ণ। কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি কীভাবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম? আমার জবাব হবে, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই সত্যোপলব্ধি দান করেছে। ইসলামী বিশ্বাসে আমার অনুগামীতা হচ্ছে এক শান্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ কিন্তু খুব বেশি প্রত্যয়যুক্ত ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করি হৃদয়ে প্রকৃতিগতভাবে সর্বদাই একজন মুসলমান ছিলাম। ইসলাম নামে কিছু আছে তা জানার পূর্বেও আমি মুসলমানই ছিলাম। আমার দীক্ষিত হওয়াটা ছিলো মূলত আনুষ্ঠানিকতা। এরই মাধ্যমে হৃদয়ে কোনো আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। বাস্তবে সত্যিই আমি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছি- কারণ জন্মগতভাবে সবই তো এক প্রভু বিশ্বাসী। ইসলামকে পাওয়ার জন্য অতীত জীবনের বহু বছর কেটেছে অনুসন্ধানে। এ প্রাপ্তিই আমাকে আজ সন্তুষ্ট করেছে। আলহামদুলিল্লাহ![৭৮]

[৭৮] https://www.islamreligion.com/articles/118/viewall/margaret-marcus-ex-jew-usa/; The Islamic Bulletin, San Francisco, CA 94141-0186

পণ্ডিত সুশিল কুমার শারমা আবদুর রহমান

প্রাক্তন হিন্দু - ভারত

এক হিন্দু পুরোহিতের ইসলামগ্রহণের কাহিনী

ইশার নামায শেষে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন ৪২ বছর বয়স্ক আবদুর রহমান (অতীতে পণ্ডিত সুশিল কুমার শারমা)। খাতা-কলম নিয়ে বসে গেলেন। নিজের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করছেন এই ভারতীয় নাগরিক। তার হিন্দি ভাষায় রচিত গ্রন্থের নাম হবে ‘পণ্ডিত বনে মুসলমান’ (পণ্ডিত মুসলমান হলো)। তবে তিনি ভারতে বসবাস করছিলেন না।

তিনি কাজ করছিলেন মক্কা মুকাররমার মসজিদুল হারামের বিপরীতে সৌদী বিন লাদেন কন্সট্রাকশন কোম্পানির একজন গুদামরক্ষক হিসেবে। প্রথমে জিদ্দায় আসেন ২০০২ সালে। তখন তিনি সুশিল কুমার শারমা নামে পচিরিত ছিলেন। তার দেশের বাড়ি ভারতের হারিয়ানা রাজ্যের একটি ছোট্ট নিভৃত পল্লী আমাদালপুরে। তার জন্ম হয় একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। সুশিলের পরিবার গ্রামের হিন্দু মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন। সুতরাং সুশিল মন্দিরের পুরোহিত হন পরিণত বয়সে।

জিদ্দায় থাকাকালে এক মুসলিম সহকর্মী তাকে হিন্দি ভাষায় রচিত কিছু ইসলামী বই-পুস্তক উপহার দেন। কিছুদিন পরে শারমাকে কোম্পানী ট্রান্সফার করে নিয়ে যায় রাজধানী রিয়াদে। সেখানকার প্রিন্সেস নূরা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কন্সট্রাকশন কাজে যোগ দেন।

শারমা বলেন, “রিয়াদে আসার পর আমার সাক্ষাৎ হয় কিছু ভারতীয় ও পাকিস্তানী মুসলিমদের সঙ্গে। তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অনেককিছু বুঝিয়ে বলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো সালিম। সে রাজেস্তান থেকে এসেছে। উভয়ে একই কক্ষে থাকতাম। অবসর সময় সালিম নবী-রাসূলদের গল্প বলতো। সময় সময় হাদিসও পাঠ করে শুনাতো।

তার এসব গল্প ও হাদিসের কথাগুলো শুনে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। ভাবলাম, মৃত্যুর পর আমার কী হবে? আমার পাপের কারণে কী জাহান্নামের আগুনে আমি নিক্ষিপ্ত হবো? কবরে কঠিন আজাব হবে পাপী ও অবিশ্বাসীদের- একথা শুনে আমার মনে ভীষণ ভয় জেগে ওঠলো।

পরে আমার অবস্থা এমন হলো যে রাতে ঘুমোতে পারছিলাম না। আমি জানতাম, ইসলাম হচ্ছে সত্যধর্ম। সুতরাং ইসলামে দীক্ষিত হওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার জন্য খোলা নেই। ভাবলাম, ইসলামগ্রহণ করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবো। অবশেষে জীবনভর সত্যানুসন্ধানের ইতি ঘটবে।

পরের দিন ভোরে ওঠে আমি সালিমকে বললাম, ভাই সালিম! আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই। ক্যাম্পে বসবাসরত অন্যান্যদেরও আমার ইচ্ছের কথা জানালাম। ক্যাম্পে বসবাসকারী অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সবাই আমার মুসলমান হওয়ার সংবাদে যেনো ভীষণ খুশি। জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানাতে থাকেন আমাকে। আলহামদুলিল্লাহ!

আমি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি জাতি-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ দেখে। আল্লাহর নিকট সব মানুষ সমান। সুতরাং কোনো ধর্মবিশ্বাসে মানুষে মানুষে বৈষম্য-পার্থক্য থাকবে তা হতে পারে না। যেমনটি আমি দেখেছি নিজের আগের ধর্মবিশ্বাসে। অর্থাৎ হিন্দুধর্মে।”

পরের দিন রিয়াদের আল-বাত্তা এলাকায় স্থাপিত কো-অপারেটিভ অফিস ফর কল এন্ড গাইড্যান্স এর অফিসারদের সঙ্গে একটি সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পের ইমাম উপস্থিত ছিলেন। শারমাকে তিনি বললেন, আপনি এবার শাহাদাতের বাক্যটি উচ্চারণ করুন।

আবদুর রহমান বলেন, “আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এ পবিত্র বাক্যটি অন্তর থেকে উচ্চারণ করি। গ্রহণ করেছি এক আল্লাহকে আমার প্রভু হিসেবে ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী হিসেবে। এরপর ইমাম বললেন, তোমার নাম আবদুর রহমান রাখলে কেমন হয়? আমি এতে রাজি হলাম।”

এর কিছুদিন পরই নও-মুসলিম আবদুর রহমান ট্রান্সফার হয়ে মক্কা-জিদ্দা মহাসড়কের নিকটস্থ ছোট্ট শহর বাহরায় চলে আসেন। আবদুর রহমান বলেন, "এখানকার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার খুব আনন্দিত হলেন, আমার ইসলামগ্রহণের কথা জেনে। তিনি আমার প্রতি খুব দয়ালু ছিলেন। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সাহায্য-সহায়তা করেন।

কিন্তু আমার মন চাচ্ছিলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আমি চাচ্ছিলাম জগতের সর্বাধিক পবিত্র নগরী বায়তুল্লাহর শহর মক্কা মুকাররমায় যেতে। আমি প্রভুর দরবারে দু'আ করতে থাকি, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে আমাকে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করো। আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানি আমাকে মক্কা শরীফে ট্রান্সফার করে। এখন আমি যেখানে কাজ করছি তা মসজিদুল হারামের অতি নিকটে। আলহামদুলিল্লাহ!"

আবদুর রহমানের আসল চিন্তা এখন তার বাড়িতে রেখে আসা পরিবার-পরিজন নিয়ে। ওরা তো তখনও সবাই হিন্দু ছিলো। তিনি বলেন, "আমার ওপর বড়ো দায়িত্ব পড়েছে। আমার পরিবারের সদস্যদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানো ও তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে সহায়তা করা।"

আবদুর রহমানের স্ত্রী ও দুজন ছেলেসন্তান আছেন। বড় ছেলের বয়স ষোল ও ছোট ছেলের বয়স সাত বছর। তিনি বলেন, "টেলিফোনের মাধ্যমে আমার ইসলামগ্রহণের কথা তাদের জানিয়েছি। প্রথমে তারা আমার কথা বিশ্বাস করে নি। আমার স্ত্রী বলেছে, ছুটির সময় ভারতে বেড়াতে গেলে সে সিদ্ধান্ত নেবে। আমি প্রত্যেকদিন আল্লাহর দরবারে দুআ করছি। হে আল্লাহ! তাদের তুমি সত্যসিদ্ধ ইসলামের দিকে নিয়ে আসো। তাদের অন্তরকে তোমার দয়ার ছোঁয়া দ্বারা নরম করে দাও। তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দাও।" এসব কথা বলার সময় আবদুর রহমানের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো।

তিনি বলেন, "পরিবার-পরিজন ছাড়াও বন্ধু-বান্ধবদের থেকে আমাকে বিরাট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে হয়তো। গ্রামের লোকও খুশি হবে না। আমি তো তাদের পুরোহিত ছিলাম। মন্দিরে তাদেরকে গীতার পাঠ পড়াতাম।

তবে আমি দৃঢ় অবস্থানে আছি। ইনশাআল্লাহ, প্রভুর সাহায্যে আমি সব ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।”

হিন্দু পণ্ডিত থেকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রিত নও-মুসলিম আব্দুর রহমান সবার প্রতি উপদেশ দেন এই বলে: “আমি পৃথিবীর সকল অমুসলিমদের প্রতি একটি দাওয়াতী বার্তা দিতে চাই। ইসলাম গ্রহণ করুন, সফল হোন এ দুনিয়ায় ও আখিরাতে। মুসলিমদের প্রতি আমার আহ্বান। আপনারা সৌভাগ্যশীল। সত্যধর্ম ইসলামের ধারক-বাহক। তবে মুসলমানদের অনেকেই আমল-ঈমান ছেড়ে দিয়েছেন। আমার অনুরোধ আপনারা ফিরে আসুন নিজের ধর্মের আমল-ঈমান ও কৃষ্টির প্রতি। অপরদের অনুসরণ পরিত্যাগ করুন।”[৭৯]

[৭৯] https://www.islamreligion.com/articles/3987/sushil-kumar-sharma-ex-hindu-priest-india/

সানা মিসরী

প্রাক্তন খ্রিস্টান - মিসর

এক খ্রিস্টান মেয়ে নিজের ধর্মবিশ্বাসের ওপর সন্দিহান হয়ে কুরআন পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান

তার নামা সানা। তিনি ট্রাডিশন্যাল এক মিসরীয় খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্যধর্ম ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছেন- তবে এক দীর্ঘ সত্যানুসন্ধানী ভ্রমণ শেষে। তিনি নিজেই এ ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন।

আমি অন্যান্য যে কোনো মিসরীয় খ্রিস্টান মেয়েদের মতোই বেড়ে ওঠি। আমি খ্রিস্টধর্মের প্রতি এতোই আগ্রহী ও অনুরক্ত ছিলাম যে, আমাকে অন্ধবিশ্বাসী বললেও অত্যুক্তি হবে না। সবার সাথে আমি চলে যেতাম স্থানীয় চার্চে প্রত্যেক রোববার। চার্চের পাদ্রীর হাতে চুমো খেতাম। এরপর শুরু হতো তার নেতৃত্বে উপাসনা। তারপর তিনি উপস্থিত উপাসকদের নসিহত করতেন। প্রায়ই শুনতাম তিনি ত্রিত্ববাদের ওপর খুব জোর দিতেন। বলতেন, খ্রিস্টবাদের মূলই হচ্ছে এ বিশ্বাস। তিনি এটাও সবাইকে বলতেন, একমাত্র খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী কেউই রেহাই পাবেন না। গড একমাত্র খ্রিস্টবাদকেই গ্রহণ করবেন- অন্য কোনোকিছু নয়। যে খ্রিস্টান নয় তাকে বলা হয় অবিশ্বাসী বা নাস্তিক (infidel)।

অপর অনেক শ্রোতাদের মতো আমিও পাদ্রীর এসব কথা খুব একটা বুঝতে পারতাম না। চার্চ থেকে বের হওয়ার পরই আমি মত্ত হতাম আমার মুসলিম বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে খেলা করতে। শিশুরা তো বুঝে না, পাদ্রীরা কীভাবে মানুষের অন্তরে ঘৃণাকে গেড়ে দেন।

আরো কিছু বড়ো হওয়ার পর আমি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হলাম। আমার সহপাঠীদের অনেকেই আমার বন্ধু-বান্ধবে রূপান্তর হলো। আমি লক্ষ করলাম

আমার মুসলিম সহপাঠীরা আমার প্রতি খুব ভালো আচরণ করছিলো। তারা আমাকে নিজেদের বোনের মতো দেখতো। তারা কখনও আমাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য নিয়ে ভাবতো না। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদের প্রতি ভালো আচরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করলে হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করে কুফর থেকে রক্ষা পাবে। পবিত্র কুরআনে আছে:

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" (মুমতাহিনা (৬০): ৮)

একজন মুসলিম মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব খুব গভীর হয়। আমরা প্রায়ই একসাথে থাকতাম- শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষার ক্লাস ছাড়া। তখন আমি ও অন্যান্য খ্রিস্টান ছাত্ররা চেলে যেতাম খ্রিস্টবাদের মৌলিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করতে। আমি চাচ্ছিলাম আমার শিক্ষককে এ প্রশ্নটি করতে: "খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো মুসলিমকে কীভাবে অবিশ্বাসী বলা যায়, যখন তাদের মধ্যে বিরাজ করে খুব উত্তম চরিত্র-মাধুর্য ও মিল-মুহাব্বাত?" কিন্তু আমি মহিলা শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করি নি, এই ভয়ে যে, তিনি রাগ করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্নটি বার বার আমার মনে ঘোরপাক খাচ্ছিলো। অবশেষে একদিন আমি সাহস করে প্রশ্ন করলাম।

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি অবাক হলেন। খুব রাগ পেয়েছে বুঝতে পারলাম। তবে তিনি রাগ থামিয়ে জোর করে কৃত্রিম মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "তুমি এখনও বেশ ছোট্ট। জীবনকে এখনও বুঝতে সক্ষম হও নি। এসব সাধারণ ব্যাপার দ্বারা বিভ্রান্ত হতে নেই। তুমি জানো না মুসলিমদের আসল গোপনীয় চেহারা। আমরা বয়স্করা তাদের ভালো করে চিনি।" আমি স্বেচ্ছায় নিরব থাকি। কিন্তু শিক্ষিকার এ জবাব দ্বারা নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। কারণ এটা না ছিলো বাস্তবসম্মত ও না ছিলো যৌক্তিক।

সময় যেতে থাকে। আমার প্রিয় মুসলিম বান্ধবীর পরিবারবর্গ চলে গেলেন আমাদের শহর সুয়েজ থেকে অনেক দূরে কায়রোতে। বিদায়কালে উভয় বান্ধবী একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে খুব ক্রন্দন করেছি। উপহার দিয়েছি একে অন্যকে বিভিন্ন সামগ্রী। আমার বান্ধবী উপহার দেয় আমাকে খুব সুন্দর অলঙ্কৃত করা একটি বাক্সসহ এক জিলদ কুরআন শরীফ। সে বললো, "আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে একটি মহামূল্যবান উপহার দেবো ভাবছিলাম। কারণ আমি চাচ্ছিলাম তুমি আমাকে যেনো কখনও ভুলে না যাও। পবিত্র কুরআন ছাড়া আর কিছু মহামূল্যবান আমি খুঁজে পাই নি। এতে লিখিত আছে মহান আল্লাহ তা'লার কথা। তাই এ মহাগ্রন্থখানা তোমাকে উপহার দিলাম।" আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও খুশি মনে তার উপহারটি গ্রহণ করি। তবে আমি এটি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আড়ালে লুকিয়ে রাখি। আমি জানতাম তারা এ গ্রন্থ ঘরে রাখতে অনুমতি দেবেন না।

আমার বন্ধবী চলে যাওয়ার পর আমি যখনই মসজিদে আযান শুনতাম তখনই এই গ্রন্থখানা বের করে খুব ভক্তিভরে চুমো খেতাম। তবে এ কাজটি করতাম খুব চুপি চুপি। না জানি কেউ দেখে ফেললে উপায় নেই!

আরো সময় যেতে থাকে। আমার বিবাহের বয়স হলো। আমি বিয়ে করলাম এক প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান যার কাজ ছিলো আমাদের ভার্জিন মেরি চার্চের পাদ্রীর সহযোগিতা করা। আমি স্বামীর গৃহে চলে গেলাম- অবশ্য আমার পবিত্র কুরআন সাথে নিতে ভুলি নি। আমি এটি স্বামীর দৃষ্টি থেকেও গোপনে রাখলাম। প্রাচ্যের অন্যান্য যে কোনো স্বামীভক্ত নারীর মতো আমি ঘরসংসার করতে থাকি। আমি তিন সন্তানের মা হলাম। কাজ করছিলাম সরকারী একটি অফিসে। সেখানে কিছু নিকাব পরিহিতা মুসলিম সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এরা আমার প্রিয় বান্ধবীর কথা মনে করিয়ে দিতো। একইসময় যখনই কোনো মসজিদের মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযান ধ্বনি শুনতাম তখনই অন্তরের মধ্যে কী এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠতো যার ব্যাখ্যা দিতে আমি অপারগ। অথচ তখনো আমি এক অ-মুসলিম এবং চার্চের কর্মী ছিলো আমার স্বামী।

দিন যেতে থাকে। আমার পড়শী ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ মুসলিমা। তার আচার-ব্যবহার ছিলো চমৎকার। আমি ভাবতে লাগলাম, ইসলাম কী সত্যিই একটি সত্যধর্ম? চার্চে এই মুসলমানদের ব্যাপারে আমাকে যাকিছু বলা হয়েছে তার সঙ্গে এদের আচার-আচরণ তো মিলে না। আমি যেনো বুঝতে পারছিলাম- ইসলামই সত্যধর্ম। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে ইসলাম সম্পর্কে টিভিতে সম্প্রচারিত কিছু প্রোগ্রাম দেখতে লাগলাম ও রেডিওতে ইসলামী সম্প্রচার শুনতে থাকি। আমার উদ্দেশ্য ছিলো অসংখ্য যেসব প্রশ্ন আমার মনে জাগ্রত হচ্ছিলো তার জবাব পাওয়া। প্রোগ্রামসমূহে মাঝে মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ রিফাত ও ক্বারি আবদুল বাসিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন সুমধুর সুরে। তাদের কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হতাম। তিলাওয়াত শ্রবণকালে আমি ভাবতাম, এটা কখনও কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। নিশ্চয় এটি আল্লাহর বাণী।

একদিন আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে চাবি দিয়ে আমার আলমারি খুললাম। খুব আদবের সাথে কম্পিত হস্তে আমার মহামূল্যবান সম্পদ কুরআন শরীফ হাতে তুলে নিলাম। এটি খুলতেই কুরআন শরীফের তৃতীয় সূরার একটি আয়াত আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠলো। এতে লিখিত আছে:

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।" (আলে ইমরান (৩): ৫৯)

আমার হাতের কম্পন বাড়তে থাকে। ঘাম এসে ভিজিয়ে দিলো মুখমণ্ডল। আমার সমগ্র দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আমি এ অনূভূতি দ্বারা সত্যিই বিস্ময়াভিভূত হলাম। আমি কতোবার কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছি- রাস্তায়, টিভিতে, রেডিওতে ও আমার বান্ধবীর বাড়িতে। কখনও তো এরূপ কোনো অনুভূতি দ্বারা আড়ষ্ঠ হই নি। আমি চাচ্ছিলাম আরো পাঠ করবো। কিন্তু বন্ধ করে দিলাম কুরআন শরীফ। কারণ শুনতে পেলাম, আমার স্বামী চাবি দিয়ে দরোজা খুলছেন। তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফ লুকিয়ে রেখে স্বমীকে স্বাগত জানাতে দরোজার দিকে যাই।

পরের দিন কাজে গেলাম- আমার মনে তখন খেলা করছিলো অসংখ্য প্রশ্ন। যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তা আমার মনে জন্ম দিয়েছে অসহনীয় আরো কিছু সন্দেহ। জন্ম দিয়েছে জিসাস আলাইহিসসালামের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর। তিনি কী খ্রিস্টানদের দাবি মুতাবিক গডের পুত্র ছিলেন? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের কর্তৃক প্রচারিত পুত্রের পিতা হওয়ার মতো কু-ধারণার ঊর্ধ্বে, মহাপবিত্র। তবে জিসাস কী একজন নবী ছিলেন যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে? এ আয়াত তো সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে জিসাস ছিলেন একজন মানুষ। সুতরাং তিনি গডের পুত্র নন; কারণ আল্লাহ তাআলা অন্যত্র নিজের পরিচয় দিতে যেয়ে বলেন:

"তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি; এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" (ইখলাস (১১২): ৩-৪)

আমি এবার গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকি চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করতে। ভাবতে থাকি শাহাদাতের বাণী: "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল" সম্পর্কে। আমি কী ইসলামে দীক্ষিত হতে ঘোষণা করতে পারবো? আমার পরিবার ও স্বামীর প্রতিক্রিয়া কী হবে? এছাড়া আমার তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে? এসব প্রশ্ন আমার মনকে এতোই ব্যস্ত রাখে যে, কাজ করতে আমার ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিলো। প্রথম পদক্ষেপ নিলেই আমি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। এমনকি আমার পরিবার, স্বামী ও চার্চ কর্তৃক হত্যার শিকার হওয়াও অসম্ভব ছিলো না।

কয়েক সপ্তাহব্যাপী আমি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা থেকে দূরে থাকি। আমার সহকর্মীরা আমাকে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে জানতো। কিন্তু পবিত্র কুরআন খোলে দেখার পর থেকে আমি কোনো মতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম মাত্র। অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি উপস্থিত হলো।

সেদিন আমি অন্তর থেকে সকল সন্দেহ ও ভীতি দূর করে দিলাম। অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বের হয়ে ঈমানের আলোর মাঝে উদ্ভাসিত হলাম। এদিন আমি কাজে যেয়ে ভাবতে থাকি- যে ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম- এরপর কানে ভেসে এলো মুয়াজ্জিনের কণ্ঠের মধুর আযান ধ্বনি। তিনি ডাক দিলেন মুসলিম উপাসকদের তাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত

হতে। তখন ছিলো যুহরের নামাযের ওয়াক্ত। মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি আমার আত্মার অভ্যন্তরে যেয়ে প্রতিক্রিয়া করে। আমি যেনো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করছিলাম- যে অনুসন্ধান হেতু আত্মায় ছিলো অস্বস্থি ও অশান্তি, তার অবসান হয়েছে। তবে একই সময় আমি অনুভব করলাম আমার অতীত পাপের ভর। আমি তো জীবনভর সত্যিকার এক আল্লাহর ইবাদত করার ডাককে উপেক্ষা করেছি। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। সজোরো উচ্চারণ করলাম শাহাদাতের পবিত্র বাণী: "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশআদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।" [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"]

আশপশে বসে থাকা আমার সহকর্মীরা সম্পূর্ণরূপে হতবাক হয়ে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে হা করে তাকিয়ে রইলো। ক্ষণকাল পরই সবাই ছুটে এলো আমার নিকট। জড়িয়ে ধরলো মহানন্দে। বার বার আমাকে আলিঙ্গন করে বলছিলো, "আল-হামদুলিল্লাহ! আল-হামদুলিল্লাহ! আহলান সাহলান ইয়া উখতী!" তাদের অনেকের চোখ দুটো অশ্রুতে ভিজে গিয়েছে।

আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরিয়ে আসলো না। শুধুমাত্র দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অশ্রুজল। আমি মনে মনে আল্লাহর দরবারে বার বার আবদার জানাতে থাকি: হে আমার প্রভু! আমার অতীত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দিন।

আমার ইসলামে অনেকটা নাটকীয়ভাবে আলিঙ্গনের খবর দ্রুত সমগ্র গোভারনোটের জেনারেল অফিসব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। আমার খ্রিস্টান সহকর্মীরা যখন এ সংবাদ শ্রবণ করলেন, তারা স্বেচ্ছায় ব্যাপারটি আমার পরিবারের সদস্যবর্গ ও স্বামীকে জানাতে বিলম্ব করলেন না! তারা আমার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মিথ্যা কিছু গুজবও রটালো। আমি এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলাম না। আমি ভাবছিলাম, এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার এ ইসলামগ্রহণের সিদ্ধান্তকে দাপ্তরিকভাবে ঘোষণা দেওয়া।

আমি চলে গেলাম পুলিস স্টেশনে। মিসরের আইন মুতাবিক ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিলাম পুলিস অফিসারের সম্মুখে। কিন্তু বাড়ি ফিরে

দেখলাম, আমার স্বামী ইতোমধ্যে পারিবারের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। তারা সবাই মিলে আমার কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে ফেললো। টাকা-পয়সা যাকিছু ছিলো তা-ও নিয়ে গেলো। এছাড়া অলঙ্কারাদি ও আসবাবপত্রও নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। আমি খুব আহত হলাম। তবে যে বিষয়টি আমাকে সর্বাধিক বেশি দুঃখ দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার স্বামী কর্তৃক আদুরে সন্তানগুলোকে নিয়ে যাওয়া। সে এটা করেছে, তার দৃষ্টিতে আমাকে অন্ধকার ধর্মহীনতা থেকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করতে! আমি আমার সন্তানদের জন্য ভীষণ চিন্তিত হলাম। ভাবলাম, তারা যদি চার্চে যেয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে বসে, তাহলে তাদের পিতার সঙ্গে তারাও নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেনো আমার বাচ্চাগুলোকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তিনি যেনো অনুগ্রহ করে তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন, যাতেকরে এদেরকে মুসলমান হিসেবে বড়ো করতে পারি লালন-পালন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমার আর্জি কবুল করেছেন। একজন মুসলিম ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিতে পারি। আমি আদালতে যেয়ে আমার দাবি জানালাম। উপস্থিত করলাম ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সনদপত্র। আদালত সত্যকে সমর্থন জানালো। বিরাচক আইনী নোটিশ দিয়ে আমার স্বামীকে আদালতে হাজির করে দুটি চয়েজ উপস্থাপন করলেন: হয় তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে না হয় উভয়ের মধ্যে বিবাহবন্ধন ইসলামী আইনানুসারে ভঙ্গ হয়ে যাবে। তিনি জানালেন, ইসলাম ধর্মে অমুসলিম পুরুষ কেনো মুসলিম নারীর স্বামী হতে পারে না। আমার স্বামী সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। ফলে, বিজ্ঞ বিচারক ঘোষণা দিলেন তোমাদেরকে আলাদাভাবে থাকতে হবে। তিনি সন্তানগুলোকে দেখাশুনার দায়িত্ব আমাকে দিলেন।

ভাবলাম, এই বুঝি আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। তবে আমার প্রাক্তন স্বামী ও তার পরিবারবর্গ কিন্তু সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলো না। তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব রটাতে থাকে যাতেকরে আমি আত্ম-বিশ্বাসহীন হই ও ভেঙ্গে পড়ি। এমনকি তারা এটাও চেষ্টা করেছে যে, অন্যান্য মুসলিম

পরিবাররা যেনো আমার সঙ্গে সামাজিকভাবে ওঠাবসা ও সাহায্য-সহায়তা করে না। এসব অস্বস্থিকর অবস্থাকে উপেক্ষা করে, আলহামদুলিল্লাহ- আমি দৃঢ় আছি আমার ঈমানের ওপর এবং সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছি। আমি সব সময় মহাবিশ্বের মালিক আমার প্রভুর নিকট হাত তুলে প্রার্থনা করে যাচ্ছি: হে আল্লাহ! এসব দুর্ভোগ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি আমাকে দান করো ও জীবনকে সহজ করে দাও। হে করীব আল্লাহ! মহান দয়ালু! আমার প্রার্থনার জবাব দাও।

আমার সাক্ষাৎ ঘটলো একজন মুসলিম বিধবার সঙ্গে। তার চারটি মেয়ে ও একটি ছেলেসন্তান আছে। তিনি আমার প্রতি সহানুভি দেখালেন ও আমার দৃঢ়পদ অবস্থান দেখে খুব প্রশংসা করলেন। একজন গরীব নারী হলেও, তিনি ছিলেন খুব ভালো মানুষ। মুহাম্মদ নামক তার এক ছেলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে আমাকে অনুরোধ জানালেন। বললেন, মুহাম্মদ তার স্ত্রীকে হারিয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর মেয়েটি মারা যায়।

আমি আজ খুব শান্তিতে বসবাস করছি আমার মুসলিম স্বামীকে (মুহাম্মদ) নিয়ে। তার পরিবার ও আমার সন্তাররাও খুব খুশি। যদিও আর্থিক দিক থেকে খুব একটা স্বচ্ছল নই তথাপি আমরা অনুভব করি আত্মিক প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও আনন্দ। আমার প্রাক্তন স্বামী ও তার পরিবারের অনরবত দুশমনির শিকার হয়েও আমি দুআ করে যাচ্ছি আল্লাহর দরবারে, তিনি যেনো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন যেভাবে আমার প্রতি করেছেন। তারাও যেনো আমার মতো সত্যের সন্ধান পেয়ে যায় এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াব হয়। আমীন।[৮০]

---

৮০ https://www.islamreligion.com/articles/1180/viewall/sana-ex-christian-egypt/

চার্লস লিগেই ইটোন

প্রাক্তন সন্দেহবাদী - বৃটিশ দার্শনিক

একজন দার্শনিক ও লেখকের সত্যের অনুসন্ধান, বিশ্বাস ও আমলকে সামঞ্জস্যসাধনের আভ্যন্তরীণ অবিরত সংগ্রামের বর্ণনা তার নিজের ভাষায় শুনি।

বৃটিশ মা-বাবার সন্তান আমি। সুইজারল্যান্ডে আমার জন্মকালে সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছে। লুজানে চুক্তির মাধ্যমে এক বিরাট সাম্রাজ্যের ইতি ঘটে- যার নাম ছিলো উসমানী খেলাফত [Ottoman Empire]। আমার পরিবারটি ছিলো যুদ্ধ, রক্তারক্তি ও সংঘর্ষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাবার বয়স যখন ৬৭ বছর তখন আমার জন্ম। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন বৃটিশ ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টের (১৭৬১-১৮২১) মধ্যে যুদ্ধের সময়।

আমার কোনো মাতৃভূমি ছিলো না। যদিও জন্ম হয় সুইজারল্যান্ডে কিন্তু সুইস ছিলাম না। আমার মাতা ফ্রান্সে বেড়ে ওঠেন। তিনি ফ্রেঞ্চদের মতো আর কাউকে এতো বেশি ভালোবাসতেন না। কিন্তু আমি ফ্রেঞ্চও ছিলাম না। আমি কী ইংরেজ ছিলাম? আমি কখনও তা অনুভব করি নি। আমার মাতা বার বার বলতেন, ইংরেজরা হচ্ছে ঠাণ্ডা, বোকা ও কাপুরুষ- তাদের না ছিলো জ্ঞান-প্রজ্ঞা না কোনো উত্তম কৃষ্টি। আমি তাই এদের মতো হতে চাই নি। সুতরাং, কোথায় যদি- কোনো জায়গা থেকেও থাকে, আমার আপন মাতৃভূমি? এটা এখন ভাবি, এরূপ একটি উত্তম শিশুকাল হয়তো আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। জন্ম যেখানেই হোক না কোনো, জাতি যেটাই থাকুক- একজন মুসলিমের জন্মভূমি হচ্ছে দারুল-ইসলাম, ইসলামের গৃহ। ইহলোকে ও পরলোকে তার পাসপোর্ট হচ্ছে অতি সরল-সোজা ঈমানের সাক্ষ্যপ্রদান: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তার জন্য ইহলোকে সিকিউরিটি বা স্থিতিশীলতা নিয়ে ভাবা ঠিক

নয় বা উচিৎ নয়। সর্বদা তাকে এ কথাটি মনে রাখতে হবে, আগামীকালই সে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারে চিরতরে। ভঙ্গুর এ পৃথিবীর বুকে তার শক্ত কোনো মূল নেই। তার মূল উর্ধ্বজগতে বিদ্যমান। সেখানেই তা চিরন্তন।

তাহলে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে কী বলবো? পিতার মধ্যে যদি কোনো ধর্মীয়া চেতনা থেকে থাকে তাহলে তিনি তা কখনও প্রকাশ করেন নি। প্রায় নব্বুই বছর বয়সে তিনি মারা যান। মৃত্যুশয্যায় থেকে তিনি উপরের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন, “ওখানে কী কোনো শান্তির জায়গা আছে?”

আমার বেড়েওঠার দায়িত্ব সম্পূর্ণটাই আমার মায়ের ওপর ছিলো। প্রকৃতিগতভাবে আমি মনে করি না তিনি ছিলেন ধর্মহীন। ধর্মীয় পরিবেশে বড়ো হলেও তিনি সচরাচর পরিচিত ‘সংগঠিত ধর্মে’ বিশ্বাস করতেন না। একটি ব্যাপার নিশ্চিত ছিলো- তার পুত্রকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে দিতে হবে। সে যেনো কখনও দ্বিতীয়-হাতের মতামতকে গ্রহণ করে না। ‘ধর্মবিশ্বাস ঠেসে গলদ্ধকরণ’ করা যেনো না হয়, সে ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে কর্মে যোগদানকারী সকল নার্সদের কড়াভাবে সতর্ক করতেন: কেউ কোনোদিন আমার ছেলের সাথে ধর্ম নিয়ে কথা বলবে না। বললে, সাথে সাথে চাকরি যাবে।

আমার বয়স যখন পাঁচ বা ছয় তখন কিন্তু এক যুবতি আসলো ও সে মায়ের নির্দেশ অমান্য করে বসলো। এ মেয়েটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো আরবদেশে যেয়ে খ্রিস্টান মিশনারী কাজে জড়িত হবে। সে আমাকে বললো, ‘আমি চাই সেখানে যেয়ে ওসব দিশেহারা পৌত্তলিকদের আত্মাকে রক্ষা করতে- যারা নিজেদেরকে ‘মুসলেমিজম’ বলে!’ ‘আরাবিয়া’ শব্দটি এই প্রথম আমি শুনলাম।

তখন আমরা ওয়ান্ডসওয়ার্থ কমনে (লন্ডনে) বাস করছিলাম। একদিন ঐ নার্স যুবতি আমাকে নিয়ে বাইরে হাঁটতে যায়। এক পর্যায়ে আমরা ওয়ান্ডসওয়ার্থ জেলখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত আমি দুষ্টুমি কিছু করছিলাম। সে হঠাৎ আমার হাত ধরলো শক্ত করে। জেলের গেটের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, “ওখানে আকাশে আছে এক লাল-চুলওয়ালা ব্যক্তি যাকে সবাই গড বলে। সে তোমাকে ওখানের ভেতর ঢুকিয়ে দরোজা বন্ধ

করে দেবে যদি তুমি দুষ্টুমি না ছাড়ো!” গড শব্দটি এই সর্বপ্রথম শ্রবণ করলাম। তবে যা শুনলাম তা মোটেই পছন্দ করি নি। যে কোনো কারণেই হোক, লাল-চুলওয়ালা মানুষকে আমি ভয় করতাম। মনে হয় ঐ মেয়েটি এটা জানতো। বিশেষ করে এই বিশেষ লোকটির প্রতি ভীষণ ভয় জন্মালো- যে নাকি আকাশের মেঘমালার উপরে থাকে ও দুষ্ট ছেলেদেরে শাস্তি দেয়। বাড়িতে পৌঁছুয়ে কিন্তু আমি মাকে এ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে কী বলেছিলেন সেটা মনে পড়ছে না- তবে মেয়েটি সাথে সাথে তার চাকুরি হারায়।

সে যুগের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় কিছুটা বিলম্বে আমাকে স্কুলে প্রেরণ করা হয়। ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুলে পড়ালেখা করি ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। এরপর চলে আসি ইংল্যান্ডের চ্যাটারহাউজে। নিঃসন্দেহে, স্কুলের চ্যাপেলে (চার্চে) অনুষ্ঠিত সার্ভিস ও স্ক্রিপচার (ধর্মগ্রন্থ বাইবেল) সম্পর্কে ক্লাস নেওয়া হেতু খ্রিস্টবাদ হয়তো আমার মধ্যে কিছুটাও না হয় প্রভাব ফেলেছে? কিন্তু বাস্তবে কোনো প্রভাব মোটেই ফেলে নি! না ফেলেছে কোনো প্রভাব আমার স্কুল সহপাঠীদের মধ্যে। আমার নিকট এটা অবাক কিছু ছিলো না। ধর্ম কখনো পূর্ণাঙ্গ ও প্রভাবশীল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না যখন এটাকে বেঁধে রাখা হয় চার দেওয়ালের ভেতর। ধর্ম হয় সবকিছু না হয় কিছুই নয়। সপ্তাহে এক দুবার মাত্র বাইবেল সম্পর্কে আমাদেরে শিক্ষা দেওয়া হতো। ঠিক অন্যান্য বিষয়ও যেভাবে পড়ানো হতো। ধর্ম, মনে করা হতো অন্যান্য বিষয়ের মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। গড কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। তিনি আমাদের বিজ্ঞানের ক্লাসে যাকিছু শিখছিলাম, নির্ধারণ করেন নি। বর্তমান ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। পৃথিবীটা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে শাসিত হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক ক্ষমতাবলে। সবকিছু যেভাবে আছে সেভাবেই চলছে বলে বিশ্বাস রাখতে হবে। এর পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করছে না। গড ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত।

অথচ আমি চাচ্ছিলাম আমার অস্তিত্বের অর্থ কী তা বুঝতে। শুধুমাত্র ওরা যারা তাদের জীবনের কোনো এক সময় এরূপ জানার আগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, বুঝতে পারবেন এ আগ্রহের শক্তি কতো বিরাট। এর সঙ্গে ক্ষুদার্ত

হেতু শারীরিক দুর্বলতা বা এমনকি যৌনক্ষুদাও তুলনীয় নয়। আমি বুঝতে পারি নি- কীভাবে এক পা সামনের দিকে অগ্রসর হবো- এটা না বুঝে যে, আমি কোথায় ও কেনো যাচ্ছিলাম? আমি কিছুই করতে পারছিলাম না, যদি না বুঝতে সক্ষম হই আমার কার্যকলাপ দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হবে? আমি শুধু এটাই জানতাম, আমি জানি কিছুই জানি না! অর্থাৎ সর্বাধিক স্বল্প গুরুত্বের ব্যাপারেও- আমি ছিলাম এক চেতনাহীন মানুষ আমার অজ্ঞতা হেতু- যেনো অচেতন হয়ে পড়েছি এক গাঢ় শিশিরে ঢাকা দিঘন্তের মাঝে।

জ্ঞানার্জনের জন্য আমি কোথায় যাবো? আমার বয়স যখন ১৫ বছর তখন জানতে পারলাম "দর্শন" নামক একটি বিষয় আছে। এটাও জানলাম এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রাজ্ঞতার প্রতি ভালোবাসা'। প্রাজ্ঞতার অনুসন্ধানই আমি করছিলাম। সুতরাং আমার পিপাসা মেটানোর সূত্র ছিলো ওসব ভারী গ্রন্থাদি যা লিখেছেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা। বেশ উত্তেজিত হলাম, ঠিক যেরূপ হয়ে থাকেন কোনো তথ্যানুসন্ধানী দীর্ঘদিন ভ্রমণ শেষে শুষ্কভূমির দৃশ্য দেখে দিঘন্তে। আমি লেগে গেলাম অধ্যয়নে। ডেকার্ট, কান্ট, হিউম, স্পিনোজা, স্কোপেনহোয়ার এবং বের্ট্রান্ড রাসেলের গ্রন্থাদি শেষ করলাম। তাদের গ্রন্থাদির ব্যাখ্যাগ্রন্থও এক দুটো পাঠ করলাম। কিন্তু একটা কিছু সমস্যা যে ছিলো- তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি।

হয়তো বা আমি অনুসন্ধানী হয়ে যা খুঁজছিলাম তা না পেয়ে বালু ভক্ষণে লিপ্ত হয়ে গেছি! বাস্তবে উক্ত 'প্রজ্ঞাবান' ব্যক্তিরা কিছুই জানতেন না। তারা শুধুমাত্র অনুমান করছিলেন। নিজের মাথা থেকে বিভিন্ন ধারণা বের করে আনছিলেন (আর ধারণা তো যে কোনো ব্যক্তিই করতে পারে- এমনকি একটি স্কুলপড়ুয়া বাচ্চার পক্ষেও সম্ভব)। কী করে ১৫-১৬ বছরের এক বাচ্চা পশ্চিমা সব সেক্যুলার দর্শনকে মূল্যহীন বলার দুঃসাহস দেখালো? 'ধারণা' ও 'সত্যিকার জ্ঞানে'র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পরিণত বয়সের কোনো প্রয়োজন হয় না। একই সময়, আমার মায়ের অনবরত পীড়াপীড়ি ছিলো, আমি যাতে অন্যের চিন্তা-চেতনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করি- বরং নিজের বিবেককে অগ্রাধিকার দিই। পশ্চিমা কৃষ্টি উক্ত দার্শনিকদেরে 'মহান ব্যক্তি'

বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ছাত্ররা তাদের চিন্তা-চেতনা অধ্যয়ন করে বিরাট শ্রদ্ধাভরে। কিন্তু আমার নিকট এগুলো কী ছিলো?

কিছুদিন পর আমি যখন ষষ্ঠশ্রেণির ছাত্র, একজন শিক্ষক আমার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হন এবং এক অদ্ভুত কথা বলেন, যার অর্থ কী আমি বুঝতে পারি নি। তিনি বলেন, "তুমি হলে, আমার জানা মতে সত্যিই একমাত্র সর্বজনিন সন্দেহবাদী।" তিনি বিশেষকরে ধর্ম নিয়ে কথা বলছিলেন না। তিনি উদ্দেশ্য করেছিলেন, আমি সবকিছুতে সন্দেহ পোষণ করি। অথচ মানুষ এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল।

আজকের বিশ্বে 'বিশ্বাসহীনতা'র একটি কারণ হচ্ছে, ধর্মবিশ্বাসের বহুবচন থাকা- যাদের মধ্যে বিদ্যমান পরস্পরবিরোধিতা। যতোদিন পর্যন্ত ইউরোপিয়ানরা তাদের সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস রাখবে, ততোদিন তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস খ্রিস্টবাদকে একমাত্র সত্যবিশ্বাস হিসেবেই মেনে নেবে।

আমি তখনও কুরআন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার প্রশ্ন ছিলো একজন দয়ালু প্রভু কীভাবে অধিকাংশ মনবসমাজকে মিথ্যা প্রভুকে উপাসনা করে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিতে পারেন? তবে পরে জানলাম কুরআন আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে, পৃথিবীর কোথাও কোনো জনগোষ্ঠিকে আসমানী হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রাখা হয় নি। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁরা জাতিসমূহের নিজস্ব ভাষায় প্রভুপ্রদত্ত দিকনির্দেশনা প্রচার করেছেন। তবে মানুষ সত্যকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিয়েছে যুগের পর যুগ ধরে। এখন আমার নিকট এটা ধরা পড়েছে যে, ঠিক যেভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আদি যুগের সকল সভ্যতায় নবী-রাসূল এসে সত্যধর্ম ইসলামকেই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে মানুষ প্রাপ্ত সত্যবিশ্বাসকে বক্র করতে করতে বিভিন্ন পৌরানিক কাহিনী, চিহ্ন ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে ফেলেছে। এজন্য সর্বশেষ বার্তাবাহক প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে তার সঠিক স্থানে পুনঃস্থাপন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মানুষ যাতে এ বিশ্বাসকে আর বিকৃত করতে সক্ষম না হয় সে গ্যারান্টিও দিয়েছেন।

চ্যাটারহাউজ থেকে আমি চলে যাই ক্যামব্রিজে। তবে সেখানে যেয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন থেকে নিজেকে দূরে রাখি। কারণ, এগুলো ছিলো বিরক্তিকর। ঐবছর (১৯৩৯ সাল) দ্বিতীয় মহাযুক্ত শুরু হয়। এর দু বছর পরই চলে যেতে হলো সেনাবাহিনীতে। আমি মনে করলাম, জার্মানরা নিশ্চয়ই এবার আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আমি তখনও সত্যের সন্ধানে ডুবে ছিলাম। ভাবলাম, সময় হয়তো নেই। এরপরও কোনো সংগঠিত ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি নি। আমার অধিকাংশ বন্ধুদের মতো, চার্চের প্রতি আমার ঘৃণা ছিলো- কারণ তারা গডের প্রতি লিপ-সার্ভিসে (মুখের কথায় শুধু) লিপ্ত ছিলো- গডকে মোটেই জানতো না। তবে এ বিরোধিতাকে কিছুটা নরম করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

দৃশ্যটা আমার পুরোপুরি স্মৃতিতে ভেসে আসছে। কয়েকজন মিলে কিংস কলেজের হলে বসে কফি পান করছিলাম। আলাপচারিতা এক পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে শুরু হলো। নেতৃত্বে ছিলো এক স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। তাকে সবাই অত্যন্ত মেধাবী হিসেবে জানতো। তাকে মুগ্ধ করার আশা নিয়ে ক্ষণকালের নিরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম, “কোনো বুদ্ধিমান লোক আজকাল ধর্মবর্ণিত গডকে বিশ্বাস করে না!” সে খুব দুঃখিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, “আমি এর বিপরীতে বলবো, আজকের যুগে একমাত্র বুদ্ধিমানরাই গডকে বিশ্বাস করে।” আমি তখন চাচ্ছিলাম, টেবিলের নিচে আত্মগোপন করবো!

পরবর্তীতে দার্শনিক গল্পকার এল.এইচ. মেয়ারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনি বয়সে আমার অনেক বড়ো ছিলেন। আমি জানলাম যে, তিনি হিন্দুদের বেদান্ত পাঠ করে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আমিও তার অনুসরণে বেদান্ত নিয়ে গবেষণা করি। আর এ থেকেই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এটা আমার মুসলমান ভাইদের অবাক করতে পারে। কারণ ইসলাম হচ্ছে নিষ্কলুষ একত্ববাদের ধর্ম। এর সঙ্গে পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দু ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথাটি সঠিক। তবে আমি দেখলাম বেদান্তেও একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে। তাই বলে বেদান্ত একটি ঐশীবাণী- তা কিন্তু নয়। আর এ কারণেই ইসলামের দিকে আমার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

খুব শীঘ্রই ক্যামব্রিজের দিনগুলো ফুরিয়ে গেলো। আমাকে প্রেরণ করা হলো সেন্ডহার্সটে স্থাপিত রয়েল মিলিটারী কলেজে। পাঁচ মাসের ট্রেনিং শেষে একজন সৈনিক যুবক হিসেবে বেরিয়ে আসি। হত্যা করতে বা হত্যার শিকার হতে প্রস্তুত! আরো প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলো স্কটল্যান্ডে। এখানে আমি অনেকটা অবসর সময় কাটাই। অধ্যয়ন ও স্কটিশ পাহাড়ী অঞ্চলে হাঁটাহাঁটি করে সময় কাটাচ্ছিলাম।

আর্মি থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর আমি লেখালেখি শুরু করি। আমি বেদান্তদর্শন, তাওইজম এবং জৈন বৌদ্ধবাদ নিয়ে লেখালেখি করেছি। আরো লিখেছি কিছু কিছু পশ্চিমা লেখকের কথা যারা উক্তসব দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন আমার বন্ধু লিও মেয়ার।

সৌভাগ্যক্রমে কবি টি.এস. ইলিয়োটের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি তখন একটি প্রকাশনা কোম্পানির পরিচালক। তারই সহযোগিতায় “দ্যা রিচেস্ট ভেইন” শিরোনামে আমার উক্ত লেখাগুলো প্রকাশিত হলো। এরপর আমি শায়খ আবদুল ওয়াহিদ (রেনি গুইনোন) নামক এক ফ্রেন্স নও-মুসলিমের লেখালেখি দ্বারা প্রভাবিত হলাম। তিনি যৌক্তিক গবেষণা থেকে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে বলেন, ইসলাম ও কুরআন হচ্ছে প্রভুর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পথপ্রদর্শন। অতীতের সবগুলোর সমন্বিত ও সংশোধিত রূপ। আমি তখনও ইসলামগ্রহণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম না। তবে আমি এটা শিখে নিয়েছিলাম, কীভাবে নিজের মতামতকে গোপন রাখতে হয় বা পর্দাবৃত করতে হয়।

দ্যা রিচেস্ট ভেইন প্রকাশকালে আমি ইংল্যান্ড ছেড়ে জ্যামেকা চলে যাই। সেখানে আমার এক স্কুল সহপাঠী বন্ধু থাকতো। আমি জানতাম, সে আমার জন্য কোনো একটা কাজ জোগাড় করতে পারবে। আমাকে বইয়ের কাভারে ‘পরিপক্ক চিন্তক’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তখনও যুবক মাত্র।

যাক, একদিন এক ক্যাথোলিক পাদ্রী জ্যামেকায় আসেন বেড়াতে। তিনি বন্ধুদের বললেন, আমি এক অত্যাশ্চর্য বই পড়েছি, এটার লেখক চার্লস লিগেই ইটোন। বন্ধু বললেন, এ লেখক তো বর্তমানে জ্যামেকায়ই আছেন। তিনি বললেন, ভাই! দয়াকরে তার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

পাদ্রীর বন্ধু তাকে নিয়ে এক পার্টিতে গেলেন। আমি সেখানে ছিলাম। পাদ্রীকে আমার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হলো। নিজের চোখের সামনে এক বোকাপ্রকৃতির যুবককে দেখে পাদ্রী দীর্ঘক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মন্তব্য করলেন: "তুমি ঐ বইয়ের লেখক হতে পারো না!"

জ্যামেকায় আড়াই বছর অবস্থানের পর ইংল্যান্ডে ফিরে আসি। দু ব্যক্তি আমার বই পড়ে যোগাযোগ করেন। এই উভয়ে রেনি গুইনোন অরফে শায়খ আবদুল ওয়াহিদের লেখালেখিও পাঠ করেছেন। তারাও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে বললেন, আমি যে সত্যানুসন্ধানে ছিলাম তা ভারত, চীন বা কোথাও পাবো না- তা ছিলো অনেকটা বাড়ির নিকটেই- এ্যাব্রাহামিক ঐতিহ্যে। তাদের কোনো উপদেশ আমি গ্রহণ করি নি। তবে এরপর থেকে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায় ও এ বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন শুরু করি।

এ অধ্যয়ন হেতু আমার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু যে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেছিলো, তার সঙ্গে বৈরিতার শুরু হলো। কারণ সে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতো। তার মতে এই ধর্মটি নাকি অত্যন্ত কঠোর। এ ধর্মে কোনো ধরনের আধ্যাত্মিকতা থাকতে পারে, সে তা বিশ্বাস করতো না। সে আমাকে বললো, এটা বাহ্যিক কিছু নিয়মনীতি, অন্ধবিশ্বাস, অযৌক্তিক, বারবার প্রার্থনাসর্বস্ব, অপ্রশস্ত কট্টরতা ও মুনাফিকী ছাড়া আর কিছু ছিলো না। সে মুসলিম প্রার্থনার নেতিবাচক বর্ণনা দিলো। ভাবলো, এসব কথা দ্বারা আমি প্রভাবিত হবো- এ ধর্ম থেকে দূরে থাকবো। সে একটি কাহিনী বলেছিলো, একজন যুবতি নারী হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলো। সে নাকি মৃত্যুর পূর্বে কোনোমতে দাঁড়িয়ে যায় যাতেকরে কিবলামুখী হয়ে মরতে পারে। আমার বন্ধুর মতামত ছিলো মহিলাটি এক অন্ধবিশ্বাসকে অনুসরণ করতে যেয়ে মৃত্যুর সময় নিজের ওপর প্রয়োগ করেছে কঠোরতা ও কষ্ট। বাস্তবে এ ঘটনাটি ছিলো আমার নিকট হৃদয়াকর্ষক। আমি সেই যুবতির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা জানাই।

এদিকে, আমি কাজ পাচ্ছিলাম না। অনেকটা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছিলাম। যেদিকে যেথায় দেখেছি সেথায়ই আমি কাজের জন্য আবেদন করেছি। এমনকি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ব্যাকরণের সহকারী লেকচারার হিসেবেও আবেদন করলাম। সেটা অবশ্য বোকামি ছিলো, কারণ আমি ক্যামব্রিজে ইতিহাসের ওপর পড়েছি। ইংরেজি ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। সুতরাং কীভাবে ওরা আমার আবেদনকে বিবেচনা করতে পারে? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা বিবেচনা করেছিলো ও আমাকে কাজে যোগ দিতে পত্র লেখে। অক্টোবর ১৯৫০ সালে ২৯ বছর বয়সের সময় আমি কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আর ঠিক এ সময়ই ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ গজে উঠছিলো।

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মীদের একজন ছিলেন ইংলিশ মুসলিম। তার নাম মার্টিন লিংস[৮১] (১৯০৯-২০০৫)। তিনি মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তিনি আবার রেনি গুইনোন (শায়খ আবদুল ওয়াহিদ) এর বন্ধু ছিলেন। যে দুজন নও-মুসলিম লন্ডনে থাকতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তারাও তার বন্ধুজন। মার্টিন লিংসের মতো ব্যক্তি ইতোমধ্যে আমি কখনও দেখি নি। তিনিই ছিলেন এ পর্যন্ত মনের মধ্যে পড়ে থাকা কল্পনার বাস্তব জ্যান্ত উপমা। আমি জানতাম, অবশেষে আমি এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি ছিলেন আদর্শবান, পূর্ণাঙ্গ ও সঙ্গতিপূর্ণ এক সুফি পুরুষ। তিনি শহরতলীর এক ট্র্যাডিশনাল বাড়িতে বসবাস করতেন। তার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াটা ছিলো ব্যস্ত শহরের জীবন থেকে মুক্তির উপায়। আমি প্রত্যেক সপ্তাহ বেড়াতে যেতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে আমি সঙ্গত কারণেই ইংরেজি প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতাম। এসময় অতীত জীবনের অনেক, ঘটনা, বেদনা, ব্যর্থ প্রেম ইত্যাদি স্মৃতিপটে ভেসে আসতো। ফলে আমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তো। ছাত্ররা একে অন্যকে বলতো, "আহ! শেষ পর্যন্ত এক ইংরেজকে

[৮১] এই বিখ্যাত নও-মুসলিমের ইসলামী নাম ছিলো শায়খ আবু বকর সিরাজুদ্দিন।

পেলাম যার হৃদয় আছে! আমরা ভাবতাম, সব ইংরেজ ছিলো বরফের মতো ঠাণ্ডা!"

আমি একদল মিশরী ছাত্রদের প্রতি আকর্ষিত হলাম। এ দলে মোট সদস্যসংখ্যা ৫ বা ৬ জন ছিলো। ক্যারাবিয়ান জীবন থেকে আমি ৮,০০০ মাইল দূরে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন আমি এক ধরনের আশ্রয় খুঁজে পেলাম এ মিশরী যুবকদের মাঝে। তারা যে আমার প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস রাখছে তা থেকে আমি উষ্ণতা অনুভব করলাম। তাদের ধর্মকেও আমার খুব ভালো লাগলো। তারা সবাই ছিলো ভালো মুসলিম। আমি এবার নিশ্চিন্ত হলাম যে, যদি নিজেকে কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই- যদি বন্দী করেত চাই ধর্মবিশ্বাসে, তাহলে সেটা ইসলাম ছাড়া আর কিছু হবে না। কিন্তু তখনও সর্বশেষ পদার্পণ করতে অপারগ ছিলাম। মনে পড়লো সেন্ট অগাস্টিনের প্রার্থনা: "প্রভু! আমাকে ধর্মপরায়ণ করুন, তবে এখনই নয়!" আমি জানতাম, যুগ যুগ ধরে অন্যান্য যুবক ভেবেছিলো যে, তাদের সম্মুখে সাগর পরিমাণ সময় বিদ্যমান, নিজেকে পবিত্র, ধর্মপরায়ণ, নিষ্পাপ করার জন্য প্রার্থনা করেছে- কিন্তু উপরোক্ত একই ধরনের ভাবনা (এখনই নয়) লুকিয়ে রেখেছে অন্তরের গভীরে। আর এ অবস্থার ওপরই অনেকে চলে গেলে দুনিয়া থেকে।

সবকিছু সমান বিবেচনায়, আমি হয়তো কোনোদিনই ধিদ্বাধন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতাম না। অবশেষে ইসলামে দীক্ষিতের নিয়ত, হয়তো বা দূরে পড়ে থাকতো বছরের পর বছর এই একই কথা বলে, 'এখনই নয়'। তবে সবকিছু সমান নয়।

জ্যামেকার জন্য আমি আকুল হয়ে ওঠলাম- বিশেষ করে সেখানকার সেই মেয়েটির বিরহ হেতু আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আমি অনুসন্ধানে জানলাম, ৭০ পাউন্ডের বিনিময়ে জ্যামেকা যেতে পারবো জাহাজযোগে। ভাবলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্ম শেষে এ পরিমাণ টাকা অবশ্যই সঞ্চয় করতে পারবো। এ ভাবনা হেতু আমার জীবন বদলে গেলো। যেহেতু আমি জানতাম কিছুদিন পর পালিয়ে যেতে পারবো, তাই কায়রোর জীবনকে সানন্দে গ্রহণ করলাম। তবে একটি প্রশ্ন সঠিক উত্তরের খুঁজে ছিলো- একে আর স্থগিত রাখার সুযোগ নেই। ইসলামে প্রবেশের সুযোগ হয়তো আর কোনোদিন

আসবে না। আমার সম্মুখে একটি উন্মুক্ত দরোজা ছিলো। ভাবলাম, এক্ষুণি যদি এই দরোজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ না করি, তাহলে দরোজাটি চিরকালের জন্য বন্ধে হয়ে যাবে। অপরদিকে আমি জানতাম, একজন নও-মুসলিম হিসেবে জ্যামেকার মতো দ্বীপে আমার কী ধরনের জীবন হতে পারে।

আমি একটি সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে অনেক লোক অবাক হবেন- আমার সহকর্মী মুসলমানরাসহ। আমি ‘অন্তরে ইসলামের একটি বীজ’ বপন করতে চাই। এটাই আশা ছিলো যে, এ বীজটি গজে ওঠে একদিন ডাল-পালা-পল্লবীতে শুশোভিত হবে। আমি চলে গেলাম মার্টিন লিংসের নিকট।

নিজের নিয়ত ব্যক্ত করে বললাম, আমার শাহাদাতকে গ্রহণ করুন। প্রথমে কিছু অনিশ্চিত হয়েও তিনি শাহাদাতের বাণী শুনলেন। গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত ভীতিকর অবস্থায় অথচ আনন্দচিত্তে জীবনের এই প্রথম আমি তার সঙ্গে নামায আদায় করি। রামাদ্বান থাকায় পরদিন রোযাও রাখলাম। আমি কখনও ভাবিনি, উপবাস করবো। শীঘ্রই আমার ইসলামগ্রহণের কথাটি সিনিওর ছাত্রদেরকে অবগত করি। তারা সবাই আনন্দিত হলো। আমি ভেবেছিলাম অতীতে আমি তাদের প্রিয় ছিলাম। এখন বুঝলাম, আমাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য পর্দা ছিলো। এটি আজ অপসারিত হয়ে গেছে। এখন আমাকে তারা তাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তখনও ৬ সপ্তাহ বাকি আমার গোপনে জ্যামেকার উদ্দেশে যাত্রার (ডিপার্টমেন্টের প্রধানকেও বলি নি- আমি চলে যাচ্ছিলাম)। একজন ছাত্র প্রত্যেকদিন এসে আমাকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলো। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকালাম। মুখটি তখনও একই ছিলো- কিন্তু এখন এটি এক অপর ব্যক্তিকে লুকিয়ে রেখেছে। আমি একজন মুসলমান! মুসলিম! এ অত্যাশ্চর্য ভাবনাসহ আলেকজান্ড্রিয়ায় যেয়ে জ্যামেকাগামী জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজ ছেড়ে দিলো- ছুটে চললাম নতুন জীবন নিয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে।[৮২]

[৮২] https://www.islamreligion.com/articles/166/viewall/charles-le-gai-eaton-former-british-diplomat/

ইমান ইউসুফ

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

প্রাক্তন রোমান ক্যাথোলিক এক মহিলার ইসলামগ্রহণের আকর্ষণীয় কাহিনী

যে কোনো ব্যক্তির ইসলামগ্রহণের ঘটনা সর্বদাই এক ধরনের আশ্চর্যের ব্যাপার। অমুসলিম থেকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো চিত্তাকর্ষক, আরো অত্যাশ্চর্য। বাস্তবে এটা ছিলো সত্যিই এক কারামত- আলহামদুলিল্লাহ!

একজন 'মুসলিম' ঠিক কী বা কে ছিলো, এটা জানার আগেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার ফিতরতের (আল্লাহপ্রাপ্ত জন্মগত স্বভাব) প্রতি আকর্ষিত করেছেন। আমার হৃদয় ও মনকে যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন সেভাবেই করেছেন। এটা এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। সব প্রশংসা আল্লাহর দরবারে যিনি হচ্ছেন উত্তম পথপ্রদর্শক।

ইসলাম নামক সর্বোত্তম উপহার দ্বারা আমাকে আলোকিত করার কাহিনী শুরু হয় **১৯৮১** সালের গ্রীষ্মকালে। অথচ এ পুরো বছরটাই ছিলো আমার জন্য সর্বাধিক কঠিন, নিম্নতম ও পরীক্ষামূলক সময়।

আমার জন্ম ও বেড়েওঠা হয় আমেরিকায়। তবে পরদাদা ও পরদাদী আসেন যথাক্রমে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া থেকে। আমি বড় হই একজন অনুরক্ত রোমান ক্যাথোলিক খ্রিস্টান হিসেবে। ক্রিস্টধর্মের প্রতি খুব আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলাম। তবে বিবাহ নিয়ে সমস্যা দাঁড়ায়। কারণ আমার স্বামী ছিলো একজন নাস্তিক।

১৯৭৯ সালে আমাদের মেয়েটি জন্ম নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাস্তিক স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করা তেমনটি কঠিন ছিলো না। মেয়ে জন্ম নেওয়ার পর আমার জীবনটি হয়ে ওঠে দুর্বিষহ ও ভীষণ চিন্তাযুক্ত ও কষ্টের। আমার স্বামী

মেয়েটিকে ব্যাপটাইজ করতে দিলেও তার উদ্দেশ্য ছিলো মেয়েকে বিশেষ কোনো ধর্মের অনুসারী না করে বড়ো করা। মোটকথা সে তাকে নিজের মতো নাস্তিক হিসেবে বড়ো করতে চাইছিলো। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। এমনকি এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, বিবাহের সময় চার্চের যে ডকুমেন্টে সে সাক্ষর করেছিলো, সেখানেও লেখা আছে যে, এ বন্ধন থেকে যদি কোনো সন্তানাদির জন্ম হয় তাহলে একে ক্যাথোলিক হিসেবে বড়ো করা হবে। আমার স্বামী এসব কথায় কোনো কান দেয় নি।

শুধু তাই নয়, আমার স্বামী তর্ক-বিতর্কের সময় খুব বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কোনো কোনো সময় সে আমার বিশ্বাস, ধর্ম ও স্বয়ং গডকে নিয়ে টাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। আমার সুপরিচিত একজন পাদ্রীর সঙ্গে একটি সাক্ষাতের আয়োজন করি। আশা করছিলাম আমার বিয়ের সমস্যা থেকে কীভাবে উত্তোরণ ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করবো। কিন্তু পাদ্রী আমাকে খুব একটা সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। মনে হলো বিষয়টি আমি যেরূপ গুরুতর মনে করছিলাম, তিনি তা করেন নি। তিনি এটাও বুঝতে পারেন নি, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কী জঘন্য হতে পারে। আমি ভয় করছিলাম সেদিন দূরে নয় যখন আমার স্বামী আমাকে ও আমার মেয়েকে চর্চে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেবে।

পাদ্রীর সঙ্গে এক পর্যায়ে আলোচনায় অন্যদিকে মোড় নিলো। আমরা শুরু করলাম ক্যাথোলিসিজম এর মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে। এক পর্যায়ে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, একের মধ্যে তিন গড থাকার নামই ত্রিত্ববাদ। কিন্তু ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করতে যখন তার ওপর একরূপ চাপ সৃষ্টি করি তখন তিনি বেশ অস্বস্থি বোধ করলেন। বললেন, আমি যদি এরূপ প্রশ্ন করি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার মাঝে বিশ্বাস বলতে কিছু থাকবে না।

যদিও এখন আমি বুঝতে পারছি কোন্ কারণে ঐ পাদ্রী ত্রিত্ববাদ নামক ‘রহস্যের’ সঠিক জবাব দিতে পারেন নি- কিন্তু একজন অনুরক্ত খ্রিস্টান হিসেবে সেদিন খুব আহত হই তার উক্তিতে। তিনি যেনো সেদিন আমাকে চার্চ থেকে বহিস্কার করে দিলেন! ক্রমে একমাত্র এক গডের ওপর বিশ্বাস

ছাড়া আমর থেকে ধর্ম বলতে সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলো। এর পর থেকে আমি নিজেকে আর ক্যাথোলিক হিসেবে কখনও ভাবি নি। এদিকে চার্চের বিরুদ্ধে তখন বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অভিযোগ আসতে থাকে। সাধারণ পাবলিক চার্চের প্রতি আকর্ষণ হারাতে শুরু করে। নামেমাত্র খ্রিস্টান হলেও অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টবাদকে পরিত্যাগ করে। যেখানে কখনও ভাবি নি যে, এদের দলভুক্ত আমি নিজেও হবো- কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ই হলাম।

তবে পেছনদিকে তাকিয়ে আমি সত্যের অনুসন্ধানে লেগে যাই। প্রথমত কিছুদিন অতিবাহিত করলাম শুধুমাত্র বাইবেল পাঠ করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, একজন ভক্ত-অনুরক্ত খ্রিস্টান হয়েও কোনোদিন বাইবেল পাঠ তেমনটি ইতোমধ্যে করি নি। ক্যাথোলিকরা মূলত চার্চ কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে বইগুলো পড়ে থাকে। তারা নিজেদের মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেল তেমনটা পড়েই না। ব্যাপারটি হঠাৎ আমার নিকট আশ্চর্য মনে হলো।

আমার নিকট মনে হলো বাইবেলকে বুঝা খুব কঠিন। এর বর্ণনাভঙ্গি ছিলো অস্পষ্ট ও ভাঙ্গাভাঙ্গা। আমার দৈনিক জীবন-যাপন কীভাবে করবো, সে ব্যাপারে অত্যল্প কিছু নিকেনির্দেশনা ছাড়া তেমন কিছু নেই এতে। মনে হলো আমি যেনো একটি গল্পের বই পাঠ করছি।

বাইবেল সম্পর্কে আমার মধ্যে যে ছাপের সৃষ্টি হয়েছে, তা ভুল মনে করে আমি স্থানীয় একটি চার্চের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আবদার জানাই তাদের ওখানে ধর্মীয় প্রশিক্ষণে যোগ দিতে। তবে তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎই ছিলো শেষ সাক্ষাৎ! এরা ছিলো ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান- যারা ব্যস্ত ছিলো হলি স্পিরিট থেকে কীভাবে 'উপহার' পাওয়া যায় সে চিন্তায়!

আমার নিকট এসব ব্যাপার ছিলো অতিবেশী বাহ্যিক। আমি চাচ্ছিলাম এমন এক ধর্ম যা আমি ধরে রাখবো সর্বদা আমার হৃদয় মাঝে। ভুতপ্রেত ও মৃত ভাষার মাধ্যমে খুঁজে কিছু বের করার পক্ষে আমি নয়।

এবার আমি খ্রিস্টবাদের সহোদরা ইয়াহুদিবাদের দিকে মনোনিবেশ করি। আমাকে সর্বদা বলা হতো এটিই হচ্ছে 'সত্য' ও মানবের প্রথম ধর্ম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানেও আমার কোনো স্থান মিলে নি- কারণ মাতা

ইয়াহুদি ছিলেন না। দীক্ষিত হওয়া সম্ভব হলেও কিন্তু ইয়াহুদিদের অধিকাংশ তা মানতে নারাজ। এছাড়া ইয়াহুদিরে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিলো, তারাই নাকি 'গডের নির্বাচিত' মানুষ। ব্যাপারটি আমার মোটেই মনঃপুত হলো না। আমি ভাবতেই পারি নি, গড তার মমোনীত ধর্ম শুধুমাত্র একটি বিশেষ দলের নাগালে রাখবেন- এরপর তাদের পাপ বা পুণ্যের কারণে শুধু তাদেরকেই বেহেশতে স্থান দেবেন- তাদের জন্মগত অধিকার হেতু! এটা মোটেই উচিৎ বলে মনে হয় নি। আর এরূপ গড তো অন্য কিছু হতে পারেন- কিন্তু সৃষ্টিকর্তা গড হতে পারেন না। সুতরাং দ্বিতীয়শ্রেণির ইয়াহুদি হতে আমার মন চাইলো না।

তারপর আমি শুরু করলাম ধর্ম নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন। যতো ধর্মই আমার জানা ছিলো সবগুলো সম্পর্কে বই-পুস্তক পাঠ করতে লাগলাম। হিন্দুইজম, বৌদ্ধবাদ, তাওইজম, কনফিউশিয়াইজম, হারে কৃষ্ণা ... ভালো বা মন্দ সব ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানলাম। তবে জানার গতি থেকেও দ্রুত গতিতে এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সব তথাকথিত 'ওয়ার্লড ধর্ম' নিয়ে গবেষণা করলেও 'ইসলাম' সম্পর্কে তখনও কিছুই জানতাম না। ইসলাম নামে যে কিছু ছিলো, সেটাও জানতাম না!

ইসলাম সম্পর্কে এই অজ্ঞতার রহস্য এখন আমার নিকট উদঘাটন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছিলেন, সত্যধর্ম ইসলামকে জানার পূর্বে সকল বাতিল ধর্ম সম্পর্কে আমাকে অবগত করা। তাঁর ইচ্ছা ছিলো শেষ পর্যন্ত যখন ইসলামকে পাবো তখন এর প্রতি ১০০% বিশ্বাস জন্মাতে।

এ সময় আমি জীবনের খুব কঠিন পর্যায় পার করছিলাম। আমি কলেজে লেখাপড়ায় লেগে যেতে চেষ্টা করি, সক্রিয় এক মেয়ের মাতা ছিলাম, প্রিয় দাদী ছিলেন ভীষণ অসুস্থ, সংসারকাজ ছিলো কঠিন, স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিচ্ছিলাম এবং সর্বাদিক ভয়ানক ব্যাপার ছিলো গড থেকে দূরে থাকা। আমার মধ্যে কোনো ধর্মবিশ্বাস অবশিষ্ট ছিলো না, শুধুমাত্র একজন প্রভু আছেন এ বিশ্বাস ছাড়া। আমি মূলত 'শূন্য স্লেটে' পরিণত হয়েছি।

অতীতে গড সম্পর্কে যেসব ধারণা মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, আমি সব হারিয়ে ফেলি। শুধুমাত্র এটুকু ছাড়া, নিশ্চয়ই তিনি অস্তিত্বশীল। এর ওপর

ভরসা করেই আমি তাঁর উপাসনা করেছি। সার্বক্ষণিক এ উপাসনার মাধ্যমে আমি বার বার তাঁর নিকট পথপ্রদর্শনের আবদার জানিয়েছি।

কয়েকমাসের এক অসহ জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে আমি যৌক্তিকভাবে তাঁর অনুসন্ধান করেছি। আমি যুক্তি খাঁড়া করি যে, যদি কোনো গডের অস্তিত্ব থেকে থাকে, অবশ্যই তাঁর নিজস্ব একক পদ্ধতিতে তাঁকে জানার পথ আমাদের মাঝে উন্মোচন করবেন। এমন এক রাস্তা, যার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে তাঁর সাথে সম্পর্ক হবে ও আমরা তাঁকে সর্বদা উপাসনা করবো। ঐ ধরনের নয়, সপ্তাহে একবার তাঁকে স্মরণ করলাম, উপাসনা করলাম এরপর বাকি ছয়দিনের জন্য তাঁকে ভুলে রইলাম- যেরূপ খ্রিস্টানরা করে থাকে।

সর্বোপরি আমার মনকে আমি বললাম, 'এক গড, এক রাস্তা'। সব ধর্মই গড সম্পর্কে দাবি-দাওয়া করে, অথচ বিভিন্ন রাস্তার উদ্ভাবন করেছে। না, গড পর্যন্ত পৌছুনোর এতে বেশি রাস্তা থাকার কথা নয়- একটিমাত্র রাস্তাই আছে। এছাড়া আমি এটাও দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করি যে, গডের রাস্তা হতে হবে সবার জন্য, সর্বকালের জন্য। কেউ বিশেষ ছিলো না, না কাউকে নির্বাচিত করা হবে এবং না কাউকে বাদ দেওয়া হবে গডের রাস্তা থেকে।

আমি গডকে দয়ালু হিসেবে বিশ্বাস করতে পারি না, তিনি যদি সৃষ্টির শুরু থেকেই তাঁর মনোনীত ধর্মকে মানুষকে না জানিয়ে থাকেন। তবে, আদমসৃষ্টির সময় থেকেই কোনো একটি 'গোপন' জিনিষ ছিলো যা আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম না। আমার অনুসন্ধানের শুরু থেকেই আমি এটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অথচ এটাই ছিলো সবকিছুর চাবিকাঠি।

আমার পরিবারের মধ্যে সমস্যা আরো জটিল হলো। আমার ভাই ছিলো এ্যালকাহলিক (মদ্যপ)। সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে- মাঝে মাঝে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আজেবাজে বকে। আমার মা কিন্তু সর্বদাই তার দলে থাকেন। আমি খুব বেশি চাপে ছিলাম। লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পেরে কলেজ ছেড়ে দিলাম। এদিকে নিজের মেয়েকে ক্লাসে পড়ালেখা করাতে ডে-কেয়ারে (অন্যের তত্ত্বাবধানে) রেখে দিতে হয়েছে। আমি চাচ্ছিলাম তাকে সার্বক্ষণিক দেখভাল করবো। দাদী ইতোমধ্যে মারা গেছেন। দাদার শরীরিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। একদিন ভোরে

তার ইজিচেয়ারে বসাবস্থায় নিজে নিজেই জ্বলন্ত সিগার ফেলে কক্ষের ভেতর আগুন ধরিয়ে দেন। এতো ভোরে ধোঁয়া এলার্ম বেজে ওঠায় মনে করছিলাম হয়তো স্বপ্ন দেখছি। নার্সারি কক্ষ থেকে আমার মেয়ে যখন 'মমি! মমি!' বলে চিৎকার দেয় তখনই আমি জেগে উঠি। বেডরুমের দরোজা খলুতেই দেখতে পাই সমগ্র ঘর কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। আমি মেয়েকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে চললাম বাইরের দিকে। ডাক দিলাম পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরও। ফায়ার ইঞ্জিন আসলো বটে- কিন্তু তখন আমার ভাই ঐ পুড়ে যাওয়া দাদার ইজিচেয়ার বাইরে নিয়ে এসেছে। আমার দাদাকেও সে টেনে বাইরে নিয়ে আসে।

এদিন থেকেই সবাই ভাবলো, আমার দাদাকে ২৪ ঘণ্টা দেখভাল করতে হবে। মা সিদ্ধান্ত নিলেন দাদাকে 'বৃদ্ধনিবাসে' পাঠিয়ে দেবেন। সুতরাং আমার ডিউটি কিছু ছিলো না। এবার বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যত্র থাকাতে হবে। মা বললেন, আমার জীবনে তুমি ও তোমার মেয়ের জন্য আর কোনো স্থান নেই!

আমি নিজেকে অসহায় আহত পাখির মতো দেখতে লাগলাম। সবদিক থেকে অন্ধকার নেমে আসছিলো। টাকার অভাব, স্বামীকে তালাকের প্রক্রিয়া, মেয়েকে মানুষ করা, স্বামী চাচ্ছিলো তাকে নিয়ে যেতে নিজের নিকট। কোনো কাজ না পেলে বেঁচে থাকা কঠিন হবে ভাবছিলাম। আমি নিজেকে একা দেখলাম। আমার কেউ নেই সাহায্য করার। মনে হচ্ছিল আমি একটি চুতুর্ভূজ আকারের আলপিন, যাকে একটি বৃত্তাকার গর্তে হাতুড়ি মেরে জোর করে ঢুকানোর চেষ্ট হচ্ছে! আমার দাদি মারা যাওয়ার পর পরিবারে আমার কোনো স্থান ছিলো না। ক্রমে আমাকে পুশাউট করা হচ্ছিলো। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আমি পুনরায় গডের দিকে মনোনিবেশ করলাম। আমার সকল সমস্যার সমাধান পেতে আবদার জানালাম।

একদিন ঘরের মধ্যে একাকী ছিলাম। আমার মেয়ে ছিলো তার পিতার সাথে। মা ও ভাই কোথাও বেরিয়ে গেছেন। আমার থাকার কক্ষের নিরবতায় উপাসনায় লেগে যেতে নিজের মধ্যে এক উচ্চ অভিলাষ অনুভব করি। কিন্তু

কীভাবে করবো? কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি অসহায় অবস্থায়- কী করবো ভাতবেই পারি নি।

আমি দঁড়ানো ছিলাম নিরবে। যেনো অপেক্ষা করছিলাম কেউ আমাকে নির্দেশনা দেবে- কীভাবে প্রার্থনা শুরু করবো? হঠাৎ ধারণা এলো, প্রভুর সঙ্গে আলাপ করার পূর্বে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। তাই যেনো কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাকে নিয়ে গেলো শাওয়ার রুমে। শাওয়ারের সময় মাথা থেকে পা পার্যন্ত ভালো করে ধুঁয়ে নিলাম। কক্ষে ফিরে আসলাম।

এবারও মাঝকক্ষে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারোর জন্য বা কোনো ইশারা-ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিলাম। আরেক ধারণা আসলো মনের মাঝে। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে ইচ্ছে হলো। পুরো দেহকে একটি জামা দ্বারা আবৃত করলাম। কিন্তু আমার মাথাও ঢাকাতে হবে ভেবে, একটি রুমাল দ্বারা মাথা ঢেকে নিলাম। এবার আয়নার দিকে চেয়ে নিজের চেহারা দেখতে পেলাম। অদ্ভুত হলেও নিজেকে যেনো ভদ্র-অনুরক্ত এক নারী হিসেবে মনে হলো। আর যদিও তখনও আমি কোন মুসলিম নারীকে দেখি নি বা তারা কীভাবে বস্ত্র পরতো- আমি কিন্তু একজন মুসলিম হিজাবপরা নারীর মতো গয়ে গেছি!

ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত কেউ যদি এ সময় আমাকে দেখতো তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতো, একজন মুসলিম নারী নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! তখনও আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলাম না।

সুতরাং, আমি বস্ত্র পরে পাক-পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলাম প্রার্থনা করতে। তবে এখনও জানি না, কীভাবে কী করবো। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। এক সুন্দর রৌদ্রময় দিন ছিলো। আমি হাঁটুগেড়ে বসতেও চাচ্ছিলাম না। কারণ এটা চার্চের ভেতরে করা হয়। আমি চাই তাঁর সম্মুখে আরো বেশি বিনয়াবনত হতে। আমি চাচ্ছি আমার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করতে। আমি ভাবলাম, এজন্য ফ্লোরের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে থাকাই উত্তম।

এ ধারণা থেকেও চার্চের দৃশ্য ভেসে উঠলো। যখন পাদ্রী ও নানগণ শপথ নেয় তাখন তারা নিজেকে মাটির ওপর দুহাত প্রসারিত রেখে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে- যেমন একটি ক্রুশ। সুতরাং এটা করাও ঠিক হবে না ভাবলাম। আমি কীভাবে আমার প্রভুর সম্মুখে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবো বিনয়ের সাথে তা তখনও চিন্তা করতে পারি নি।

এরপর হঠাৎ এক ধারণা জন্মালো অন্তরে। আমি হাঁটুর ওপর ভর করে নিচের দিকে যাবে ও মাথা মাটিতে রাখবো। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো আমার বেডরুমের ফ্লোরটি পবিত্র না-ও হতে পারে। সুতরাং নিয়ে আসলাম একখণ্ড ধৌতকরা ব্লাঙ্কেট। সেটা বিছিয়ে দিলাম। প্রস্তুতির ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলাম। আমি একমাত্র প্রভুর প্রতি ধ্যানস্থ হয়ে প্রথমে হাঁটু দুটো ফ্লোরের ওপর রাখলাম। এরপর উপরের দেহাংশ নিচের দিকে নামিয়ে মুখমণ্ডল ফ্লোরে লাগিয়ে দিলাম। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলো। ধ্যানস্থ অবস্থায় আমার চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে। অশ্রুজলে নিচের ব্লাঙ্কেট পর্যন্ত ভিজে গেলো।

এ অবস্থায় আমি যেনো অনুভব করি আমার প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরা অব্যাহত থাকে। আমি পরে বুঝতে পারলাম, মহান আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি সেদিন এক বিশেষ নিয়ামত দান করেছিলেন। এক মহাসত্যের সন্ধান দিয়েছেন। এদিনের পরই আমার সকল প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

এ 'সিজদা'র কথা মনে পড়লেই আমার শরীরে আজো শিহরণ জেগে ওঠে। পরে জানতে পারি সেদিনের এ সিজদার সময় কয়েকটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিলো: (১) মুসলিম নারীদের মতো নামায পড়ার পূর্বে গোসল-অযু, পবিত্র কাপড় পরিধান, মাথা ঢাকা, পবিত্র মুসাল্লাহ (ব্লাঙ্কেট টুকরো) ইত্যাদি সব ধরনের সঠিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম নিজের অজান্তে। (২) সিজদার জন্য যে ব্লাঙ্কেট বিছিয়ে ছিলাম তা ছিলো সরাসরি কিবলার দিকে। সুবহানাল্লাহ! সেদিন আমার অজান্তেই ইসলামের নিকদির্শেনা অনুসরণ করে মহান আল্লাহর সম্মুখে একটি সিজদা দিয়েছিলাম।

আমার মা ছুটিতে যেতে বেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠলেন। যে কারণেই হোক, বাইরের দিকে সময় কাটতে থাকে অপেক্ষকৃত অনেকটা শান্তির মাঝে। তবে

আমার মন আরো বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠেছে। আমি এখন আকুল হয়ে খুঁজছিলাম আমার সত্যধর্মকে।

এরপর একদিন একটি বড়ো দলের সঙ্গে এক ভোজসভায় যোগ দিই। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটলো নাইজেরিয়ান এক ব্যক্তির সঙ্গে। তার পরনে ছিলো খুব লম্বা একটি রঙ্গিন জামা। মাথায় শুভা পাচ্ছে ইয়াহুদিদের ইয়ারমুলকির মতো অনেকটা বড়ো একটি টুপি। হাস্যোজ্জ্বল এ দয়ালু-মুখো ব্যক্তিটি আমার পাশে বসা ছিলেন। তিনি প্রথমেই স্কুল নিয়ে কথা শুরু করলেন।

এরপর খাবার ওর্ডারের সময় বললেন, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কী খাবো বুঝতে পারছি না- তবে আমি শূকরের মাংস ভক্ষণ ও এ্যালকাহল পান করতে অপারগ। খাবার ওর্ডার করে আমি জিজ্ঞেস কলাম, আপনি শূকরের মাংস ভক্ষণ ও এ্যালকাহল পান করেন না- কোন কারণে? হসিমুখে তিনি জবাব দিলন, আমার ধর্মের কারণে।

জানতে চাইলাম, 'এটা কোন ধর্ম?' আমি বেশ সজোরেই কথাটা জিজ্ঞেস কলাম। তিনি বললেন, "আমি একজন মুসলমান। আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।"

আলো, ঘণ্টাধ্বনি ও বাঁশির শিস- সবকিছু আমার মাথায় খেলে গেলো। আমি তো এটির কথা ইতোমধ্যে শুনি নি! আমি আরো জানতে খুব আগ্রহান্বিত হলাম। সূর্যের নিচের সকল ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান তো ইতোমধ্যে করে ফেলেছি, সুতরাং তাকে কী জিজ্ঞেস করতে হবে তা কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম।

"যদি মনে কিছু না করেন- দয়া করে বলুন, আপনার এ ধর্মের মুখ্য বিশ্বাসটি কী হয়? আপনার ধর্মের একটি কথা যা আপনি মনে করেন স্বীয় ধর্মকে ব্যাখ্যা দেয় সর্বাধিক উত্তমভাবে, সেটি কী?" কোন দ্বিধা ছাড়াই তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন, "আমরা বিশ্বাস একটি- গড মাত্র একজন। গড কোনো তিনের অংশ নন। না তাঁর কোনো পুত্রসন্তান আছে। তাঁর কোনো শরীক নেই। গড একক।"

শুনতে কী সহজ-সরল, ভাবতে থাকি আমি। এ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কোনো দ্বিমত নেই। বললাম, হ্যাঁ এটা তো যুক্তিসম্মত মনে হয়। এবারও তার মুখে হাসির রেখা। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, নারীদের ব্যাপারে আপনার ধর্ম কী বলে?

অসংখ্য নির্যাতনের শিকার ও ভীষণ কষ্টের মধ্যে থাকা একজন নারী হিসেবে আমি খুব আগ্রহভরে তার জবাবটি শুনতে চাচ্ছিল্লাম। এমন কিছু শুনতে চাই যা আমাকে সন্তুষ্ট করবে।

তিনি কিন্তু এবারও খুব তাড়াতাড়িই জবাব দিলেন, "ইসলামে নারীরা পুরুষের সমান। তাদের মৌলিক অধিকার ও পুরুষের মৌলিক অধিকারে কোনো পার্থক্য নেই। তাদেরকেও পাপের জন্য শাস্তিভোগ করতে হবে এবং পুণ্যের জন্য পুরস্কৃত করা হবে। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ একই কথা সত্য। তবে সমান হওয়ার অর্থ নয় নারী-পুরুষ একই। পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ তা'আলা দৈহিকভাবে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। নারীরা সমান কিন্তু ভিন্ন।"

আমি জানতে চাইলাম, এ ভিন্নতা কীভাবে প্রতীয়মান হয়? তিনি জবাব দিলেন, "ধরা যাক বিবাহের কথা। সেখানে মুসলিম মহিলাকে পুরুষ থেকে বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বামী তার খাওয়া-পরাসহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে। অপরদিকে স্বামীর আনুগত্য থাকাও স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য।"

"তার স্বামীর আনুগত্য করতে হবে ... হু। এটার অর্থ কী? তিনি হাসতে শুরু করলেন। তিনি যে এ পথে হেঁটেছেন তা পরিষ্কার ছিলো। ধৈর্যসহ বললেন, "এর অর্থ হলো, পরিবার বা বিবাহের স্বার্থে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, স্বামী তার স্ত্রীর মতামত নিতে পারে- কিন্তু অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব স্বামীর। আপনি এভাবে দেখতে পারেন, মনে করুন বিবাহ হচ্ছে মহাসাগরে চলন্ত একটি জাহাজ। জাহাজের কাপ্তান একজনই থাকতে হবে। সে-ই তো অবশেষে এ জাহাজের সকল নিরাপত্তা ও চলাচলের জন্য দায়ী। একটি জাহাজে দুজন কাপ্তান হলে এটি ডুবে যেতে বাধ্য।"

এটুকু বলে তিনি থেমে গেলেন। আমার পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষ করছিলেন। তার যৌক্তিক তর্কের বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি আমি খুঁজে পেলাম

না। আমার নিকট ব্যাপারটি আসলে যুক্তিসম্পন্নই মনে হলো। আমি মনের গভীরে সর্বদাই অনুভব করতাম, স্বামীকেই পরিবারের সকল দায়িত্ব নিতে হবে। আমি খুশি হলাম- খুশি থেকেও খুশি আসলে। তাকে ইসলাম সম্পর্কে যতো বেশি প্রশ্ন করছিলাম ও উত্তর পাচ্ছিলাম, এ আনন্দ ক্রমান্বয়ে অনুপ্রেরণার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। অন্তরে এক উত্তেজনা জেগে ওঠলো।

যাকিছু তিনি আমাকে বলছিলেন, সবই যুক্তিযুক্ত ছিলো। উত্তেজিত অবস্থায় আমি অবাকও হলাম এই ভেবে যে, এ মহান ধর্ম সম্পর্কে কীভাবে আমি এতো কালব্যাপী সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গেলাম? আশ্চর্য! সুবহানাল্লাহ! সবিকিছুই ঘটে আল্লাহর ইচ্ছায়।

আমি তাকে জিজ্ঞেস কলাম, এ ধর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানবো কীভাবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে আমার মসজিদের কিছু মুসলিম নারীদের সঙ্গে পরিচয় করে দেবো। মসজিদে যাবার পর তারা আপনাকে কুরআনসহ কিছু বই-পুস্তক দিবেন ও প্রশ্নগুলোর জবাব দান করবেন। তিনি আমার ফোন নাম্বার লিখে নিলেন। বললেন, আমি আপনাকে ফোন করবো- কথা দিলাম। আমি খুব আনন্দিত, উত্তেজিত হয়ে ওঠলাম। আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

পরের সোমবার আমি ছুটে গেলাম স্থানীয় লাইব্রেরিতে। তখনও খোলা হয় নি। দাঁড়িয়ে থাকি বারান্দায়। খোলার পর ভেতরে ঢুকে ইসলামের ওপর যতো বই চোখে পড়লো সবই ধার করে নিয়ে আসলাম। তবে দুঃখের বিষয় সে সময় ইসলাম ধর্মের ওপর লিখিত ইংরেজি গ্রন্থাদির সংখ্যা খুব নগণ্য ছিলো। যেগুলো ছিলো তাদের অর্ধিকাংশ নেতিচাবক- যা সেসময় আমি বুঝতে পারি নি। সঠিক তথ্যসম্মৃদ্ধ বই ছিলোই না মোটের ওপর।

একটি বই খুলে দেখলাম, প্রথমেই লিখা আছে: “ইসলাম অর্থ হচ্ছে গডের ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করা।” কী আশ্চর্য! এই তো সেই শব্দটি ‘submission’ (আত্মসমর্পণ)! এ শব্দটির কথাই আমি কল্পনা করেছিলাম, কিন্তু তখন ইসলাম কী ছিলো জানতাম না।

আমি শুধু জানতাম, শান্তি পেতে হলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। উক্ত কথাটি পাঠ করেই আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে, অবশেষে আমি সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি! আমি সবগুলো বই পড়ে শেষ করলাম। এরপর আবার নিজের কথামতো নাইজেরিয়ান সেই আহমদ নামক ব্যক্তি আমাকে ফোন করলেন।

তিনি আমাকে সেই মসজিদের ঠিকানাসহ এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নাম্বার দিলেন। খুব উত্তেজিতভাবে আমি নাম্বারটি ডায়াল করলাম। একজন ফোন ধরলেন। পুরুষ লোকটি ভারী বিদেশি উচ্চারণে আমাকে জানালেন, আপনি যাকে চান সে এখন নেই। সাহস না হারিয়ে বললাম, আমি ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশি জানার ব্যাপারে আগ্রহী। তিনি সাথে সাথে বললেন, আপনি ওয়েলকাম। ঠিকানা লিখে রাখুন। চাইলে এক্ষুণি আসতে পারেন। আমি আপনাকে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ দেবো।

আমি কতো যে আনন্দিত হলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ঐদিনই বিকেলে তার সাথে সাক্ষাতে যেতে কথা দিলাম। এরপর উৎসাহভরে আমি ও আমার মেয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম মসজিদে যেতে।

সে দিনটির কথা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়। আমি চাচ্ছিলাম নিজেকে খুব ভালোভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে নিতে। আমি একটি লম্বা ড্রেস পরলাম, মাথা আচড়ালাম, মুখমণ্ডলে মেকআপ লাগালাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম। এক বছর বয়স্কা আমার মেয়েকে ভালোকরে সাজিয়ে দিলাম।

আমি জানতাম, আজ আমরা উভয়ে একটি নতুন জীবনের দিকে পাড়ি জমাচ্ছিলাম। মেয়ে ও আমি উভয়ে মিলে একটি টীম! মসজিদে পৌঁছুয়ে যে মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তিনি ছিলেন একজন নেকাব পরনে নারী। আমি দেখলাম, তিনি ছিলেন চমকপ্রদ এক বিদেশি সুন্দরী মহিলা। আমি তাকে জানালাম, আবদুল হামিদ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছি।

তিনি আমাকে আদবের সঙ্গে একটি সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন- “ওদিকে। আপনি তাকে উপরের অফিসে পাবেন।” তিনি সুস্পষ্ট ইংরেজিতে

কথা বলছিলেন। আমি এতে বেশ অবাক হলাম। আমি এসেছি ইসলামকে জানতে- এটাতো দেখছি বিদেশি কোনো ধর্ম নয়। শুনেছি এটাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক দ্রুত বর্ধিত ধর্ম। আমি অনেককিছু তখনও জানতাম না। তবে একটা ব্যাপার সত্য ছিলো- আমি অবশ্যই সঠিক পথে এগুচ্ছিলাম।

অফিসকক্ষে ঢুকার সাথে সাথে উপস্থিত সবার মাথা আমার দিকে ঘুরে গেলো। তারপর সকল চোখ নিচের দিকে নামলো। কেউ সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো না। কিন্তু সবার মুখে ফুটে ওঠেছিলো হাসির রেখা। উষ্ণ, আনন্দঘন, আন্তরিক হাসিমুখ।

এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসলেন। একটি অপরিচিত শব্দ দুবার উচ্চারণ করলেন: মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ! তিনি আমার মেয়েকে তুলে নিলেন কোলো। “কী সুন্দর মেয়েটি!” তিনি অন্যান্যদের কাছে আমার মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এ অজানা ব্যক্তির কোলো আমার মেয়েকে দেখেও কেনো যেনো আমি ভয় পেলাম না। তিনি তাকে একটি টেবিলের ওপর বসালেন। তার হাতে দিলেন একটি পেন্সিল ও কিছু কাগজ। হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বললেন। অন্যান্য পুরুষরাও মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়ালো। সবাই যেনো কোনো হারানো আপনজনকে ফিরে পেয়েছে। এরপর আবদুল হামিদ নামক ব্যক্তি এগিয়ে আসলেন। আমাকে স্বাগত জানালেন নিজের পরিচয় দিয়ে।

আমি আমার হাত এগিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি বুঝালেন হাতটি দেখেন নি। আহ! আরো কতো কী যে বাকী আছে শিক্ষার! তিনি বললেন, আপনি ইসলামকে কীভাবে আবিষ্কার করলেন? আমি তাকে নাইজেরিয়ান আহমদের কথা জানালাম। তিনি এবার ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির ওপর কথা বলা শুরু করলেন।

অন্তত ঘণ্টাখানেক চলে গেলো। এরপর তিনি কুরআন শরীফের একটি ইংরেজি অনুবাদ আমার হাতে তুলে দিলেন। অনুরোধ জানালেন, বাড়িতে যেয়ে গোসল সেরে এটি খুলে পাঠ করবেন। আমি সাথে সাথে সম্মতি জানালাম। তিনি বললেন, শীঘ্রই নামাযের সময় হবে- সুতরাং প্রস্তুতি নিতে

হবে তাকে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তবে একটি শেষ আবেদন করি। বললাম, কীভাবে আপনারা নামায পড়নে তা একটু দেখবো। ভাবলাম, একজন নাস্তিকের স্ত্রী আমি- কখনও স্বামীকে উপাসনায় দেখার সুযোগ হয় নি। আমি সর্বদাই ভাবতাম, একজন পুরুষ সত্যিকার পুরুষই হতে পারে না, যদি না সে তার প্রভুর সম্মুখে প্রার্থনায় দাঁড়ায়। দেখে নেবো এবার পুরুষরা কীভাবে প্রার্থনা করে।

আবদুল হামিদ বললেন, সমস্যা নেই। আপনি মসজিদের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন- তবে অনুগ্রহ করে কোন শব্দ করবেন না। আমরা সবাই নিচের তলায় গেলাম। এক শূন্য বড়ো কক্ষের পেছনে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। দেখলাম সমস্ত ফ্লোরের ওপর খুব সুন্দর কার্পেট বিছানো আছে। দেয়ালে টাঙ্গানো আছে একখানা কারুকার্যযুক্ত বড়ো কার্পেটের টুকরো।

লক্ষ করলাম সামনের দেওয়ালে লাগানো আছে আরেক টুকরো রঙ্গিন কাপড়- যেখানে কাবা শরীফের ছবিসহ এ্যারো দিয়ে দেখানো আছে কিবলার দিকটি।

পুরুষগণ ভেতরে প্রবেশের সময় একটি উচ্চ ধ্বনি শুনে আমি কেঁপে ওঠি। সেটা ছিলো উপাসনার জন্য আহ্বান- মুয়াজ্জিনের কণ্ঠের আযানধ্বনি: আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! এ শব্দগুলোর শুনার সময় মনে হচ্ছিলো যেনো আমার প্রতিটি ধমনীর ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবহমান হচ্ছে গলিত বরফের পানি! মনে হাচ্ছিলো, এ অতিসুন্দর, চমৎকার ডাক আমার আন্তরাত্মা ও চেতনাকে জাগ্রত করে তুলছে। সুবহানাল্লাহ!

যদিও আমি একটি শব্দেরও অর্থ জানতাম না, তথাপি অনুভব করলাম এগুলো আমার সাথে কথা বলছে। আমার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে গেলো। দেহে শুরু হলো কম্পন। আমি হাত দুটো প্রসারিত করলাম, নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি।

আমার চোখের পানি অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে যখন দেখলাম সারিবদ্ধাভাবে দাঁড়ানো পুরুষগুলো রুকুতে গেলেন। এরপর সিজদা- আহ

কী অপূর্ব! ঐ তো সে সিজদা যা আমি এক রৌদ্রময় দুপুরে দিয়েছিলাম একাকী আমার থাকার কক্ষে। আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। আন্তরাত্মায় এ কী রোমাঞ্চকর ভাব জাগ্রত হলো? ভাষায় যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। আমি কী অবশেষে ফিরে এসেছি নিজের আবাসস্থলে ... আমার আসল বাড়িতে!

পরবর্তীতে কয়েক সপ্তাহব্যাপী আমি এ মসজিদে এসে অনেক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি ও ইসলামের পাঠ গ্রহণ করেছি। আমি ক্রমান্বয়ে ইসলামী বস্ত্র পরিধান শুরু করি। আমার মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। আমি এ্যালকাহল পান ও শূকরের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিই। আমার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসে। আমি অনেকটা অল্পভাষী ও শান্ত হলাম। আমি ছিলাম প্রশান্তির মাঝে। আমার মা আমার মধ্যে পরিবর্তন দেখে প্রশ্ন করলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমি বিষাদগ্রস্থ হয়ে গেছি। বললেন, "তুমি আজকাল হাসছো না যে?" আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করি, নীরবতার মাঝেও আমি অনেকটা সুখি আছি মা।

অবশেষে আমি সাহস পাই তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করার। আমি তাকে বললাম, মা তোমার জন্য একটি ইসলামী ড্রেসও আমি বানিয়েছি। তিনি সাথে সাথে বললেন, এগুলো আমি ঘৃণা করি!

আমার মাতা সর্বদাই উচ্চ ফ্যাশরের প্রতি আকর্ষিত ছিলেন। তিনি মুসলিম মহিলাদের পরা সাধারণ মোটাসোটা জামা-কাপড় কখনও পছন্দ করেন নি। তিনি বলতেন, এগুলো দেখতে বস্তার মতো লাগে। তার এসব নিষ্ঠুর কথা দ্বারা আমি আহত হতাম- তবে ধৈর্য হারাতাম না। আমি কোনো কিছু দ্বারা ইসলাম থেকে আলাদা হবো না।

তবে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করার পূর্বের সর্বশেষ ক্রিসমাস ছিলো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো। এসময়ও আমি বুঝতে পারি- এটা ছিলো আল্লাহর পরিকল্পনা মাত্র যাতেকরে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন।

আমার মাতা আমার ওপর ভীষণ রাগ করলেন, সঠিকভাবে ক্রিসমাস পালনে আমাকে আগ্রহী না দেখে। এদিকে আমার মাতাল ভাইও একদিন রাগের অতিশয্যে আমার কক্ষের সবকিছু তছনছ ও নষ্ট করে দিলো। এমন কি আমকে হত্যা করারও হুমকি দিলো। সে আমার কক্ষে ঢুকে ইসলামী ড্রেস পরাবস্থায় আমাকে পেয়ে এমন ব্যবহার করেছিলো। নিজে কোনোদিন চার্চেও যায় নি- তথাপি আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্তে সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে।

তবে, আল্লাহর শুকুর- তারা যতোই আমার বিরোধিতা করছিল না কেনো, আমি ততোই বেশি দৃঢ় হয়ে ওঠি নিজের সিদ্ধান্তের ওপর বহাল থাকতে। আমি জানতাম, সঠিক রাস্তায় হাঁটছি। আমি আর চাচ্ছিলাম না তাদের মতো আরো এক মুহূর্তও জীবন কাটাতে।

এর মাস-দেড়েক পরই আমি পবিত্র শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণ করে ইসলামকে গ্রহণ করে নিই। সেদিন ছিলো বসন্ত মওসুমের এক শুক্রবারের সন্ধ্যা। আমি মুসলমান হয়ে যাই। গ্রহণ করি কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ের সাথে ইসলামের উপহারকে।

এবার আমার মা ছাপ সৃষ্টি করলেন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় আমার জন্য একটি বাসগৃহ যোগাড় করে দিলেন। যে সন্ধ্যায় আমি শাহাদাতের বাক্যটি উচ্চারণ করি, সেদিনই এক মিশরী পুরুষ আমাকে তাঁর জীবনসাথী হতে প্রস্তাব দেন।

আমার ওয়ালী (ঐ ব্যক্তি যিনি প্রথমদিন মসজিদে যাওয়ার পর আমার মেয়েকে কোলো তুলে নিয়ে আদর করেছিলেন) আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমার একমাত্র চিন্তা ছিলো, লোকটি তো সত্যিকার আমলকারী মুসলমান? ওয়ালী নিশ্চিত করে বললেন, অবশ্যই। ব্যস। আমি সম্মত হলাম।

প্রস্তাবের মাত্র ১০ দিন পরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাল মিশরীয় পুরুষের সঙ্গে এবং মেয়েকে নিয়ে নতুন বাসগৃহে চলে আসি। আমার স্বামী মেয়েটিকে নিজের কন্যার মতোই বড়ো করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! ইতোমধ্যে আমরা আরো দুটো পুত্র সন্তান পেয়েছি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আজ থেকে ২৬ বছর পূর্বে আমি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। মনে হলো দিনগুলো যেনো খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছে। সর্বদাই সবকিছু সহজ-সরল ছিলো- তা কিন্তু নয়। তবে, সার্বিকভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হই নি কখনও।

যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাকেই পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেন। তবে যেমনটি তিনি কুরআনে বলেছেন: "দুঃখের পরই সুখ আছে", এটাই আমার ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অপরদিকে, আমার মা যিনি বহুদিন পূর্বেই আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, এখন আমার সাথেই একটি মুসলিম দেশে বাস করছেন। তিনি স্বেচ্ছায় হিজাব পরছেন! আমি আশা করছি তিনিও একদিন ইসলামকে আলিঙ্গন করবেন ইনশাআল্লাহ!

এতো দুঃখ কষ্টের শিকার হয়েও এখন আমি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনোভাবে বেঁচে থাকার কল্পনাও করতে পারি না। আমি প্রত্যহ আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যিনি তাঁর অনুগ্রহ হেতু এ অধমকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পথপ্রদর্শন করেছেন। আমাকে স্থান দিয়েছেন ইসলামের চিরন্তন সুশীতল ছায়ায়। আল-আমদুলিল্লাহ![৮৩]

[৮৩] https://www.islamreligion.com/articles/2388/viewall/iman-yusuf-ex-catholic-usa/

সুজান কারল্যান্ড আলী

প্রাক্তন খ্রিস্টান - অস্ট্রেলিয়া

তিনি বলেন: আচ্ছা বলুন তো, আমার প্রিয় মাতা যদি আপনাকে বলেন: "তুমি যদি একজন ড্রাগ ব্যবসায়ীকেও বিয়ে করো তাতে পরোয়া করি না- তবে কখনও কোনো মুসলিমকে বিয়ে করবে না!" তাহলে কী ভাববে?

এ কথাটিই বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান নও-মুসলিম সুজান কারল্যান্ডকে তার মাতা, যখন তিনি ১৭ বছর বয়সের বালিকা মাত্র। এ উপদেশটি আসে যখন সুজান নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা হিসাবে বললেন, "আমি অন্যান্য ধর্ম নিয়ে অনুসন্ধান চালাবো।"

অবশ্য অনুসন্ধানের লিস্টে ইসলাম ছিলো না। কারণ তিনি প্রায়ই বলতেন, "এটি একটি সন্ত্রাসী, যৌনবৈষম্যশীল ও বিদেশী ধর্ম"। কিন্তু মাত্র দুই বছর পর যখন তার বয়স ১৯, খ্রিস্টান ব্যাপ্তিস্ট সুজান ইসলামকে গ্রহণ করে নেন। তিনি বলেন, আমাকে কোনো পুরুষ প্রভাব ফেলে নি!

এই একই মেয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'ফাংকি, হ্যাপি, ক্ল্যাপি চার্চ' নামক একটি হাস্যকর সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন। তাকে অন্যান্য সদস্য এসে বলতো, গড রাতের বেলা তাদের সাথে কথা বলেছেন।

এক সন্ধ্যায়, সুজানের মাতা ঘোষণা দিলেন আজকের রাতের খাবার হবে শূকরের মাংস। তখনই সর্বপ্রথম সুজানের মাতা আবিষ্কার করেন, তার মেয়ে ইসলামের 'বলি' হয়েছে! সুজান নিজেই বলেন, "আমার মাতা আমাকে আলিঙ্গন করলেন। একই সময় তিনি কাঁদছিলেন!" এর কদিন পরই সুজান হিজাব পরা শুরু করেন।

এরপর দীর্ঘ আট বছর পার হয়েছে। মা ও মেয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবে, ইদানিং আবার উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হেয়েছে। সুজান বলেন, "এখন, আমার মাতা আমার জন্য হিজাবও ক্রয় করেন এবং বাচ্চাদের জন্য

উপহার সামগ্রীও পাঠিয়ে দেন ঈদের সময়।” সুজান বলেন, “ইসলাম, এটি মন, দেহ ও আত্মার মধ্যে বুদ্ধিভিত্তিক পার্থক্য দেখে না- যেভাবে দেখে থাকে খ্রিস্টবাদ।” তিনি বলেন “ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আরেক কারণ হচ্ছে, এ ধর্মে আল্লাহর স্বরূপ এমন ছিলো যার দ্বারা আমি আভিভূত হই।”

সুজান কারল্যান্ড বিএবিএসসি ডিগ্রি লাভ করার পর ২০০৭ সালে এমএসসি শেষ করে বর্তমানে পিএইচডি করছেন। তার গবেষণার বিষয় হচ্ছে, নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে পশ্চিমা মুসলিম মহিলারা।

সুজান মেলবর্নের মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব পলিটিক্যাল এন্ড সোসিয়েল ইনক্যুারিতে একজন লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। তার বিশেষায়িত্ব বিষয়গুলো হচ্ছে লিঙ্গ অধ্যয়ন, ইয়ুথ ও ধর্মীয় সামাজিকতা।

তিনি ইসলাম ও মুসলিমদেরে ভালোবাসেন। বলেন, “নিঃসন্দেহে, আমার জীবনে সর্বাধিক প্রেরণাদানকারী ও মনোমুগ্ধকর যেসব মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে তারা সবই হচ্ছেন মুসলিম। এদের কারণেই আমি কমিউনিটি থেকে কখনও দূরে সরে যাই নি।”

সুজান ২০০২ সালে মেলবর্ন চিড়িয়াখানায় মেলবর্নের ওয়ালিদ আলী নামক একজন আইনজীবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ওয়ালিদ আলী ইসলামিক কাউন্সিল অব ভিক্টোরিয়া নামক একটি সঙ্ঘের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য। অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম নেওয়া ওয়ালিদের মাতা-পিতা মিসরী অভিবাসী। আইনবিষয় ছাড়াও তার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী আছে। শহরের একটি বড়ো আইনব্যবসার কর্মী তিনি। তবে মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল লেকচারার হিসেবেও কাজ করেন ওয়ালিদ। তিনি গ্লোবাল টেরোরিজম রিসার্চ সেন্টারেও কাজ করছেন।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ান ফিউচার ডাইরেকশন ফোরামের সদস্য হিসেবে ওয়ালিদকে নির্বাচিত করা হয়। ৯০ সদস্যের এ ফোরামের কাজ হচ্ছে আগামী ২০ বছরের অস্ট্রেলিয়া কোন দিকে অগ্রসর হবে সে ব্যাপারে গবেষণা করা। দ্যা বুলেটিন নামক একটি ম্যাগাজিন তাকে ‘স্মার্ট ১০০’ এর তালিকাভুক্ত করেন। ওয়ালিদ ‘People Like Us’ নামক একটি

গ্রন্থর লেখক। সুজান ও ওয়ালিদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিয়েছে আয়শা নামক এক মেয়েসন্তান। সুজান স্বাধীনভাবে মুসলমান হয়েছেন। তিনি ওয়ালিদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি যখন মুসলমান হই তখন ওয়ালিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিলো না। আমি অনেকটা একক স্বাধীন সিঙ্গুল নারী ছিলাম। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কয়েক বছর পরে।”

সুজান অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় টিভি নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম ‘সালাম ক্যাফে’ এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের ভাষ্যকার হিসেবে জাতীয় মিডিয়ায় প্রায়ই বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এছাড়া ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন চার্চ, সিনোগগ, স্কুল, কমিউনিটি গ্রুপ ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে সুজান নিয়মতি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ২০০৩ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভিক্টোরিয়া পার্লামেন্ট হাইজে সুজানকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি খুব সুন্দর জোরালো ভাষায় ভাষণ দান করেন।

মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর মুসলিম মাইনোরিটিজ এন্ড ইসলাম’ এর একজন গবেষক হিসেকে কাজ করার পাশাপাশি সুজান কারল্যান্ড ‘ইসলামিক কাউন্সিল অব ভিক্টোরিয়া’ এর গ্রাসরুটস নামক ইয়ুথ ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। উক্ত সংস্থাটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের যুব-মুসলিমদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করা।

সুজান ‘ট্রেইন দ্যা ট্রেইনার্স কোর্স ইন দাওয়াহ’ নামক সংস্থার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর। এছাড়া ২০০৯ সালে ‘ইউনাইটেড নেশন এ্যালায়েন্স অব সিভিলাইজেশন্স’ তাকে একজন আন্তর্জাতিক ‘মুসলিম লিডার্স অব টুমোরো’ হিসেবে ঘোষণা করে।

নিজের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে সুজান বলেন: “আমি বুদ্ধিভিত্তিক মুক্তি লাভের ইচ্ছা অনুভব করি ... এরপর আমি ইন্টারনেটে মুসলিম চ্যাটরুমে যুক্ত হই। আমাকে পরিচিত করে দেওয়া হয় কয়েকজন অভিজ্ঞ মুসলিম মহিলার সঙ্গে। তারা আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। এরা আমারই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। আমি যখন পপুলার অনবরত নেতিবাচক মিডিয়ার বদলে ইসলামকে তার নিজের ইতিহাস,

ঐতিহ্য, স্কোলার্স ও পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে পরিচয় লাভের চেষ্টা করি, তখনই একটি বিশ্বাসকে খুঁজে পেলাম যাছিলো, শান্তময়, সমধিকারী, সামাজিকভাবে ন্যায়পরায়ণ এবং আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিকতার মধ্যে অতিসুন্দর সামঞ্জস্যশীল।”

সুজান কারল্যান্ড আলী ২০০৩ সালের ‘অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম অব দ্যা ইয়ার’ হিসেবে নির্বাচিত হন। তাকে দেওয়া হয় ২০০০ ডলার প্রাইজ। তিনি এ টাকা গ্রহণ করেন দুটি শর্তের ওপর: ১. তিনি টাকাগুলো অস্ট্রেলিয়ার ভেতর ব্যয় করবেন ও ২. সব টাকা অনুদান করবেন মুসলিম ও অ-মুসলিম বিভিন্ন সামাজিক সংগঠের মাঝে।[৮৪]

[৮৪] http://aboutislam.net; https://rahyafteha.ir/en/1768/will-beloved-mother-tells-dont-care-marry-drug-dealer-dont-marry-muslim/

ডা. লরেন্স বি. ব্রাউন

প্রাক্তন নাস্তিক - আমেরিকা

যিনি জীবনের প্রথম প্রার্থনা করে ফল পেয়ে মুসলমান হলেন

লরেন্স বি. ব্রাউন আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটি কলেজ অব আর্টস এন্ড সাইন্সেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী ভাল করেন। তিনি ডাক্তারি লেখাপড়া করেন ব্রাউন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুল ও জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হসপিটালে। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত এয়ারফোর্স অফিসার। মধ্যপ্রাচ্যের একটি উচ্চমানের চক্ষু হাসপাতালের প্রধান হিসেবেও কর্মরত আছেন। তিনি আন্তঃধর্ম বিষয়ক একজন বিজ্ঞ ধর্ম বিশেষজ্ঞ হিসেবেও পুপরিচিত। ধর্মবিষয়ে অনেক বইও রচনা করেছেন। তার ইসলামগ্রহণের কাহিনী সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আসুন, তার নিজের ভাষায় এ বর্ণনাটি শ্রবণ করি।

তখন ছিলো ১৯৯০ সালের শীতকাল। আমার দ্বিতীয় মেয়ে হাসপাতালে জন্ম নেয়। জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে ডাক্তাররা তাকে নিয়ে যায় নিওনেট্যাল নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (NICU)। সেখানে নেওয়ার পর CoA নামক এক মারাত্মক রোগে আক্রন্ত বলে তাকে সনাক্ত করেন বিশেষজ্ঞরা। ডাক্তার হিসেবে এর অর্থ কী আমি জানতাম- তার হার্টের একটি প্রধান ধমনী খুব ছোট্ট। তার দেহ যথেষ্ট রক্ত পাচ্ছিলো না। প্রতিটি টিস্যু দ্রুত অক্সিজেন শূন্যতা হেতু মরে যাচ্ছিলো। বাঁচার সম্ভাবনা ছিলো প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে জেনে আমি একেবারে হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ডাক্তার হিসেবে জানতাম, আমার মেয়েটি বাঁচবে না।

ওয়াশিংটন ডিসি'র একটি পিডিয়াট্রিক হাসপাতাল থেকে কনসালট্যান্ট কার্ডিওথোরাটিক একজন ডাক্তারকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। তার আগমনের পর আমাকে আইসিইউ থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হলো। কারণ আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম।

বাইরে এসে একাকী বসে রইলাম। একমাত্র ভীতি ছাড়া আমার আর কেউ কিংবা কিছুই সাথী ছিলো না। কনসালটট্যান্টের পরীক্ষার ফলাফল কী হয়- সে ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠি। একজন নাস্তিক হিসেবে গডকে ডাকারও কোনো সুযোগ ছিলো না। এরপরও ধীরে ধীরে চলে গেলাম হসপিটালের প্রেয়ার কক্ষে। হাঁটু গেড়ে বসে গেলাম।

তারপর জীবনে প্রথম সত্যিকার আন্তরিকতার সাথে আমি গডের প্রার্থনা করি। নাস্তিক হিসেবে জীবন কাটিয়ে এই প্রথম আংশিকভাবে আমি গডের স্বীকৃতি জানাই। আমি আংশিক বলছি এ কারণে যে, এ বিপদক্ষণেও আমার অন্তরে গডের স্থান পুরোপুরি হয় নি। তবে আমি এটা বলে প্রার্থনা করলাম: হে গড! তুমি যদি সত্যিই থেকে থাকো তাহলে আমার মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ো না। যদি সে বেঁচে থাকে ও মারাত্মক এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে, তাহলে আমি কসম করে বলছি, আমি সেই ধর্ম খুঁজে বের করবো যা তোমার পছন্দসই ও একে অনুসরণ করবো বাকি জীবন।

দশ থেকে পনেরো মিনিট পর আমি আইসিইউতে ফিরে আসলাম। আমি অবাক হলাম কনসালটট্যান্টের কথা শুনে। বললেন, "চিন্তার কারণ নেই। তোমার মেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে। সে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করবে!" সত্যিই তার কথামতো মাত্র ২ দিন পর সে স্বাভাবিক হওয়া শুরু করে। কোনো ঔষধ বা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ি নি। অবশেষে সে একজন সাধারণ শিশু হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই বড়ো হয়ে ওঠে।

আমি জানি, এ অলৌকিক ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মেডিকেল ব্যাখ্যা আছে। আমি নিজেই তো একজন ডাক্তার। যেখানে কোনোদিন গড থাকাকে বিশ্বাসই করি নি- আজ আমি কীভাবে অলৌকিকতায় বিশ্বাস আনতে পারি? কনসালটট্যান্ট বিভিন্নভাবে আমাকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে পারি নি। আর বিশেষকরে যে ইন্টেনসিভিস্ট ডাক্তার রোগ সনাক্ত করেছিলেন তিনিও কনসাট্যান্টের ব্যাখ্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

আজো আমার মনে পড়ে ঐ ডাক্তার সাহেব অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে, হারিয়েছেন কথাবলার ক্ষমতা। অবশেষে ঠিকই আমার মেয়ে 'হানাহ' সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসে।

এখন, আসল কথায় আসি। অনেকে বিপদকালে খুব বেশি গডকে ডাকে- তাঁর কসম খেয়ে বলে এই করবো, সেই করবো। কিন্তু দ্রুত সে কসমের কথা ভুলে যায়। আমার ব্যাপারেও হয়তো এরূপ হতো- বিশেষকরে আমি তো ইতোমধ্যে গড একজন আছেন বলেও বিশ্বাস করি নি! সুতরাং কনসালট্যান্টের ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করে বসে থাকতে পারতাম। কিন্তু পারি নি। মেয়েটির কার্ডিয়ান আলট্রাসাউন্ড করিয়েছি রোগমুক্তির আগে ও পরে। পরিষ্কারভাবে তার রোগের কন্ডিশন দেখাচ্ছিলো প্রথমটিতে, কিন্তু দ্বিতীয়টি অনুপস্থিত। এ অলৌকিক ঘটনার জন্য গডের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নি। সুতরাং তিনি যেহেতু আমার আবদার গ্রহণ করলেন, তাহলে এবার আমার প্রমিজকে পুরো করতে হবে। ভাবলাম, কোনো বিশেষ মেডিকেল কন্ডিশন যদি হয়েই থাকে যে ব্যাপারে আজো কেউ কিছু জানে না, তথাপি এটিও তো সেই সর্বশক্তিমান গডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়- নয় কি?

সুতরাং, তাঁর যে ক্ষমতাবলেই হোক, গড আমার প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন। আমি তখনও কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাই নি- এখনও পাচ্ছি না। পরবর্তী দুটি বছর আমি কাটিয়েছে আমার প্রতিজ্ঞাকে পূরণ করতে। প্রথমে গবেষণা করি ইয়াহুদিবাদ নিয়ে এরপর খ্রিস্টবাদের বিভিন্ন ফিরকার ওপর অধ্যয়ন করলাম। কিন্তু কোথাও কোনো সত্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হই। অবশ্য, স্বভাবতই একজন অতীতের নাস্তিক হিসেবে কোনো ধর্মবিশ্বাসকে সত্য বলে মেনে নেওয়া আমার জন্য এতো সহজ ছিলো না।

খ্রিস্টবাদের ওপর তথ্যানুসন্ধান-কালে আমি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি বিভিন্ন চার্চের সার্ভিসে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সর্বাধিক বেশি সময় কাটাই রোমান ক্যাথোলিক প্রার্থনা সমাবেশে। কিন্তু কখনও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হই নি। হতে পারি নি- এ কারণে যে, আমি বাইবেলে বর্ণিত জিসাসের শিক্ষার সঙ্গে কোনো চার্চের শিক্ষার মিল খুঁজে পাই নি। অবশেষে কিছুটা হাতশ হয়েই আমি বাড়িতে পড়ে থাকি। অবশ্য পাঠ করা ছেড়ে দিই নি।

এ সময় সৌভাগ্যবশত আমি পবিত্র কুরআন ও মার্টিন লিংয়ের রচিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীগ্রন্থ 'মুহাম্মদ (সা.) হিজ লাইফ বেইজড অন দ্যা আর্লিয়েস্ট সর্সেস' বইটি সংগ্রহ করে পাঠ করি।

আমার কয়েক বছরের অধ্যয়নকালে, আমি ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থে দেখেছি মূসা (আলাইহিসসালাম) পরে তিনজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। এদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন জন দ্যা ব্যাপতিস্ট। দ্বিতীয়জন জিসাস ক্রাইস্ট। সুতরাং পুরাতন টেসটেমেন্ট অনুযায়ী আরো আকজন বাকি আছেন। আর নতুন টেসটেমেন্টে (বাইবেলে) জিসাস ক্রাইস্ট সর্বশেষ এক নবী আসার কথা ব্যক্ত করেছেন। কুরআন অধ্যয়নের সময় আমি জানতে পারলাম মূসা ও ঈসা (আলাইহিমাসসালাম) যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন একত্ববাদ ঠিই তা-ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষা দিয়েছেন। আমি মনে করলাম, হয়তো এই নবীই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। এরপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, আমার ধারণাই সঠিক। এভাবে নিশ্চিত হওয়ার পর আমি অনুধাবন করি, অবশ্যই সবকিছু যৌক্তিক। নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা, তাঁদের কর্তৃক আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার ও সর্বশেষ নবীর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন অবতরণ করা- এসব সত্য আমার নিকট দিবালোকের মতো ধরা পড়ে যায়। এরপরই আমি ইসলামকে একমাত্র সত্যধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিই। আমি মুসলমান হয়ে যাই।

তবে এটা যদি মনে করি যে, উক্ত সত্যকে উপলব্ধি একাকী নিজে নিজেই করে ফেলেছি- তা কিন্তু সঠিক হবে না। যেমন আমি একটি ব্যাপার শিখেছি গত ১০ বছর মুসলমান হিসেবে বসবাস করে- সেটা হলো, আমার থেকেও ঢের বেশি বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর অনেক লোককে দেখেছি যারা ইসলামের সত্যকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা বুদ্ধিমত্তার কোনো বিষয় নয় বরং আলোকসম্পাতের বিষয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন, যারা বিশ্বাস আনে না- তারা অবিশ্বাসীই থাকবে। আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে যখন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, তখনও তারা ঈমান আনে না। সুতরাং তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথপ্রদর্শন করেন না।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষা দেন:

"নিশ্চিতই যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (বাক্বারাহ (২): ৬-৭)

অন্যদিকে, ভালো সংবাদ হচ্ছে:

"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (তাগাবুন (৬৪): ১১)

মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন:

"... আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথপ্রদর্শন করেন।" (শুরা (৪২): ১৩)

এবং:

"আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।" (২৪:৪৬)

সুতরাং, আমি মনে করি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাকে পথনির্দেশনা করার ইচ্ছে করেছেন। এ পথনির্দেশনাকে একটি সাধারণ ফুর্মলা দ্বারা আমি ব্যক্ত করতে চাই: প্রভুকে জানা, তাঁর দরবারে একাকী প্রার্থনা করা, আন্তরিকভাবে অনুসন্ধান করা ও তাঁর মনোনীত ধর্মকে অসুরণ করা এবং তারপর- যখনই তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি- তখনই গ্রহণ করেছি সত্যকে।[৮৫]

---

[৮৫] https://rahyafteha.ir/en/10879/i-was-trying-very-hard-to-be-a-christian/; https://medium.com

তারিক প্রেসটন

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

জন্মের সময় খ্রিস্টান মা-বাবা কর্তৃক ইসলামিক নাম রাখেন। এরই প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ইসলামে দীক্ষিত হন এ ১৯ বছরের খ্রিস্টান যুবক। শুনে নেই তার কাহিনী নিজের ভাষায়।

আমার নাম তারিক প্রেসটন। আমি ইসলামের সঙ্গে আলিঙ্গন করি ১৯৮৮ সালে। এসময় আমার বয়স ছিলো ১৯ বছর। আমি কীভাবে মুসলমান হলাম, সে কেচ্ছাটি খুব লম্বা নয়। তবে ইসলামগ্রহণের পর কীভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, সে কাহিনী হচ্ছে অধিক প্রেরণাদীপ্ত।

তবে শুরু থেকেই বলি। ইসলামগ্রহণে যে ব্যাপারটি সর্বাধিক বড়ো প্রভাব ফেলে তা ছিলো আমার নাম। জন্মের সময় মা-বাবা তারিক নামকরণ করেন। (গত শতকের) ষাট, সত্তুর বা এমনকি আশির দশকেও বিধর্মীরা জেনে বা না জেনে নিজেদের সন্তানের ইসলামী নাম রাখতেন অহরহ। বিশেষ করে কিছু আফ্রিকান-আমেরিকান পরিবারের সন্তানের নাম প্রয়শঃই ইসলামী নাম রাখা হতো। তারা মূলত আফ্রিকার ট্রাডিশনকে অনুসরণ করতেন। আমার নামের ক্ষেত্রে এটিই হয়েছে।

আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব থেকেই অনেক ছেলেদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের নাম ছিলো তারিক। কেউ কেউ আমার নামের অর্থ জেনেই প্রশ্ন করতো, "তুমি জানো, তোমার নামের অর্থ কী?" আমি গর্বভরে জবাব দিতাম, "অবশ্যই! এর অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণভেদী তারকা"। কখনও কখনও এটা বলতাম, "মুসলমানদের কাছ থেকে শুনেছি, ৭১১ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি যিনি স্পেন জয় করেন তার নামও ছিলো তারিক ইবনে যায়িদ।"

তবে কথা হলো, আমার নাম সম্পর্কে ওসব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও, যে ধর্মের সঙ্গে এটি সম্পৃক্ত- সেই ইসলাম সম্পর্কে খুব অল্পই জানতাম কলেজে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে আমি কলেজে প্রবেশ করি। মেডিসিন ও বায়োলজিকে পছন্দ করি অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে। আশা ছিলো ভবিষ্যতে ডাক্তার হবো। আমি জানতাম, বিষয়টি কঠিন। সফল হতে হলে খুব নিয়মনীতি মুতাবিক শক্তভাবে পড়ালেখা করতে হবে। অবসর সময়ে কিন্তু বাইবেল পাঠ করার অভ্যেস করে নিই। তবে কেনো যেনো খ্রিস্টবাদ দ্বারা আমি সন্তুস্ট হচ্ছিলাম না। এ ধর্মে অনেক কথা, অনেক বিশ্বাস অযৌক্তিক ও সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হচ্ছিলো।

কলেজে যখন সেল বায়োলজির (কোষবিজ্ঞান) ওপর অধ্যয়ন শুরু করি তখন অন্তর খুলে যায়। কী অপূর্ব জটিল অথচ কার্যকরী ডিজাইন! এসব কোষের একজন পরিকল্পক নেই- তা মানা যায় না। কিছু বিজ্ঞানী ধারণা করেন, এগুলোর নাকি কোনো ডিজাইনার নেই! আমি ও আমার কয়েকজন সহপাঠী এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে পুনরায় দৃঢ়বিশ্বাসী হলাম উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক এই কোষের জিডাইন অবলোকন করে। আমরা জানতাম, সৃষ্টি কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না- নিশ্চয় সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা।

বসন্তের ছুটির সময় বাড়ি চলে গেলাম। আমার প্রিয় দাদীর সঙ্গে একদিন শুরু হলো ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। একজন অনুরক্ত খ্রিস্টান হয়েও এক পর্যায়ে তিনি এক আকর্ষণীয় মন্তব্য করলেন, যার প্রতি আমার পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন: "আমি গডের উপাসনা করি এবং জিসাসের উপাসনা করি না- কারণ, শুধুমাত্র গডকে উপাসনা করা অনেকটা নিরাপদ মনে করি।"

তিনি এরপর আমাকেও উপদেশ দিলেন: "জিসাসের নামে উপাসনা করবে না। শুধু গডকে উপাসনা করো!" এরপর থেকে কলেজে ফিরে এসে দাদীর এ উপদেশ অনুযায়ী, প্রত্যেক রাতে ঘুমোনের পূর্বে একমাত্র গডকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা শুরু করি। এ প্রার্থনা করাকালে একদিন চিন্তা

করলাম, বিছানার ওপর চিৎ হয়ে থাকাবস্থায় গডকে ডাকা উচিৎ হবে না। সুতরাং, সেদিন থেকে ফ্লোরে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করতে থাকি। এতে নিজের কাছেও বেশ ভালো লাগে।

আমি তখনও এক অনুসন্ধানী যুবক ছিলাম। সত্যকে আবিষ্কার করে বাকি জীবনটি সঠিক পথে কাটানোর ইচ্ছে আমার মধ্যে প্রবল ছিলো। সুতরাং একদিন আমি ক্যাম্পাসের ভেতর মাঠের মধ্যে একাকী হাঁটার সময় গডকে আবদার জানালাম, "হে প্রভু! আমাকে সঠিক, তোমার পছন্দসই পথপ্রদর্শন করুন।"

কিছুদিন পরের কথা। একদিন ক্যাম্পাসে হাঁটার সময় সাক্ষাৎ ঘটলো এক সহপাঠী ছাত্রের সাথে। সে কয়েকদিন পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। সে আমাকে স্বাগত জানালো এই বলে: "আসসালামু আলাইকুম"। সত্তুর দশকের শিকাগো শহরে বেড়ে ওঠার সময় আমি প্রায়ই এই বাক্যটি শুনেছি। এর জবাবে কী বলতে হয় তা-ও জানা ছিলো। তাই জবাব দিলাম: "ওয়াআলাইকুমুস সালাম!"

সহপাঠী কিছুটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি মুসলমান?" জবাব দিলাম, "না। আমি ইউনাইটেড মেথোডিস্ট (খ্রিস্টান)।" সে বললো, "ওহ! আমি ভেবেছিলাম তুমি মুসলমান, কারণ তোমার নাম তো তারিক। এছাড়া তুমি সালামের জবাব দিয়েছো সঠিকভাবে।"

উক্ত সাক্ষাতের বেশিদিন পরের কথা নয়। নও-মুসলিম ছাত্রটি একদিক আমাদের স্ট্যাডি-সার্কেলে উপস্থিত হলো। এক পর্যায়ে সে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা চালায়। সে খুব অল্প বয়স্ক ছিলো, ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান তখনও খুব বেশি হয় নি। তবে এক পর্যায়ে আমাদের সতর্ক করলো: "ঈসা আলাইহিসসালাম (জিসাস) কিংবা তাঁর মাতা মরিয়ম (আ.) এর উপাসনা করবে না। এটা কঠিন পাপের কাজ।"

আমি জানতাম, খ্রিস্টবাদে অবিশ্বাসীরা ও বিশেষকরে মুসলিমরা উক্তরূপ কথা সব সময় বলে থাকে। আর এ ছাত্রটি যেহেতু মুসলমান ছিলো তাই ইসলাম সম্পর্কে আরো না জেনে তার কথার অর্থ বুঝা সম্ভব ছিলো না।

ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু না জানলেও, মুসলমানদের বাহ্যিক রূপ যে ভিন্ন ছিলো তা অবশ্যই জানতাম। উক্ত ছাত্রটিও ইসলাম গ্রহণ করার পর দীর্ঘ লম্বা জামা (পাঞ্জাবী) ও মাথায় সাদা গোল পুটি পরতো। আর মুসলিম মহিলাদের হিজাব, বুরকা ও নিকাব ইত্যাদি আলাদা ড্রেস পরা সম্পর্কে কে না জানে।

গীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে আসি। ভাবলাম, সামার-জব (গ্রীষ্মকালীন কাজ) করে কিছুটা অতিরিক্ত টাকা কামাই করে নেবো। টিভি মার্কেটার হিসেবে যোগ দিলাম একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। সেখানে সাক্ষাৎ ঘটলো আহমদ নামক এক মুসলিমের সঙ্গে। একজন পর্টোরিকান নও-মুসলিম ছিলো এ ছেলেটি। তার পরনেও দেখলাম সেই কলেজের নও-মুসলিমের মতো একই ধরনের বস্ত্র শোভা পাচ্ছে! সুতরাং প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কী একজন মুসলমান?” সে মুচকি হেসে জবাব দিলো, “হ্যাঁ তারিক, আমি মুসলমান। আর তুমি? জাবাব দিলাম, “না। আমি একজন ইউনাইটেড মেথোডিস্ট।”

আহমদ হেসে হেসে বললো, “তোমার নাম তারিক- সুতরাং তোমাকে মুসলমান হওয়াই উচিৎ ছিলো।” কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলতাম। একদিন সে ‘তাওহিদ’ সম্পর্কে বললো। আমার খুব ভালো লাগে। ইসলামী একত্ববাদ সত্যিই সর্বাপেক্ষা নিষ্কলুষ ও স্পষ্ট ছিলো।

একদিন আহমদ আমাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলো। সে আমাকে পবিত্র কুরআনের একটি ইংরেজি অনুবাদ দেখালো। এ গ্রন্থটির প্রতি তার সম্মানবোধ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “আমার ইচ্ছে হচ্ছে এ বইটি পাঠ করবো। তুমি আমাকে এটি ধার দেবে?” সে অনিচ্ছা থাকাসত্ত্বেও দিতে রাজী হলো। বললো, “দ্যাখো! আমার নিকট এটিই কুরআনের একমাত্র কপি। আর এর প্রতি সম্মানবোধ রাখতে ভুলবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো উচ্চ স্থানে রাখবে।”

বাড়ি ফিরে কুরআন পাঠ করতে আমি আকুল হয়ে ওঠলাম। দুই সপ্তাহ চলে গেলো। আহমদকে এবার আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসলাম। পুনরায় আমাদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে কথাবার্তা হলো। আমি তাকে এক পর্যায়ে জানালাম, "আহমদ! আমি কুরআনের যাকিছুই পাঠ করেছি তাতে ধারণা জন্মেছে এটি গডের কথা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইসলামকে আমার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবো।" আহমদ মহানন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

পরদিনই আহমদকে নিয়ে চলে গেলাম ওয়াশিংটন ডিসি শহরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টারে। সবার সম্মুখে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরবি ভাষা ও হাদিসের ওপর ডিগ্রী লাভে ধন্য হই।

আমি আশা করছি, ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার এ কাহিনী শুনে অন্যরাও মহাসত্যের ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করে ধন্য হবেন। একই সময় এটাও আশা রাখি যে, আমার মুসলিম ভাইবোনগণ তাদের আশেপাশে বসবাসরত সকল অমুসলিমদের নিকট নিজেদের সত্যধর্ম ইসলামের দাওয়াত পৌঁছুয়ে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্যধর্ম ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ রাখুন এবং অন্যদেরকে তাঁর এ পবিত্র ধর্ম আলিঙ্গন করতে সাহায্য করুন। আমীন।[৮৬]

---

৮৬ https://rahyafteha.ir/en/10946/the-story-of-how-i-came-to-embrace-islam/

ইউসুফ ডারবিশায়ার

প্রাক্তন খ্রিস্টান - যুক্তরাজ্য

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত

পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম হওয়ার পূর্বে আমি ছিলাম- আপনি বলতে পারেন, 'বৃটিশ এক বৈশিষ্ট্যসূচক যুবক'। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় পাবে যেয়ে মদপান, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, স্নোকার খেলা ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম- যেভাবে অন্যান্য প্রায় সব বৃটিশ ছেলে এবং মেয়েরা থেকে থাকে।

আজ থেকে ৫ বছর পূর্বের কথা। গ্রিসে ছুটিতে যাবো সিদ্ধান্ত নিলাম। এয়ারপোর্টে দেখা যায় অনেকের বেকপ্যাকে পড়ার কিছু বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থাকে। তবে এক-দুটো মাত্র। বিমানে ভ্রমণকালে মোবাইল ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং সময় কাটানোর জন্য ট্রেডিশন্যাল প্রিন্টেড বই-পত্র দরকার। এছাড়া ওখানে যেয়ে কালো সানগ্লাস পরে সুইমিং পুলের পারে বসে কিছু পাঠ করা- ইত্যাদি সবাই করে থাকে। আমার ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম কিছু ছিলো না।

পাঠের জন্য কী নেবো? ভাবলাম ডব্লিউএইচ স্মিথে যেয়ে একটু দেখে নেই। বেশ কিছু অসুন্ধান করেও ভালো কোনো বই পেলাম না। আমার উদ্দেশ্য ছিলো নবেল-গল্প ইত্যাদি বাদ দিয়ে নন-ফিকশন কোনো একটা ভালো বই ক্রয় করবো। চোখে কিছুই পছন্দসই পড়লো না। ফিরে চললাম দোকান থেকে। এসময় বেকপ্যাক একটি বইয়ের শেলফে লেগে যায়। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি শেলফ থেকে কয়েকটি বই পড়ে গেছে। সাথে সাথে বইগুলো পুনরায় শেলফে রাখতে থাকি। তখন হাতে ওঠে আসলো একখানা বড়ো গ্রন্থ।

পশ্চিমা লেখক বারনাবি রজারসন প্রণীত বইটির নাম, ‘The Prophet Muhammad: A Biography’। বইটি খুলে মূল লেখার প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে নিলাম। বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো। পাঠ করলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠাও। আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠলো। কাউন্টারে যেয়ে মূল্য পরিশোধ করে কিনে নিলাম গ্রন্থটি।

গ্রিসে হলিডে থাকাবস্থায় পুরো বইটি পাঠ করলাম। ভাবলাম, ‘মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে হবে।’ বাড়ি ফিরে স্থানীয় একটি মসজিদে গেলাম। ইমাম সাহেবকে অনুরোধ জানালাম, “আমি ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে ইচ্ছুক।” তিনি বললেন, “ভালো কথা, সর্বাধিক উত্তম উপায়ে ইসলামকে জানার রাস্তা হচ্ছে মুসলমান হওয়া।”

আমি আর এক মুহূর্ত দ্বিতীয়বার ভাবি নি, সাথে সাথে তার সম্মুখে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

একজন প্রত্যাবর্তিত মুসলিম হিসেবে নিজেকে দেখতে পাই কোনো একজন সাহাবার (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) অনুগত হয়েছি। কারণ তাঁরাও তো সবাই ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তবে অবশ্যই তাঁদের পায়ের ধূলির মতোও এ অধম ইউসুফ ডারবিশায়ার ছিলো না।

আমি হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করতে থাকি। তিনি তাঁর জীবন ইসলামে প্রবেশের পূর্বে যেভাবে কাটিয়েছেন, তা-ই আমাকে এ সম্পর্ক দেখিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! পবিত্র হজ্জের সময় মদীনা মুনুওয়ারায় যেয়ে আমি একদিন চলে গেলাম আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব শহীদ শিরোমণি হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবরের নিকট, শুহাদায়ে উহুদ প্রান্তরে। সেখানে যেয়ে বাস থেকে নেমে পড়ি।

চতুর্দিকে তাকিয়ে আমি ধীর ধীরে হাঁটতে থাকি। মনে হচ্ছিলো, আমি প্রশান্তির বাগানে বিচরণ করছি। আমি এতোই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম যে, অশ্রুতে ভরে গেলো আমার চোখ দুটো। এরপর কপোল বেয়ে ঝরতে থাকে

অশ্রুজল। আমি কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলাম না। আমি জানতাম না কেনো এমনটি হলো?

সুতরাং আমি হাঁটতে থাকি কেঁদে কেঁদে। বালুকাময় অংশটি পার হয়ে যাওয়ার পরই কিন্তু সব থেমে গেলো। নিজেকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলাম। এরপর শহীদদের কবরস্থানের সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমি হাত তুলে তাঁদের জন্য দুআ করলাম। দুআ করলাম হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য। এরপর ভাবলাম, সময় হয়েছে ফিরে যেতে। হাঁটতে থাকি পুনরায় বাসের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য, সে-ই বালুকাময় অংশে পা রাখতেই আবারো ক্রন্দন শুরু হয়ে যায়!

সাথীদের কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "কী হয়েছে?"। আমি জবাব দিলাম, ঠিক জানি না। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, "যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন, এখানে কী হয়েছে- তখন তিনি শুধু কাঁদতে থাকেন।"

আমি বললাম, "হয়তো তিনি এই জায়গায় কারোর জন্য কিছু রেখে গেছেন যাতে সে তা পায়।" আমি ঠিক তা-ই যেনো পেয়েছি। আমার বুকটি হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর জন্য কেঁপে উঠলো।

যুক্তরাজ্যে ফিরে আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বললাম, "আমাদের যদি একটি ছেলেসন্তান জন্ম নেয়, তার নাম রখাবো হামযা।" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দান করলেন এক মেয়েসন্তান। আমার মাকে দেখতে যাওয়ার পূর্বে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান চালালাম হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কোনো নারী আত্মীয়া ছিলেন কী না- থাকলে তাঁর নামটি কী ছিলো। কিছুই পেলাম না।

আমার স্ত্রী প্রস্তাব দিলো, "তোমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করো?" সুতরাং আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সেদিন চলে গেলেন। দুদিন পর ফিরে এসে বললেন, "আমি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনটি নাম আবিষ্কার করেছি।" যে নামটি আমার বেশি পছন্দ হলো তাছিলো 'সাফিয়্যা'।

কয়েক মাস পরের কথা। আমি কিছুটা বিষাদগ্রস্ত ও অস্বস্থি বোধ করছিলাম। সুতরাং ভালো কিছু বই-পুস্তক পাঠ করতে মন চাইলো। একটি বই কিনে এনে খুলতেই দেখলাম উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা এসেছে। তখন মদীনার সবাই ছুটে গেছে উহুদ প্রান্তরে। সবাই সাহাবীদের কবরস্থ করছিলেন। এরপর দেখলাম, হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বোন সম্পর্কে লিখা আছে। তিনি দু টুকরো কাপড় নিয়ে গেছেন। তাঁর নামই ছিলো সাফিয়্যা। আলহামদুলিল্লাহ! আমার মেয়ের নাম রেখেছি সাফিয়্যা- হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রিয় বোন সাফিয়্যা রাদ্বিআল্লাহু আনহার নামানুসারে।[৮৭]

[৮৭] https://aboutislam.net/reading-islam/my-journey-to-islam/reading-the-biography-of-the-prophet-led-me-to-islam/

ক্রেইগ রোবার্টসন

প্রাক্তন খ্রিস্টান - কানাডা

খ্রিস্টান ক্যাথোলিক ক্রেইগের অন্ধকার থেকে আলোরদিকে ভ্রমণের ইতিকথা

আমার নাম আবদুল্লাহ আল-কানাডি। কানাডার ভেনকোভারে আমার জন্ম। আমার পরিবারের সবাই ছিলো রোমান ক্যাথোলিক- সুতরাং আমিও রোমান ক্যাথোলিক হিসেবে বড় হই। তবে মাত্র ১২ বছর বয়স থেকে আমি আর খ্রিস্টবাদকে অনুসরণ করি নি।

আজ ৬ বছর হয় আমি মুসলমান হয়েছি। ইসলামে ভ্রমণের আমার কাহিনী সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। আমি মনে করি, যে কোনো কাহিনী শুরু থেকেই আরম্ভ করা উত্তম।

শিশু থাকতেই আমাকে যেতে হয় একটি ক্যাথোলিক ধর্মীয় স্কুলে। সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে আমাকে শিখতে হয়েছে ক্যাথোলিক মৌলিক বিশ্বাসকেও। ধর্মশিক্ষা ছিলো আমার প্রিয় বিষয়। আমি চার্চের শিক্ষার ওপর উচ্চতর অধ্যয়ন করি। আমাকে অল্প বয়সেই চার্চের 'অলটার বয়' (বেদি ছেলে) সিহেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে সর্বাধিক খুশি হন আমার দাদা-দাদী। কিন্তু আমি ছিলাম অনেকটা সন্দেহবাদী। যতো বেশি নিজের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা করছিলাম ততো বেশি প্রশ্নও আমার মনে জেগে ওঠছিলো।

আমার মনে পড়ে একদিন আমার মাকে ম্যাসের (চার্চের প্রার্থনা) সময় প্রশ্ন করেছিলাম, "মাম, আমাদের ধর্ম কী সঠিক?" আজো আমার মায়ের জবাবটি কানে বাজে: "ক্রেইগ, এগুলো সবই সমান। সবই ভালো।" কিন্তু আমার নিকট এ কথাটি সঠিক বলে মনে হয় নি। সবই যদি সমান হয়ে থাকে তাহলে আমারটি শিক্ষার মধ্যে কী গুরুত্ব থাকতে পারে? নিশ্চয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে- ভালো সবগুলোই, কিন্তু সত্য সবই- তা মানা যায় না।

আমার বয়স যখন ১২ বছর তখন আমার নানী 'কলোন ক্যান্সারে' আক্রান্ত হন। এর কিছুদিন পরই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তার এ অকাল মৃত্যুতে আমি কিরূপ আহত হয়েছিলাম আত্মিকভাবে তা বুঝতে অনেকদিন সময় অতিবাহিত হয়। অনুপযুক্ত বারো বছরের এক ছেলের মন এতোই খারাপ হলো যে, রাগে প্রভুবিশ্বাস পর্যন্ত বিসর্জন দিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, "গডকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো!"। আমি খুব রাগান্বিত একটি ছোট্ট ছেলে ছিলাম তখন। সমগ্র বিশ্বটি আমার নিকট অসহ মনে হচ্ছিলো। নিজের প্রতিও রাগান্বিত হলাম এবং গডের প্রতিও!

পাবলিক হাই স্কুলে যেয়ে নতুন বন্ধুদের কাছে নিজেকে খুব এটা কিছু প্রমাণ করতে চেষ্টা চালালাম। অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে ওসব ব্যাপার শিখতে চাইলাম যা আমি জানতাম না। এরপর নিজের থেকে দুর্বলদের প্রতি অবজ্ঞা করতে থাকি। এমতাবস্থায় সবার সঙ্গে মিল রেখে চলা ছিলো কঠিন। ক্রমান্বয়ে ছেলেরা আমাকে বুলিং করতে থাকে। মেয়েরা আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতো। এ বয়সের একটি ছেলে হিসেবে এসব ব্যাপার ছিলো খুব ক্ষতিকর। আমি নিজেকে দেখতে পেলাম, এমন এক অবস্থায় যাকে বলা চলে, "আবেগপূর্ণ খোসার ভেতর"।

টিনেজ বছরগুলো ছিলো আমার জন্য এক মর্মপীড়া ও একাকীত্বের সময়। আমার বেচারা মা-বাবা কথা বলতে চাইতেন, কিন্তু আমি তাদের প্রতি হয়ে ওঠি কঠোর ও বেআদব। হাই স্কুলের লেখাপড়া শেষ করি ১৯৯৬ সালে। এরপর ভাবলাম, সবকিছু পরিবর্তন দরকার। কারণ এখন একেবারে দেওয়ালে ঠেকে গেছে সুষ্ঠু জীবনযাপন।

এরপর স্থানীয় এক টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম। ভাবলাম, ভালো প্রশিক্ষণ শেষে উত্তম কাজ পাবো। টাকা-পয়সা কামাই করলে, হয়তো এ কষ্টকর জীবনটি উন্নতির দিকে যাবে। জীবনে কিছুটা আনন্দ আসবে। একটি ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে কাজে যোগ দিলাম। এটি আমার বাড়ির কাছেই ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো কলেজের ফি বহন করা।

কলেজে ক্লাস শুরুর দুসপ্তাহ পূর্বে সহকর্মী কিছু বন্ধু আমাকে বললো, এসো আমরা নিজেদের ভাড়াকরা একটি ফ্লাটে থাকার ব্যবস্থা করে নিই।

আমার নিকট ব্যাপারটি খুব উত্তম মনে হলো। হয়তো আমার সমস্যার সমাধান এখানেই হতে পারে। পরিবার-পরিজনকে ভুলে, বন্ধুদের সাথে সব সময় থাকার সুযোগ পাবো। সুতরাং, এক রাতে মা-বাবাকে বললাম, 'আমি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।' তারা জবাব দিলেন, 'তুমি পারবে না। বাইরে একাকী থাকার যোগ্য তুমি হওনি।' আমি বেশ রাগান্বিত হলাম তাদের প্রতি। আমার বয়স তখন সতেরো। অনেক বাজে কথা বললাম তাদেরে। এখন আমি এ ব্যাপারে সত্যিই লজ্জিত। মা-বাবার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা সত্যিই ভীষণ অন্যায়। আমি তাদের কথা রাখলাম না। বন্ধুদের সাথে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাড়াকরা ফ্ল্যাটে যেয়ে ওঠলাম।

তবে আমার অবস্থার আরো অবনতি হলো। বন্ধুরা আমাকে ড্রাগের প্রতি আকর্ষিত করলো। আমি গাঁজা সেবন করতে লাগলাম। প্রথম টানেই আমি গাঁজার প্রেমে পড়ে গেলাম! প্রথমে অল্প অল্প টানতাম কাজ থেকে বাড়ি ফিরে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই বেশি বেশি গাঁজা সেবনে নিজেকে ডুবিয়ে দিই। কলেজে পড়ালেখা আর হলো না। ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট থেকে চুরি করে খাবার নিয়ে আসতাম। বেতনের টাকা দিয়ে কিনে আনতাম গাঁজা। ব্যস, বেশ আনন্দেই জীবন কাটতে লাগলো!

আনন্দের জীবন, যা আমি ভেবেছিলাম। কাজের জায়গায় হয়ে গেলাম রেসিডেন্ট খারাপ ছেলে। মেয়েরাও আমার প্রতি আকর্ষিত হলো- যা হাই স্কুলে থাকতে দেখি নি। আমি আরো শক্ত ড্রাগ সেবনের চেষ্টা চালাই। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য ইশারায় আমি রক্ষা পাই। শক্ত ড্রাগ ছিলো সত্যিই ক্ষতিকর। অদ্ভুত ব্যাপার ছিলো, ড্রাগ সেবন করে মাতাল না হলে আমি খুব অসহায় হয়ে পড়তাম। নিজেকে খুব নগণ্য ও মূল্যহীন মনে হতো। শেষ পর্যন্ত কাজের জায়গা ও বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা চুরি করতে শুরু করি। ড্রাগের মূল্য ছিলো বেশি- কী করবো? আমি পাগলপ্রায় অবস্থায় উপনিত হলাম। মনে হতো নিকটস্থ সব মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। সব সময় পুলিশ আমার পেছনে লেগে আছে। আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। শীঘ্রই কোনো প্রতিকার ছাড়া আমার জীবনের ইতি ঘটবে।

আমার মনে পড়ে, ‘যাদুর’ ওপর একটি মুভি দেখেছিলাম। ভাবলাম যাদুটোনা দ্বারা হয়তো আমি উপকৃত হবো। আমি দুটি বই কিনলাম- এর একটি ছিলো ইউকা ধর্মবিষয়ক আর অপরটি প্রকৃতিপুঁজা নিয়ে লেখা। উভটিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক ড্রাগ ব্যবহার উত্তম। সুতরাং ড্রাগ ব্যবহারকে অব্যাহত রাখলাম। মানুষ সময় সময় আমাকে জিজ্ঞেস করতো, “হে ক্রেইগ, তুমি গডকে বিশ্বাস করো?” জবাব দিতাম, “না! আমি গডে মোটেই বিশ্বাসী নয়।”

একদিন ভাবলাম, হয়তো ধর্ম আমাকে রক্ষা করতে পারে। এতো দুঃখ-কষ্টের দিনেও একজন বন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করে নি। সে ছিলো ‘পুনঃজনমপ্রাপ্ত এক খ্রিস্টান ছেলে’। সে সব সময় আমাকে ধর্মের আলোকে বুঝাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু প্রত্যেকবারই তার প্রতি মশকরা করতাম। সব উপদেশ উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সে কখনও রাগ করতো না। একদিন বললো, “আচ্ছা অন্তত একটা দিনের মতো আমার সঙ্গে চলো- ইয়ুথ ক্লাবে যাবো।” আমি সম্মত হলাম। আমি মনে করেছিলাম ওখানে তারা সবাই মিলে, বাইবেল নিয়ে আলোচনা করে হাসি-তামাশা করবে। আমিও এতে শরীক হবো- এই যা।

প্রথমদিন তেমন কিছু ছিলো না। তবে আমার ভালো লাগলো। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় পুনরায় গেলাম। সেখানে এক বিরাট আলোচনা অনুষ্ঠান চলছিলো। প্রথমেই গডের শানে মিউজিক বাজানো হলো। এরপর শুরু হলো প্রার্থনা। দেখলাম, ছোট-বড়ো-নারী-পুরুষ সবাই কেঁদে কেঁদে প্রভুর নিকট ক্ষমা চাচ্ছে। দৃশ্যটা সত্যিই ভালো লাগলো। আমিও এবার মনে মনে গডের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলাম, “গড, জানি আমি খুব খারাপ একটি ছেলে। দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং সবকিছু আবার সঠিকভাবে শুরু করার সুযোগ করে দাও।” হঠাৎ আমার মাঝে এক অদ্ভুদ ভাবের উদ্রেক হলো। চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো কপোল বেয়ে। এ মুহূর্তেই জিসাস ক্রাইস্টকে আমার প্রভু ও রক্ষাকারী হিসেবে আলিঙ্গন করতে সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি হাত উত্তোলন করে নাচতে থাকি (হ্যাঁ, নাচন!)। উপস্থিত সকল খ্রিস্টান আমাকে ঘিরে অবাক দৃষ্টিতে নিরবে তাকিয়ে থাকে। যে লোকটি তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতো, বলতো তোমারা বোকা। আজ সে-ই গডের প্রশংসায় নাচন করছে! অবাক হওয়ার বিষয় বৈকি।

ফ্ল্যাটে ফিরে এসে ড্রাগ, মেয়ে আর মদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলাম। বন্ধুদেরেও নিজের সিন্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। বললাম, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে খ্রিস্টান হয়ে যাও। কিন্তু আমার কথা তারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করলো। এরপর ফিরে আসি নিজের মা-বাবার কাছে। তাদেরকে আহ্বান জানাতে থাকি, তোমরাও খ্রিস্টান হয়ে যাও। তারা ভাবতো, যেহেতু তারা ক্যাথোলিক, সুতরাং তারাতো খ্রিস্টান আছেই। কিন্তু আমি ভাবতাম, তারা খ্রিস্টান নয়- কারণ তারা খিস্ট্রান সেন্টদের উপাসনা করতো। আমি আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম। আমার দাদা আমাকে একটি কাজ দিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন আমার 'সুস্থতা' অর্জনে সাহায্য করবেন।

আমি প্রায়ই একটি 'খ্রিস্টান' ইয়ুথ হাউজে যেথাম। সেখানে যুবক যুবতিরা আসতো পরিবার থেকে একটু দূরে সরে যেয়ে খ্রিস্টবাদ নিয়ে আলোচনা করতে। তবে আমি আবারও মদপান ও মেয়েদের সঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, যখন জীবনের প্রথম এক মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাই। তার নামটি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমার মনে আছে যে ছেলেটি তার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলো, সে বললো, "আমি আমার বন্ধু অমুককে নিয়ে এসেছি। সে একজন মুসলমান। আমি তাকে খ্রিস্টান বানাতে চাই!" মাত্র ১৪ বছর বয়সী এই মুসলিম ছেলের কথা শুনে আমি অবাক হলাম। সে ছিলো খুব শান্তশিষ্ট ও বন্ধুভাবাপন্ন। সে এক ডজেন খ্রিস্টানদের প্রশ্নের জবাব দেয় সুন্দরভাবে এবং নিজের ধর্ম ইসলামকে সফলভাবে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এটি খ্রিস্টবাদ থেকে সুপেরিয়ার। খ্রিস্টান ছেলেদের অধিকাংশ ইসলামের বিরুদ্ধে কঠুকথা ও গালিগালাজ করছিলো। আমরা বাইবেল থেকে তার প্রতি বিভিন্ন কথা বলছিলাম, সে সেখানে নিরবে

বসে শুনছিলো। হাসিমুখে মাঝে মাঝে বলছিলো, তোমরা গড ছাড়াও অন্যান্য কাল্পনিক জিনিসের পুঁজা করো। এটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সে ছিলো একটি হরিণের মতো যাকে ঘিরে রেখেছে একদল হায়েনা! অথচ, পুরো সময়টা সে শান্ত, হাসিমুখো ও ভদ্র ছিলো। আমার মনে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া শুরু হয়!

মুসলিম ছেলেটা কুরআনের একটি অনুবাদগ্রন্থ শেলফে রেখে যায়। জানিনা, হয়তো সে এটি ভুলে ফেলে গেছে- না হয়, ইচ্ছে করেই রেখে গেছে। কিন্তু আমি এটি পাঠ করতে শুরু করি। আমি শীঘ্রই এ গ্রন্থের প্রতি আকর্ষিত হলাম যখন লক্ষ করলাম, আসমানী কিতাব হিসেবে এটি বাইবেল থেকে ঢের বেশি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মন বললো, নিশ্চয়ই কোনো কারসাজি আছে! তাই পাঠ করেও শেলফে রেখে দিলাম। আমি রাগান্বিত হলাম। কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি। রাগ পেলেও কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে খ্রিস্টবাদের ওপর কিছুটা সন্দেহ গজে ওঠলো। আমি ভাবলাম, এ মুসলিম ছেলের কথা ভুলে যাওয়াই উত্তম।

আমাদের ইয়ুথ গ্রুপ প্রতি রোববারে বিভিন্ন চার্চে যেয়ে প্রার্থনায় শরীক হতো। আর শনিবার রাতে মদের বারে না গিয়ে উপস্থিত হতো একটি বিরাট চার্চে। আমার মনে পড়ে এরূপ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম যার নাম ছিলো 'দ্যা ওয়েল' (কূপ)। আমি এ অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজেকে এতোই বিনয় দেখলাম যে, মনে হলো গডের নৈকট্য চাই ও তাঁকে ভালোবাসবো। আমি তখন স্বাভাবিক কাজটিই করলাম। ঠিক মুসলমানদের মতো সিজদায় পড়ে গেলাম! তবে আমি তখন জানতাম না কী করছি? কিন্তু সিজদাবনত অবস্থা সত্যিই আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করলো। মনে হলো, জীবনে এর চেয়েও ভালো বা সঠিক কিছু আমি কোনোদিন করি নি। আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক জাগরণ শুরু হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলো। এখন দেখলাম আমার স্বাভাবিক যে জীবন ছিলো তা আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে!

খ্রিস্টান প্যাস্টোর (পাদ্রী) আমাদেরকে সর্বদা বলতেন, গডের ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমি এর চেয়ে কম কিছু করতে চাই নি। কিন্তু জানতাম না কীভাবে করবো? আমি সব সময় প্রার্থনা করতাম, "প্লিজ

গড, আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছা করো। আমাকে তোমার ইচ্ছা অনুসরণ করতে দাও।” কিন্তু কখনও কিছু অনুভব করি নি। আমি দেখলাম, খুব ধীরে ধীরে চার্চ থেকে দূরে সরে পড়ছি। আমার বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এ সময়ই আমার প্রিয় বন্ধু, খ্রিস্টান লোক- যে আমাকে ক্রাইস্টের নিকট আসতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন এবং আরো এক বন্ধু মিলে আমার প্রিয় বান্ধবীকে ধর্ষণ করে। আমি অপর কক্ষে ছিলাম। বেশি মাতাল হওয়ায় কিছুই বুঝি নি। এর দু সপ্তাহ পর জানা গেলো, যে ব্যক্তি আমাদের ইয়ুথ হাউজের পরিচালক ছিলো সে একটি ছেলের সঙ্গে কুকীর্তি করেছে। এ ছেলেটিও ছিলো আমার বন্ধু।

আমার পৃথিবীটা যেনো ধ্বংস হয়ে যায়! আমাকে নিজের বন্ধুরা প্রতারণা করলো। আর এরা নাকি ছিলো গডের কাছাকাছি! আমি পুনরায় শূন্যহস্ত হয়ে পড়লাম। আগের মতো আমি উদ্দেশ্যহীন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কাজ করা, ঘুমনো ও পার্টিতে যাওয়া হলে গেলো আমার রুটিন। আমার প্রিয় বান্ধবীও আমাকে পরিত্যাগ করলো। নিজের ত্রুটি, রাগ ও দুঃখ আমার সত্তাকে আড়ষ্ঠ করে নিলো। আমার সৃষ্টিকর্তা কীভাবে আমার প্রতি এতো নির্দয় হলেন? আমি কীরূপ আত্মভুলা ছিলাম?

কিছুদিন পর আমার ম্যানেজার বললেন, এক ‘মজলেম’ এসে কাজে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে। সে খুব ধার্মিক ছিলো। আমাদেরকে তার প্রতি সম্মানবোধ দেখাতে হবে। যে মুহূর্তে এ ‘মজলেম’ এলো, শুরু করে দিলো দাওয়াহ। আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সবকিছু বলতে মোটেই কালক্ষেপণ করলো না। তবে সবাই তাকে বললো, ইসলাম সম্পর্কে আর কিছুই আমরা শুনতে চাই না। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম!

আমার আত্মা আরো জানতে ক্রন্দন করছিলো। আমার কঠোরতাও এ ক্রন্দনকে থামাতে পারলো না। মুসলিম ও আমি উভয়ে একত্রে কাজ করতে করতে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কথাবার্তা শুরু করি। আমি অবশ্যই তখনই খ্রিস্টবাদকে বাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার প্রশ্নবাণে আমি পুনর্জাগরণ অনুভব করি। নিজেকে ‘ক্রুসেডর’ হিসেবে দেখতে লাগলাম। ইভোল মজলেমের আক্রমণ থেকে ফেইথকে রক্ষা করতে থাকি।

বাস্তব কথা হলো, এই বিশেষ 'মজলেম' লোকটি মোটেই ইভোল (দুষ্ট) ছিলো না। সে আসলে আমার থেকে অনেক ভালো লোক। সে কখনও কসম খেতো না, রাগ করতো না, সর্বদা শান্তশিষ্ট থাকতো, তার মধ্যে ছিলো দয়া ও সম্মানবোধ। আমি সত্যিই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হই। সিদ্ধান্ত নিলাম, এ লোকটি সত্যিই একজন উত্তম খ্রিস্টান হবে! আমরা একে অন্যের ধর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি। কিছুদিন পর কিন্তু আমাকে প্রায়ই আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে হলো। একদিন আমি খুব রাগান্বিত হলাম। আমি তাকে খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত করতে চাচ্ছি, এবং আমি দেখছিলাম, সে-ই ছিলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত! ক্রমান্বয়ে আমি বেশি বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি- কী করবো বুঝতেই পারছিলাম না। আমি যা জানতাম তাহলো, নিজের বিশ্বাসকে আরো শক্ত করতে হবে। সুতরাং আমি লাফ মেরে ওঠে ছুটে চললাম 'দ্যা ওয়েল' এর দিকে। আমি ভেবেছিলাম, ওখানে যেয়ে প্রার্থনা করলে, আমার মধ্যে অনুভবটি পুনরায় ফিরে আসবে। আমি হবো বিশ্বাসের দিক থেকে আরো শক্তিশালী। এরপর ঐ মুসলিমকে দীক্ষিত করতে সক্ষম হবো খ্রিস্টবাদে।

আমি দ্রুত ড্রাইভ করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম। কিন্তু দরোজার সামনে যেয়ে দেখি এটি বন্ধ! কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি ভাবলাম, কোথায় যেয়ে নিজেকে 'চার্জ আপ' করতে পারি? কিন্তু কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই- খুব আহতমনে বাড়িতে ফিরে আসি।

বাড়িতে ফিরে বেডের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেলাম। অনুভব করলাম, আমাকে প্রার্থনার মতো প্রার্থনা করতে হবে। বেডে উঠে বসে গেলাম। চোখ বন্ধ করে বলতে লাগলাম: "জিসাস, গড, বুদ্ধা- কিংবা তুমি যা কিছুই হও না কেনো, প্লিস, প্লিস আমাকে পথপ্রদর্শন করো। তোমাকে আমার প্রয়োজন! জীবনে এতো বেশি পাপ করেছি যে, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। খ্রিস্টবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে বিশ্বাসে আরো শক্ত করো। আর ইসলাম যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে এটি গ্রহণ করতে সাহায্য করো।"

আমি প্রার্থনা শেষ করলাম। অশ্রুতে আমার গাল ভিজে গেলো। আমার আত্মার অভ্যন্তরে প্রশান্তি অনুভব করলাম। আমি বুঝতে পারলাম, কী ছিলো

জবাব। পরের দিন আমি কাজে গেলাম। মুসলিম সহকর্মীর প্রতি হাসিমুখে তাকিয়ে বললাম, “আমি কীভাবে তোমাকে ‘হ্যালো’ বলবো?” তিনি আমাকে জিজ্ঞস করলেন, “কী বলতে চাচ্ছো?” আমি বললাম, “ভাই, আমি মুসলিম হতে চাই!” তিনি সাথে সাথে উচ্চারণ করলো, “আল্লাহু আকবার!” এক মিনিটব্যাপী একে অন্যকে অশ্রুসিক্ত চোখে জড়িয়ে ধরে থাকি। আমি তাকে সবকিছুর জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানালাম। শুরু হলো ইসলামে আমার ভ্রমণ।

আমার জীবনে যাকিছু ঘটেছে সবগুলোর দিকে এখন ফিরে তাকিয়ে দেখি ও ভাবি, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা’আলা তাঁর সত্যধর্ম ইসলামে ফিরে আসতে ও মুসলমান হতে তিনি আমাকে প্রস্তুত করছিলেন। তবে এটাও সত্যি, আল্লাহ তা’আলা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আমি যাকিছু অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিখেছি তাহলো: মদপান থেকে বিরত থাকার ইসলামী বিধি-নিষেধের সৌন্দর্য; নারীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কুফল; হিজাব পরার গুরুত্ব। আমি এখন একটি মডারেট জীবন অবিাহিত করছি। একজন ভালো মুসলিম হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

সর্বদাই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। আপনাদের মধ্যে যারা নও-মুসলিম তারা অবশ্যই এ কথার অর্থ কী বুঝেন। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আমরা আরো বেশি শক্তিশালী হই, আরো বেশি শিখতে থাকি ও আমি আশাবাদী, প্রভুর দিকে অগ্রসর হই তাঁর নৈকট্য লাভ করতে। আমরা যারা জীবনের কোনো এক সময় ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছি, তারা সত্যিই আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।

আমি আমার পরিবারের সঙ্গে মিটমাট করেছি। ইসলাম সত্যিই এক সঠিক জীবনপদ্ধতির নাম। আমাদেরকে যদি আমাদের মুসলিম ভাই কিংবা অমুসলিমদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হতে হয়, তাহলেও সব সময় ধৈর্যশীল থাকতে হবে- আল্লাহর দিকে নিজেদেরকে মনোনিবেশ করতে হবে।

বন্ধুগণ! আমি যদি কোনো কিছু অতিরিক্ত বা অযৌক্তি কিছু বলে থাকি তাহলে সেটা আমার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যাকিছু আমি সঠিক ও যৌক্তিক বলেছি তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তিনি যেনো তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বর্ষণ করেন অফুরন্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ। আমীন।[৮৮]

৮৮ https://www.islamreligion.com/articles/456/craig-robertson-ex-catholic-canada-part-2/

পংকারদাস রোমাস

প্রাক্তন খ্রিস্টান - ফিলিফাইনস

খ্রিসস্টধর্মে শক্ত বিশ্বাসী এ ব্যক্তি আসল সত্যোপলব্ধি দ্বারা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করেন

আমি ২ ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালে ফিলিফাইনের কৌসাগানের লানাও ডিনর্টে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করি। জন্ম থেকেই দেখেছি আমার মা-বাবা সেভেন্থ ডে এডভেন্টিজ[৮৯] ছিলেন। এটি হচ্ছে খ্রিস্টবাদের হাজার ফিরকার একটি মাত্র। অতীতে এই এডভেন্টিজ চার্চের একজন ইভাঞ্জেলিস্ট[৯০] ছিলাম। শিশু থেকে ১৯৮১ সালে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এই সেভেন্থ ডে এডভেন্টিজ চার্চের একজন ভক্ত-অনুরক্ত প্রার্থনাকারী ছিলাম।

মুসলিম নিধন সজ্ঞ

আমার পিতা সিভিলিয়ান মোহ ডিফেন্স ফোর্সের সদস্য ছিলেন। প্রয়াত স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট ফার্দিনেন্দ এদরালিন মারকোস এ গোপন ডিফেন্স ফোর্সের জন্ম দেন ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে। আমার পিতা ইলোঙ্গো ল্যান্ড গ্রাভিং এসোসিয়েশন নামক একটি সঙ্ঘের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। কট্টর খ্রিস্টান এ দলের কাজ ছিলো ছলে-বলে-কৌশলে মুসলিম জায়গা-জমি দখল করা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো দক্ষিণ ফিলিফাইনকে মুসলিমশূন্যে পরিণত করা। এ দলের সদস্যরা বিশ্বাস করতো, তাদের পরনে আছে একটি অদৃশ্য বুলেট-প্রুফ জামা। বুলেট তাদেরকে ছুঁতে পারবে না।

---

[৮৯] Seventh Day Adventist - হচ্ছে খ্রিস্টান প্রটেসট্যান্ট চার্চের অনুসারী এক ফিরকা। এরা রোববারের বদলে ইয়াহুদিদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শনিবারকে পবিত্র দিন মনে করে। এদিনই তারা চার্চে যায় উপাসনা করতে। সুতরাং তারা ইয়াহুদিদের সাভাথকে অনুসরণ করে থাকে।

[৯০] খিস্টবাদে দীক্ষিত করার কাজে জড়িত মিশনারী ব্যক্তি।

তারা তাদের শিকারদের ডান কান কেটে রোস্ট করে খেয়ে ফেলতো! বাকি কানগুলো জ্বালিয়ে ছাই করে বোতলে ভরে রাখতো সুগন্ধি মিশিয়ে। তারা বিশ্বাস করতো, যতো বেশি মুসলিম হত্যা করা যাবে ততো বেশি তাদের ক্ষমতা বাড়বে।

শিশুকালে ব্রেনওয়াশের শিকার

শিশু থাকতেই আমার মগজ ধোলাই করা হয় বার বার একথা বলে: মুসলমানরা ধর্মদ্রোহী অবিশ্বাসী প্যাগান। আমাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়, মুসলিমরা যোদ্ধাংদেহী, প্রতারক, অমুসলিম হত্যাকারী, অসভ্য ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক দোষে দোষি। বাস্তবে খ্রিস্টান থাকতে ইসলাম, মুসলিম ও মোরোজ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বিশ্বাসই করতাম না। এদের সবই ছিলো প্যাগান, নাস্তিক। মুসলমানরা তখন আমার নিকট শুধু প্যাগান নয় ‘বোকাও’ ছিলো।

ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপট

আমাকে রক্ষণশীল খ্রিস্টান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (চার্চ স্কুল) পাঠানো হয় ছোট থেকেই। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু অবস্থায়ও আমাদেরকে বাইবেল খুলে বিভিন্ন শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিতে শিক্ষা দেওয়া হতো। চার্চের মিম্বরে দাঁড়িয়ে স্মার্টভাবে বক্তৃতা প্রদানের ট্রেনিং দেওয়া হয়। যুবক থাকতেই আমি সেভেন্থ ডে এডভেন্টিজ চার্চের মিনিস্টার (বক্তা) হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। আমি অধ্যয়ন করেছি সাউদার্ন মিন্ডানা একাডেমি, মাতুতুম ভিউ একাডেমি, ফরেস্ট হিল একাডেমি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে। ডিগ্রী সমাপ্ত করি ডুমাগুয়েট সিটিতে প্রতিষ্ঠিত সিলিমান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যুবক থাকতেই আমি ব্যাটেলিয়ান প্যারামিলিটারী ট্রেনিং দিয়েছি। আমি সিনিওর স্টুডেন্টস প্রেসিডেন্ট, ইয়ুথ অর্গেনাইজেশনের চেয়ারম্যান, সাইন্স ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও সাব্বাথ স্কুল সুপারিনটেন্ট ছিলাম।

ট্রেনিং গ্রাউন্ড

ফিলিফাইনের প্যাগাডিয়ান সিটিতে খ্রিস্টান মিশনারী বক্তা হিসেবে আমি ট্রেনিং নেই ১৯৮১ সালে। বিশেষকরে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রচার কীভাবে করবো সেটা আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মেডিকেল বই-পুস্তক বিক্রির নামে আমরা এডভেন্টিজম খ্রিস্টবাদ প্রচার করতাম। পরবর্তীতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে আমাদেরকে প্রচারকার্যে প্রেরণ করা হয় দক্ষিণ ফিলিফাইনের জাম্বোওয়াঙ্গা শহরে। আমরা ঘরে ঘরে, অফিসে অফিসে যেয়ে প্রচার করি। আমাদের মূল টার্গেট ছিলো খ্রিস্টান ধনীদের কাছ থেকে টাকা চাঁদার মাধ্যমে সংগ্রহ করে খ্রিস্টবাদকে মুসলিমদের মধ্যে সর্বত্র প্রচার-প্রসার করা। আজো বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই কাজ অব্যাহত আছে। মোটকথা ফিলিফাইনকে মুসলিমশূন্য করার এক বিরাট পরিকল্পনা সক্রিয় আছে।

প্রথম সাক্ষাৎ

জাম্বোওয়াঙ্গা শহরের সান্তা বারবারা জেলায় আমাকে একবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় আল-মালিন শিপিং লাইনের অফিসে। উদ্দেশ্য আমাদের মুসলিমবিরোধী প্রচার চালানো। এখানেই সর্বপ্রথম আমার সাক্ষাৎ ঘটে একজন মুসলিম গবেষকের সাথে। তার নাম নাজিব রাজুল ফারনানডেজ। তিনি একজন নও-মুসলিম। অতীতে তার নাম ছিলো সামুয়েল ফারনানডেজ। তিনিও ছিলেন সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট ইভাঞ্জেলিস্ট। পরে জানতে পারি আমরা উভয়ে শিশুকালে পড়শি ছিলাম। আমার মা-বাবা ও তার চাচার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলো।

আমি মিস্টার নাজিব ফারনানডেজের নিকট নিজেই নিজেকে পরিচিত করি। তিনি খুব উষ্ণ স্বাগত জানান। তার অফিসে আমার ভিজিটের কারণ জানতে চান। তিনি আল-মালিন শিপিং লাইন অফিসের একজন সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার ছিলেন। কিছু বলার পূর্বে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,

"আপনি কী সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট সদস্য?" জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, অবশ্যই!"

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: "আপনি কী জিসাস ক্রাইস্টে বিশ্বাস করেন?"

জবাব দিলাম: "অবশ্যই! আমরা সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট হতে পারবো না জিসাসকে বিশ্বাস না করলে।"

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: "তোমার ধর্ম সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট। জিসাস কী সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট ছিলেন?

এ পর্যায়ে এসে আমি বুঝতে পরি যে, যদি 'হ্যাঁ' উত্তর দিই তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হবে, 'তোমার বাইবেলে দেখাও, জিসাস সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট ছিলেন বলে কোথায় লেখা আছে?' অথচ আমি ভালো করেই জানি বাইবেলে এরূপ কোনো বর্ণনাই নেই। আমি এ প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার জীবনেও এ প্রশ্নের মুখোমুখি হই নি। আমি প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করি- কিন্তু তিনি বার বার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করছিলেন। এরপর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি নিজে যদি এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারো তাহলে যাও, তোমার টীম লিডারকে যেয়ে জিজ্ঞেস করে তার উত্তর কী তা আমার নিকট নিয়ে আসো।"

সত্য উন্মোচন

মিস্টার নাজিব ফারনানাডেজ মুসচি হেসে বললেন, "তোমার নেতাও এ প্রশ্নের জবাব দেবেন না। শুনো, জিসাস ক্রাইস্ট আলাইহিসসালামের নাম মুসলমানদের কাছে ঈসা ইবনে মারিয়াম। জিসাস একজন নবী ছিলেন। অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো তিনিও গডের বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। মুসলমানদের এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। বাস্তবে আল্লাহর সব নবী-রাসূল মুসলমান ছিলেন। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় পুনরুত্থান, বিচারদিবস, বেহেশত, দোযখ, ফিরিশতা, নবুওয়াত, নৈতিকতা, আসমানী কিতাব ইত্যাদি বিষয়ে।" এসব শব্দ আমার

কানে যেনো বজ্রপাতের মতো আঘাত হানছিলো। আমাকে যেনো সজাগ করে দিলো এক দীর্ঘ গভীর ঘুম থেকে।

উক্ত কথাগুলো আমার টীম লিডারের নিকট খুলে বললাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেরি, ইউসুফ এবং জিসাস ক্রাইস্টের ধর্ম কী ছিলো?" তিনি কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, "এই মিস্টার ফারনানডেজের সাথে আর কোনো কথা বলবে না। বললে, তুমি বহিষ্কৃত হবে আমাদের গ্রুপ থেকে!"

আমার টীম লিডারের এরূপ অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হেতু আমি কিন্তু আরো কৌতুহলী হয়ে ওঠলাম ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে। আমাকে আরো জানতে হবে। একই সময় আমার সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অন্তরে সন্দেহও জাগ্রত হলো। ভাবলাম, যদি আমার ধর্মবিশ্বাস সত্য হয়ে থাকে তাহলে কেনো আমি অন্য ধর্মের সম্মুখে ভয় পাবো?

টীম নেতার সতর্কবার্তা অমান্য করে আমি পুনরায় মিস্টার ফারনানডেজের নিকট চলে আসি। তিনি এবার আমাকে প্রশ্ন করলেন, "মিস্টার রোমাস, বলুন তো মেরি ও জিসাসের ১২ অনুসারী কী জিসাসকে গড হিসেবে উপাসনা করেছিলেন, যেভাবে আজকের খ্রিস্টনরা করে থাকে?" আমি সম্পূর্ণ বোকা হয়ে গেলাম। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। ফিরে গেলাম আমাদের জাম্বোওয়াঙ্গা শহরের অফিসে। এ প্রশ্ন নিয়েও টীম নেতার সঙ্গে তর্কবিতর্ক হলো। টীম লিডার রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আর নয়! তোমার সবকিছু গেছগাছ করে এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও!" যদিও আমি তখনও ইসলামে দীক্ষিত হই নি- কিন্তু টীম লিডারসহ সবাই ভাবলো আমি মুসলিম হয়ে গেছি। তাদের ভাষায় 'ইনফিডেল' (অবিশ্বাসী) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছি। মুসলিম কমিউনিটিতে যেয়ে কাজ করার যোগ্যতা হারিয়েছি। আমাকে এসডিএ বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে যেতে বাধ্য করা হলো। অশ্রু সজল চোখে আমি বেরিয়ে আসি।

তবে এটাই ছিলো আমার জীবনের সর্বাধিক ফলপ্রসু ঘটনা। বাতিল ওসব দুনিয়ালোভী ধর্মব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আমি ব্যাপক গবেষণায় লেগে যাই ইসলাম নিয়ে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মহান

আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়ার নজর দেন। আমি শেষ পর্যন্ত **১৯৮১** সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিফাইনের বাসিলানের ইজাবেলায় শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে মুসলমান হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ!

আমি ইসলামকে গ্রহণ করেছি এ কারণে যে, আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামই হচ্ছে সত্যিকার জীবনপথের সঙ্গী যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও পছন্দকৃত। তিনি তাঁর সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে এ জীবনবিধান তাঁর বান্দাদের চিরন্তন উপকারার্তে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে বর্তমানে একমাত্র অবিকৃত, অপরিবর্তিত আসমানী কিতাব হচ্ছে কুরআন শরীফ। এর প্রতিটি আয়াত মহান আল্লাহর বাণী। আমি অমুসলিমদের প্রতি আকুল আবেদন জানাই, আপনারা ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করুন। কুরআন পাঠ করে দেখুন। আল্লাহর রাসূলের সহীহ বাণীসমূহ পড়ুন। দেখবেন আপনাদের নিকটও সত্য উন্মোচন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরে সাহায্য করুন। আমীন।[৯১]

[৯১] https://www.islamreligion.com/articles/1927/poncardas-romas-ex-christian-philippines/

ড. মুস্তফা মৌল্ড

প্রাক্তন ইয়াহুদি - আমেরিকা

চল্লিশ বছরের আধ্যাত্মিক ভ্রমণশেষে এক ইয়াহুদি বুদ্ধিজীবীর ইসলামগ্রহণ

'অডিসি' হচ্ছে একটি দীর্ঘ ভ্রমণের নাম। শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক 'অডিসিউস' থেকে। অডিসিউস (লাতিনে উলিসেস) হচ্ছে হোমারের মাহকাব্যের নায়ক। তার বাড়িতে ফেরার ভ্রমণে দশ বছর লেগেছিলো। পথিমধ্যে অনেক বাঁধা-বিপত্তি, পরীক্ষা, বক্রতা, বিপদ-আপদ ও দুঃসাহসিক অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার ইসলামে ভ্রমণ- বাড়িতে ফেরার সফরও অনেকটা অডিসিউসের মতো। আমি যখন আমার অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই একেবারে শিশুকাল থেকে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ পর্যন্ত দীর্ঘ ভ্রমণ- যার ব্যাপ্তি ৪০ বছর। কতো ইশারা, কতো বক্রতা, কতো ঘটনা- কিছু অত্যাশ্চর্য, কিছু সাধারণ আর কিছু তুচ্ছ্য তার ইয়ত্তা নেই। তবে সবই আল্লাহর হুকুমে ঘটেছিলো আমাকে তাঁর সত্যধর্ম ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে।

আমেরিকার বোস্টনে আমি বড়ো হই। তখনকার দিনে এটা অনেকটা ক্যাথোলিক শহর ছিলো। অধিকাংশ খ্রিস্টান ছিলেন আইরিশ ও ইতালিয়ান। এছাড়া ছোট্ট কিন্তু বৈশিষ্টপূর্ণ অনেকে ছিলো কৃষ্ণাঙ্গ, ইয়াহুদি, চাইনিজ, গ্রিক, আর্মেনিয়ান ও আরব খ্রিস্টান। সে যুগে এদের প্রত্যেক দলের একেকটি নিজস্ব এলাকা ছিলো। রাস্তায় রাস্তায় ছিলো অনেক গ্রিক ও সিরিয়ান রেস্টুরেন্ট। আমি বড় হই গ্রিকদের সালাদ, শিশ কবাব, লাহম মিশউই, কিব্বি, গ্রেপ পাতা, হুমুস ইত্যাদি মজাদার প্রাচ্যের খাবার খেয়ে।

আমার পরিবারবর্গ ছিলেন ওয়ার্কিং ক্লাস রক্ষণশীল ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমার দাদা রাশিয়া থেকে ১৯০৩ সালে পালিয়ে আসেন। তখন রুশ শাসকগোষ্ঠি ইয়াহুদি-নিধন প্রক্রিয়া জোরোসুরে চালাচ্ছিলো। বোস্টনে এসে তৈরি পোষাক শিল্পে তারা কর্মরত হন। অত্যল্প কিছু মানুষ প্রযুক্তির

ওপর দক্ষ ছিলো। তারা বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের শিল্প-কারখানায় কাজ করতো। আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী আমিই ছিলাম। আমরা সবাই কশার (ইয়াহুদিদের হালাল খাবার) ভক্ষণ না করলেও কখনও শূকরের মাংস ঘরে ঢুকে নি। ইয়াহুদি সব ছুটি ও উপবাস মানা হতো। আর অনেক বছরব্যাপী আমাকে যেতে হতো প্রত্যেক শনিবারে সিনোগগে।

যে সিনোগগে আমরা যেতাম তা বাড়ির নিকটেই ছিলো। এটা ছিলো রক্ষণশীল, গোঁড়া ও অনেকটা মডারেট। এটা খুব ঐতিহ্যবাহী ছিলো কিন্তু মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিলো সীমিত। আমি হিব্রু স্কুলে যাই ৬ বছর বয়সে। ইসরাইলের জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে। তখন থেকেই জায়োনিস্ট (ইয়াহুদিবাদী) প্রোপাগান্ডা দ্বারা পারিপার্শ্বিকতা ভরে ওঠে। এছাড়া নাৎসি, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি ছিলো আলোচনার শীর্ষ বিষয়াদি। তখনও অবশ্য অনেক অভিবাসী ছিলেন যারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

আমার হিব্রু শিক্ষকদ্বয় ছিলেন দুজন ইসরাইলী সহোদর। তারা ছিলেন গোঁড়া ইয়াহুদি এবং ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক। তাদের কাছ থেকে আধুনিক হিব্রু ভাষা ও জায়োনিস্ট ভাবাদর্শ শিক্ষা করি। এছাড়া ইয়াহুদি ধর্মশিক্ষা তো ছিলোই। আমি বেশি ধার্মিক ও কট্টর জায়োনিস্ট হয়ে ওঠি। আমি বিশ্বাস করতাম ইয়াহুদিদের নিজস্ব দেশ থাকা দরকার যাতেকরে আরেক হিটলার এসে তাদের ধ্বংস না করে। ঐ আইরিশ ছেলেরা আমার সঙ্গে কখনও একমত হতো না। আমি আমেরিকায় 'নিজের বাড়িতে আছি' বলে অনুভব করতাম না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম শহর ছেড়ে একটি কিব্বুজে (ফার্মে) যেয়ে বাকি জীবন কাটাবো।

এখন যখন আমি নামায আদায় করি তখন ইয়াহুদিদের একটি আমলের কথা আমার মনে পড়ে। তাদের উপাসনায়ও 'সিজদা' ছিলো। আমি দেখেছি কীভাবে 'ইয়োম কাপুর' উপবাসের সময় সিনোগগের পুরো উপস্থিতির পক্ষে রাবাই 'সিজদা' দেন। আমি তখনই চিন্তা করতাম, প্রতীকী সিজদা হিসেবে 'ওয়ালিং' (ইয়াহুদিদের উপাসনা পদ্ধতি) না করে সবাই যদি সত্যিকার 'সিজদা' দিতো তাহলে কতোই না ভালো হতো।

হাই স্কুলে পড়ালেখার সময় বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরিটির অনুসন্ধান পেলাম। লাইব্রেরিতে মিউজিক শেলফে দেখতে পাই মধ্যপ্রাচ্যের মিউজিক: এ্যারাবিক, তুর্কী, ফার্সি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী মিউজিকের ক্যাসেট-সিডি ছিলো। এগুলো ধার করে নিয়ে যেয়ে মনোযোগসহ শ্রবণ করতাম। আমার খুবই ভালো লাগতো।

স্কুলে আমার এক বন্ধু ছিলো। সে আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সে প্রায়ই পাঠ করতো দর্শন, কাবিতা ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি। আমি প্রথমোক্ত দুটির প্রতি তেমন আগ্রহশীল ছিলাম না। তবে ধর্ম বিষয়ে আমার আগ্রহ ছিলো প্রবল। হিন্দু, বৌদ্ধ, টাওয়িস্ট এবং কুরআন সম্পর্কিত অনেক বই পাঠ করেছি। আমি লক্ষ করলাম, এগুলোতে বর্ণিত কাহিনীগুলো অনেকটাই বাইবেলে বর্ণিত কেচ্ছা-কাহিনীর মতো। কিন্তু অনুভব করলাম সবগুলোই ছিলো ইয়াহুদিবাদ বিরোধী। একটি ব্যাপারে আমি চিন্তা করি, জিসাসকে নবী হিসেবে দেখা হয়েছে, ইয়াহুদি রাবাই হিসেবে নয়। আমি এটি গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। ক্যাথোলিক সহপাঠীদেরকে এ কথা দ্বারাই জবাব দিতাম। তারা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো জিসাস সম্পর্কে আমার ধারণা কী ছিলো। তাদের অধিকাংশ জিসাস নবী হওয়ায় খুব বেশি অসন্তুষ্ট হতো না।

আমি একটি উচ্চ পর্যায়ের ইয়াহুদি স্কুলে যেয়ে ইয়াহুদি ইতিহাস, হিব্রু ভাষা, তাওরাত, এ্যারামেইক ও তালমুদ (ইয়াহুদি ফিকাহ) ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করি। তবে আমার আগ্রহ বেশি ছিলো ভাষাশিক্ষার ওপর। এসময় ১৫ বছর বয়সে আমি আমার বিশ্বাসকেও হারাই। আমি আর (ইয়াহুদিদের ব্যাখ্যাত) এক প্রভুতে বিশ্বাসী ছিলাম না। ইতোমধ্যে আমি ধারণা করতাম, যদি গড আমাদেরে কিছু বিশেষ কার্যাদি করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে আমি এগুলো না করে থাকি কীভাবে? সুতরাং আরো বেশি গোঁড়া হতে চেষ্টা চালাই। এরপর একদিন ভাবলাম, গড যদি আমাদেরকে এসব করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে গডের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে কী? আমি কী গডে বিশ্বস করে যাবো? আমি ঠিক জানি না। হয়তো বিশ্বাস করি না। আর গড না থাকলে তো এসব করার প্রয়োজনই নেই। সুতরাং আমি উপাসনা বন্ধ করে

দিই। আপনি বিশ্বাস করবেন না- আমার পিতা কী পরিমাণ রাগান্বিত হয়েছিলেন।

আমি দেখেছি অনেক লোক বিশেষ করে রোমান ক্যাথোলিক ও কট্টর প্রটেসস্ট্যান্ট, ধর্মবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে পড়তে খুবই উদগ্রীব। বার বার নরকের আগুন, চিরকালের জন্য অভিসম্পাত, নানদের কর্তৃক স্কুলে থাকাকালে কটোর শরীরিক শাস্তি ইত্যাদির ফলে ধর্মের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। কারণ তারা তো ছিলো ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। অনেকে ধর্মবিশ্বাসকে ‘জেলখানা’ মনে করতো। এ থেকে বেরিয়ে পড়লে ভাবতো মুক্তি পেয়েছে। তবে আমার অনুভূতি ভিন্ন ছিলো। আমি এদের অবস্থা দেখে কষ্ট পেতাম। কারণ তাদের এ অনুভূতির মূলে আছে মানবসৃষ্ট, বাতিল, বানোয়াট, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত ধর্মবিশ্বাস।

অপরদিকে অবিশ্বাসীর (নাস্তিকদের) মধ্যে আরো মারাত্মক এক ক্রিয়া কাজ করে। জেফরি ল্যাং তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে লিখিত গ্রন্থে বলেন, একজন নাস্তিকের মনে এক অসহনীয় শূন্যতা একাকীত্ব বিরাজ করে। তাদের অসহনীয় অবস্থা বিশ্বাসীরা কখনও বুঝতে পারে না। পৃথিবীটা (মহাবিশ্ব) উদ্ভট- একটি দুর্ঘটনার ফল, বিজ্ঞানে আছে বা বের হবে সকল প্রশ্নের জবাব, জীবনের কোনো বাস্তব অর্থ নেই, মৃত্যর মাধ্যমেই সবকিছুর ইতি ঘটে- ইত্যাদি বিশ্বাস নিয়েই নাস্তিকরা জীবন কাটায়। হ্যাঁ, আপনি সমাজে প্রভাব ফেলতে পারবেন, সন্তানাদির মা-বাবা হতে পারেন; আপনি সমাজে অনেককিছু করতেও পারেন; গড়তে পারেন ইতিহাস, ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে স্মরণীয় হয়েও থাকতে পারেন- এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে, সূর্য যখন নিভে যাবে, মানবজাতি হয়তো অন্যান্য তারাসিস্টেমে যেয়ে কলোনি বানাতে পারে, এমনকি অপর দূরবর্তী গ্যালাক্সিতেও যেতে পারে। কিন্তু অবশেষে ১৫ বিলিয়ন বছর পরেও হলে এ মহাবিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে কিংবা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে বা অন্য কিছু। সুতরাং শেষ পরণতি শূন্য। যেটি চিরন্তন তাহলো শূন্যতা। জীবন, তাহলে অর্থহীন ও মৃত্যু হচ্ছে ভয়ঙ্কর। সত্য ও নীতিনৈতিকতা তাহলে আপেক্ষিক হয়ে যায়। এর ফলে নৈতিক বিভ্রান্তি, সুখভোগ বা অন্য কোনো নিকৃষ্ট ব্যাপার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে

পারে। ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি কোনো ধরনের বেআদবির বদলে (যা নাস্তিকরা করে থাকে) আমি অনুভব করি সম্মানবোধ। সময় সময় অনুভব করি হিংসা। কারণ তারা তো অনেকটা নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে।

আমি কোন অদৃশ্য শক্তির কবলে পড়ে রাতারাতি একজন গোঁড়া ইয়াহুদি থেকে একেবাবে নাস্তিকে পরিণত হয়ে গেলাম। তবে আমি তখনও ইয়াহুদি ভাষা, কৃষ্টি, মিউজিক, খাবার ও ইতিহাসকে ভালোবাসতাম। আমি তো ছিলাম এক 'জন্মগত' ইয়াহুদি এবং জায়োনিস্ট। জায়োনিজম একটি পলিটিক্যাল দর্শন। এখানে ধর্মের স্থান খুব একটা নেই। বাস্তবে ওই সময় অনেক গোঁড়া ইয়াহুদি জায়োনিজমের বিরোধিতা করে।

ষাটের দশকের শুরুতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। তখন বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রথম প্রটেসস্ট্যান্ট, আফ্রো-আমেরিকান ও মসুলিম বিদেশী বড় বড় দলের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি আর ইয়াহুদি-বিরোধিতার সম্মুখীন হই নি। বছরের শেষেই আমি শূকরের মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত হই। আমি স্টুডেন্ট অর্গেনাইজার হিসেবে কাজ শুরু করি। ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা করি স্টুডেন্টস জায়োনিস্ট অর্গেনাইজেশন। সিনিওর বছরে নির্বাচিত হই নিউ ইংল্যান্ড জায়োনিস্ট মুভমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

চল্লিশ দশকে একদল কট্টর ইয়াহুদি দক্ষিণপন্থী 'হিরুত পার্টি' প্রতিষ্ঠা করে। এরা ছিলো ইয়াহুদিবাদ প্রসারণে বিশ্বাসী ও সন্ত্রাসী। আমরা এদেরকে মৌলবাদী উগ্র পাগল বলতাম।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হলে আমি এর বিরোধিতা করি। আমি যোগ দিই স্টুডেন্ট নন-ভাইলেন্ট কোওর্ডিনেইটিং কমিটিতে। ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্রেটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় জড়িত ছিলাম। ড. মার্টিন লুথার কিংয়ের (১৯২৯-১৯৬৪) ডাকে যে সিভিল রাইটস মার্চ হয়েছিলো ১৯৬৩ সালের আগস্টে ওয়াশিংটন ডিসিতে, আমি সেটিতে যোগ দিই। ড. কিং থেকে ৬০ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছিলাম তার ঐতিহাসিক বক্তব্যটি।

ইয়াহুদি ধর্মবিশ্বাস হারাই ১৫ বছর বয়সে এবং জায়োনিজমকে ইস্তিফা দেওয়ার সময় আমি ২২ বছর বয়সে পদার্পণ করি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতার অংশ হিসেবে পিস কোর্পস নামক একটি সঙ্ঘে যোগ দিই। আমার উদ্দেশ্যে ছিলো ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা। আমার গ্রুপ আমাকে নির্বাচিত করে শান্তির মিশনে পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় যেতে।

অতি সুন্দর আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় যেয়ে আমি খুব আনন্দিত হই। এ দেশের লেক ভিক্টোরিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়ে বিশ্ববিখ্যাত নীল নদী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মিসর হয়ে ভূমধ্যসাগরে যেয়ে মিলিত হয়েছে। সে দেশের ছাত্ররা জানতো কীভাবে শিক্ষকদের সম্মান দেখাতে হয়। আমি শিক্ষাদানের পাশাপাশি নতুন ভাষা ও কৃষ্টি শিখে নিচ্ছিলাম। সেখানকার আফ্রিকান ও ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানী খাবারের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সেখানে অবসর সময়ে বেশি কিছু করার ছিলো না। স্থানীয় ইন্ডিয়ান সিনেমায় যেয়ে ছবি দেখে সময় কাটাতাম। মুহাম্মদ রফির গান ও কাওয়ালী ছিলো আমার খুবই প্রিয়। এছাড়া ইসলামী, ওমানী আরবদের সঙ্গ পাই মুম্বাসা, দারুসসালাম ও জানজিবর সমুদ্র সৈকতে। এটাই ছিলো জীবনের প্রথম যখন আমি শুনতে পাই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠের সুমধুর আযান ধ্বনি। আমি দুটি আফ্রিকান ভাষা একই সাথে শিক্ষা করছিলাম: সুহাইলি ও লুগান্ডা।

আমি ফিরে আসি আমেরিকায় মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ হয়ে। তবে ইসরাইলেও কিছুদিন কাটাই। এটা ছিলো ১৯৬৯ সালের কথা। আমি তখন আর জায়োনিস্ট ছিলাম না- এরপরও ইসরাইলের অবস্থা দেখে অবাক হই। আমি অবশ্যই জেরুজালেমের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের উপমা দেখে উপকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিলো সত্যিই এক অদ্ভুত দেশে অবস্থান করছি- অথচ সেখানকার মানুষগুলো আমারই মতো ইয়াহুদি বংশদ্ভুত ছিলো।

আমি পশ্চিম তীরে যাই নি। তখনও ইয়াহুদিরা সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে নি কিন্তু। তবে পূর্ব জেরুজালেমে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে পারি নি। সুলেমানের টেম্পলের দেওয়ালে দাঁড়ানো, ডোম অব দ্যা রক, আল-

আকসা মসজিদ ইত্যাদি দেখে আমার মধ্যে যে তীব্র অনুভূতি সে সময় জাগ্রত হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তবে এখন আমি কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে পারি। আমি যেনো অনুভব করি এক ধরনের পবিত্রতা; এমনিতেই জেরুজালেমের ইসলামী নাম আল-কুদস হয় নি। আমাকে কিন্তু ফিলিস্তিনীদের দ্বিতীয়-শ্রেণিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া খুব আহত করেছে। আমি যে আমেরিকায় বড়ো হয়েছি ইয়াহুদিরা সব সময় সামাজিক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলো এবং এখনও আছে। আমার নিকট ইসরাইল কোনো ইয়াহুদি রাষ্ট্র ছিলো না।

আমার জীবনের পরবর্তী ১০ বছর- ‘৬৯ থেকে ’৭৯ কাটে আমেরিকার লস এ্যাঞ্জেলেসে। এ দশকের মধ্যে দুটি ব্যাপার ছিলো এ বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসরাইলী লিকুদ সরকার কর্তৃক ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব ভূমি দখল করে তাদের ঘরবাড়ি বানানো। এ ঘটনাটি আমাকে দারুনভাবে বিদ্রোহী করে তুলে। নন-জায়োনিস্ট থেকে আমি এন্টি-জায়োনিস্টে পরিণত হই। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি যা আমার নিকট আরো ঘৃণ্য ছিলো- আমেরিকান ইয়াহুদিদের কর্তৃক এ লিকুদ পার্টির গুন্ডাদের প্রতি সমর্থন। আমি মনে করেছিলাম নিরবে হলেও তারা বেগিনের নেতৃত্বাধীন এ পাগল সরকারের বিরোধিতা করবে।

টিভি নিউজে যেসব বসবাসকারী ইন্টারভিউ দিয়েছিলো তারা সবাই ছিলো আমেরিকান ইয়াহুদি। এই আমেরিকায় থেকে, সিভিল অধিকার আন্দোলন করে, কীভাবে এসব আমেরিকান ইয়াহুদিরা সেখানে যেয়ে অপরের অধিকার এভাবে হরণ করলো? ইসরাইলী ইয়াহুদিরা এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেছে, অথচ আমেরিকানরা করলো না। আমি খুব লজ্জা, প্রতারিত ও বিরক্তিবোধ করেছি।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর ১৯৭৯ সালে আমি আফ্রিকায় ফিরে যাই। নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিদ প্রফেসর হিসেবে যোগ দেই। মাত্র দু সপ্তাহ পূর্বে আমার পিতাও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টির কয়েকজন সদস্য আমার বন্ধু হিসেবে পাই। এদের মধ্যে দুজন, ডিপার্টমেন্ট প্রধান ও এক ইতিহাসের অধ্যাপক উভয় মুম্বাসার অধিবাসী এবং মুসলিম ছিলেন। এছাড়া বন্ধু হিসেবে আরো পেলাম আরবি ভাষার অধ্যাপক-

আমার পড়শি সুদানি এক ভদ্রলোক। প্রায়ই আমি ফ্যাকাল্টি ভোজনালয়ে এদের সাথে বসে খাবার খেতাম। আর তাদের প্রতি সম্মানবোধ (ও লজ্জাবোধ- কারণ আমি জানতাম একজন ইয়াহুদি ছিলাম- তা তারাও জানতেন) হেতু আমি কখনও তাদের সামনে বসে শূকরের মাংস ভক্ষণ করি নি। কিছুদিন পর শূকরের মাংস খাওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিলাম। প্রায়ই আমরা মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও ইয়াহুদিবাদ নিয়ে কথা বলতাম। আমি অবাক হই এটা দেখে যে, তারা ইয়াহুদী ধর্মবিরোধী ছিলেন না বরং ইসরাইল বিরোধী ছিলেন। তারাও অবাক হন, একজন ইয়াহুদি হয়ে আমি ইসরাইল বিরোধী ছিলাম।

হাতে বেশ কিছু সময় থাকায় আমার অধ্যয়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। বিশেষকরে ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত, খ্রিস্টানদের বাইবেল (নিউ টেস্টেমেন্ট) এবং নতুনভাবে কুরআন অধ্যয়নে মনোযোগী হলাম। এছাড়া আদি যুগের মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম। সিরাত ও হাদীস পাঠ ইতোমধ্যে মোটেই করি নি। সুতরাং এবার এদিকেও দৃষ্টিপাত করলাম। তবে স্বভাবতই আমার মধ্যে এ প্রতিক্রিয়া পুনরায় জেগে ওঠলো: ইয়াহুদিদের ব্যাপারে কেনো ইসলামী সূত্রগুলো এতো নেতিবাচক? কিন্তু আমার মেমোরি এবার ফ্রেশ হলো। দেখলাম স্বয়ং তাওরাত ও পুরাতন টেস্টেমেন্টও কুরআন থেকেও আরো বেশি নেতিবাচক ছিলো। আর মদীনার ইয়াহুদিরা তো সত্যিই ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছিলো।

কোনো এক জ্ঞানবান বলেছিলেন, তোমার ধর্মবিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বাস আছে বলে ভান করো- দেখবে তোমার বিশ্বাস বেড়ে যাবে! আফ্রিকানরা হতে পারে খ্রিস্টান, মুসলিম বা অন্যকিছু কিন্তু তারা খুবই আধ্যাত্মিকভাবে সচেতন। নাস্তিক হওয়া তাদের জন্য ছিলো বোধগম্যহীন ও উপহাসস্বরূপ। এটা জানার পর আমি কখনও কাউকে 'আপনি কোন ধর্বাবলম্বী?' এ প্রশ্নের জবাবে নাস্তিক কথাটি উচ্চারণ করি নি। আমি জবাব দিতাম, এক গডে বিশ্বাসী। তবে কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী নয়। কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়- বার বার এভাবে বলতে বলতে আমি গডে বিশ্বাসী হয়ে যাই।

আমি যেনো একজন ডেয়িস্ট[৯২] হয়ে গেলাম- যেমনটি হয়েছিলেন থমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬)। অথবা জয়েন্ট করে নেবো ইউনিটেরিয়ান চার্চে[৯৩]। এরপর আমি এক সুমালি মহিলার প্রেমে পড়ে যাই! সে ছিলো বুদ্ধিমান, ক্ষিপ্র, মায়াবী এবং যৌবনা বিধবা। তার ইংরেজি ছিলো খুব সীমিত আর আমার সুমালি ছিলো শূন্যের কোঠায়! তবে সে এবং আমি সোহালি ভাষায় অনায়াসে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহশীল ছিলাম। তবে কিছু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হলাম।

আমি জানতাম নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছিলো। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে আফ্রিকানাইজ করতে অগ্রসর হয়। তাদের চোখে আমি ছিলাম এক পশ্চিমা সাদা বিদেশী। বেশি বুড়ো হওয়ার পূর্বে আমি চাচ্ছিলাম কোনো স্থায়ী সরকারী বা বেসরকারী পেশার সঙ্গে জড়িত হতে। আমার সুমালি মহিলার সমস্যা ছিলো, আমি ছিলাম অমুসলিম। আমি ভুল বুঝেছিলাম যে, যে কেনো মুসলিম 'কিতাবী' যে কেনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাঁধা নেই। সে বললো, এটা পুরুষের ব্যাপারে সঠিক কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে নয়।

সে (আমার হবু স্ত্রী) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলছিলো। একই সময় অন্যদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেককিছু শিখছিলাম। আমি ইতোমধ্যে এক গডে বিশ্বাস করতাম, গড যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তা-ও মানতাম। আমি ইসলামী তাওহিদ ও শিরক কী ছিলো তাও জানতাম। আমি জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখায় বিশ্বাস করতাম না। আমি এটাও বিশ্বাস করতাম জিসাস ক্রাইস্ট নবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও গডের নবী ও রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করতাম। আর অনেক আগে থেকেই জানতাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুগের সকল মানুষের জন্য সর্বশেষ বার্তাবাহক ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে।

---

[৯২] এরা বিশ্বাস করতো গড বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে একে ভুলে গেছেন।

[৯৩] খ্রিস্টান আন্দোলন, যারা বিশ্বাস করে গড একজন।

আমি শূকরের মাংস খাওয়া বন্ধ করেছিলাম, জুয়াও ছেড়ে দিই। খুব অল্পই এ্যালকাহল পান করতাম। পিস কোর্পস থাকার পর থেকেই আমি আফ্রিকান ও ইসলামী বিনয়, শিশুপালন ইত্যাদি উত্তম মনে করে যাচ্ছিলাম। সুতরাং মুসলিম হওয়াতে তেমন কিছু বাঁধার ছিলো না। আমি তো খুব কাছেই এসে গেছি। তাহলে ১৯৮৩ সালে এসে সমস্যা আর কী ছিলো?

বাস্তবে তখনও আমার মাঝে দুটি সমস্যা বিদ্যমান ছিলো। প্রথমটি হলো আমার পরিচিতি ও ঐতিহ্য। আমি মনে করি কোনো খ্রিস্টানকে তার ধর্ম পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা কঠিন কিছু ছিলো না। জার্মানির কোনো ক্যাথোলিক যদি লুথারেন কিংবা ইয়াহুদি বা এমনকি মুসলমান হয়ে যায়- তবুও সে জার্মানই থাকবে। আমি অবশ্যই অনুভব করতাম প্রথমত আমি আমেরিকান এরপর ইয়াহুদি। আমি কখনও নিজেকে রাশিয়ান ভাবতেও পারি না। আমেরিকায় অভিবাসীরা সব সময় নিজেদেরকে শক্তভাবে পরিবার, জাতি ও নৃতাত্ত্বিক উৎসকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যদিও আমার মাঝে ইয়াহুদিদের ব্যাপারে কোনো বিশেষ অনুভূতি বিদ্যমান ছিলো না- তবুও নিজের পরিচিতি বহাল রাখতে চাইছিলাম।

দ্বিতীয় বাঁধাটি ছিলো আমার পরিবার। গোঁড়া না হলেও তারা ছিলেন শক্ত ঐতিহ্যপ্রেমি, ইসরাইলপন্থী, কেউ কেউ ছিলো জায়োনিস্ট। অধিকাংশ আরবদের শত্রু মনে করতো। আর আমি ধারণা করতে পারি অনেকে মুসলিমদেরেও শত্রু হিসেবে দেখতো। আমার ভয় হচ্ছিলো তারা আমাকে পাগল কিংবা বিশ্বাসঘাতক বলে বর্জন করবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো আমি এখনও তাদের ভালোবাসি- ফলে নিজেই বেশি আহত হবো।

যা হোক, আমি চুক্তি শেষ হওয়ায় ফিরে যাই আমেরিকায়। আশা করছিলাম, আরো ভালো কোনো কাজ মিলবে- আফ্রিকায় হলে আরো উত্তম। কিন্তু কাজ পাওয়া খুব কঠিন ছিলো। আমার তখন না ছিলো বাড়ি, না ছিলো আয়। এমনকি কাজের ইন্টারভিউ দিতে ভালো একটা স্যুট পরতে অপারগ ছিলাম। একটি পশমী স্যুট ও তিনটি টাই ক্রয় করলাম কোনোমতে। থাকতাম ওয়াশিংটনে এক বন্ধুর বাসায়। আফ্রিকায় কাজের অনুসন্ধান করতে করতে আমি আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। বাধ্য হয়ে বোস্টনে যেয়ে বোনের বাড়িতে

থাকতে হলো। সেখানে অন্তত খাবার ও থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু কাজ যেখানে পাওয়া যেতে পারে তা থেকে বোস্টন ছিলো অনেক দূরে। একইসময় আমি একটি কঠিন কালচার-শকের শিকার হলাম। সুতরাং এই তো আমি: অর্থশূন্য, নিঃস্ব, ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি এখন রশিকতা করতে পারি। কিন্তু তখন সত্যিই কঠিন জ্বালা-যন্ত্রণা ও ভীতিকর অবস্থা ছিলো অসহ্যকর। আমি বেশি বেশি প্রার্থনা করা শুরু করি। এক পর্যায়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম: হে গড! আমি যদি আফ্রিকায় ফিরে যেতে পারি ও আমার প্রিয় মানুষটিকে বিবাহ করতে সক্ষম হই তাহলে প্রভুর তোমার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যাবো।

আমি একটি সাধারণ গোদামঘরে সাময়িক কাজ পেলাম। যাক, যাকিছু বেতন পেতাম তা দিয়ে কোনো মতে চলতে থাকি। বাস ভ্রমণের ভাড়া, লন্ড্রীর বিল ও খাবার যোগাড় হয়ে যাচ্ছিলো। এরপর কিছুটা ভালো কিন্তু অনেকটা লজ্জাকর একটি কাজ মিললো অভ্যর্থনার কর্মচারী হিসেবে স্থানীয় কলেজের অফিসে। আমি ভাবলাম, সাইকোলজিস্টরা আমাকে ৪২ বছরের ব্যর্থ ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করবেন, আর আমি তাদের এ ধারণার সঙ্গে একমতও বটে! লজ্জা হেতু আমি নিজের পরিচিতি কারোর নিকট উল্লেখ করার সাহস পেলাম না। আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আজ এক সাধারণ রিসিপশোনিস্ট! যাক, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু পেশার জন্য আবেদনপত্র লিখতে থাকি। আমি একটি পেলাম যেখানে গভর্ণমেন্ট এজেন্সি একজন ইএসএল শিক্ষক খুঁজছিলো মিশরে কাজ করতে। আমার ইচ্ছার কাছাকাছি ভেবে, সাথে সাথে আবেদন করলাম।

কিন্তু ওয়াশিংটনে যেয়ে দেখি কাজটি চলে গেছে। আমি সেখানে যাই অবশ্য আরেক কাজের ইন্টারভিউ দিতে। তবে আমি ইএসএল কাজের এজেন্সির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলাম। ভাবলাম, হয়তো ঐ কাজটি থেকে যেতেও পারে কোনো কারণে। তারা বললো, “আরেকটি কাজ হয়তো শীঘ্রই উপস্থিত হতে পারে। তবে এটি সুমালিয়ায়।

আমি সাথে সাথে বললাম, “সুমালিয়ায়! এ তো বিস্ময়কর!”

মহিলা ইন্টারভিউয়ার আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাই নাকি?"

আমি বললাম, "সিউর! আমি সেখাতে যেতে বেশ আগ্রহশীল। আমি ইতোমধ্যে সে দেশের কৃষ্টি ও ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছি।" আমি কল্পনা করছিলাম, মুগাদিসু থেকে নাইরোবি মাত্র ১ ঘণ্টার রাস্তা। হয়তো আমার ভবিষ্যৎ শ্বশুরবাড়ির সবাইকে দেখতে যেতে পারবো। আমি মহিলাকে সকল রেফারেন্স দিলাম। তিনি এদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তিনি বললেন, আমি তাদের কল করবো। কাজটি থাকলে হয়তো আপনিই পাবেন।

অপর এজেন্সির ইন্টারভিউও শেষ করলাম। তারা আমাকে জানালাহীন অফিসের ছবিও দেখালেন। আমি বোস্টনে ফিরে আসলাম, অনেকটা খুশি হয়ে। হয়তো উভয় জবই আমার জন্য প্রাপ্য হয়ে যেতে পারে- প্রশংসা সবই গডের জন্য। তবে কী চয়েজ! এক বছরের নবায়নযোগ্য কাজ আফ্রিকার ধূলোময় ভারত মহাসাগরের সৈকতে, না হয় সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী কাজ, সেসাথে আকর্ষণীয় পেনশন প্ল্যান একটি জানালাশূন্য ভার্জিনিয়া অফিসে।

দুসপ্তাহ পরে মহিলা আমাকে ফোন করলেন। মুগাদিসুর ইংরেজি প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরের কাজটি আমার জন্য প্রাপ্য হয়েছে। আমাকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত জানাতে দেওয়া হলো ৪৮ ঘণ্টার সময়। সবাই বললো, এটা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ভার্জিনিয়ার স্থায়ী কাজটি হবে উত্তম। তাদের ধারণা এক বা দুবছরের মাথায় আমি বেক-টু-স্কোয়ার-ওয়ানে ফিরে আসবো। বললাম, আমি তো একজন আফ্রিকানিস্ট ছিলাম। অভিজ্ঞতা থাকাটা আমার জন্য হবে প্লাস পয়েন্ট। সুতরাং কারো কথা না মেনে আমি আফ্রিকার কাজটি বেছে নিলাম। আমি লাকী ছিলাম। মাত্র কদিন পরে ভার্জিনিয়ার কাজ আমার জন্য নেই বলে তারা জানিয়ে দিলো।

আলহামদুলিল্লাহ! হয়তো উভয় কাজ থেকেই বঞ্চিত হতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুয়ে দিয়েছেন। আমি কাজে যোগ দিলাম। হয়তো শীঘ্রই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবো। কলেজে আমি একটি নোটিশ প্রদান করলাম। শেষ দিন সাইকোলজিস্ট বরাবরে একটি পত্র

লিখলাম: আমি বর্তমান কাজে অব্যাহতি দিয়ে সুমালিয়ায় ইউএস দূতাবাসে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে যোগ দিচ্ছি। ইতি, এম. মৌল্ড পিএইচ.ডি.।

অবশ্যই আমাকে নাইরোবিতে থামতে হয়েছিলো। সেখানে দুদিন অবস্থান করি আমার প্রিয়া সুমালি নারীর সঙ্গে সময় কাটাতে। আমি কিছু ভবিষ্যৎ প্ল্যান করি। তবে সমস্যা ছিলো আমি কাজে যোগ দিচ্ছিলাম অবিবাহিত হিসেবে। সুতরাং ফ্যামেলি বেনিফিট ও হাউজিং বোনাস থেকে বঞ্চিত হবো। এছাড়া আমি তখনও জানতাম না সুমালিয়া বা আমার কাজটি কিরূপ হবে। আমি ভাবলাম, সময় সময় ভিজিট করা সম্ভব ছিলো। আর ফোনতো আছেই। এছাড়া সে-ও সুমালিয়ায় আসতে পারে নিজের পরিবারবর্গকে দেখতে- সে ছোট থেকেই তাদের দেখে নি।

দূতাবাসের কাজটি বেশ আকর্ষণীয় ছিলো। কিছু শিক্ষকতা- তবে বেশি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা। এছাড়া দূতাবাসের অফিসারদের নিয়ে কাজ করা ইত্যাদি। আমার অধিকাংশ ছাত্র ছিলেন সিনিওর সরকারী চাকুরিজীবী। এদের অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তবে কাজের বাইরে ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কৃষ্টি ও পারিপার্শ্বিকতা ছিলো আফ্রিকার বদলে অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের। উগান্ডা ও কেনিয়ায় সাত বছর কাটানোর সময় ভাষা জানার কারণে মানুষ আমার প্রতি ছিলো অনেকটা খোলামেলো ও বন্ধুভাবাপন্ন। আমার কোনো সমস্যাই হয় নি। কিন্তু মুগাদিসু আমাকে কালচারেল শক দিলো। আমি তাদের ভাষা জানতাম না, কেউ সুহালীতেও কথা বলা জানতো না। আর শিক্ষিত সুমালিয়ান ইতালিয়ান জানতো, ইংরেজি নয়। রাস্তাঘাটের সাইনগুলো সুমালি ভাষায় লেখা ছিলো। সবচেয়ে খারাপ ছিলো যোগাযোগব্যবস্থা। বাড়ির ফোন সব সময় বিজি, পোস্ট অফিস জনসমাগত হেতু গরম! একমাত্র টেলিগ্রাফ সার্ভিসটি ছিলো অনেকটা কার্যকরী। মেইল ছিলো সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্যহীন। শুধুমাত্র ডিপ্লোমেটিক বাক্সগুলো ছিলো নিরাপদ। সময় সময় নাইরোবির সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো প্রায় অসম্ভব।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কিন্তু এসব সমস্যার মাঝেই বেশ খুশিই ছিলাম। দৃশ্য ও গন্ধ, ইতালিয়ান ও সুমালিয়ান খাবার ইত্যাদি ছিলো মনোমুগ্ধকর ও আনন্দের। ভারত মহাসাগরের সৈকত আমার বাড়ি ও অফিস

থেকে হেঁটে যাওয়ার দূরত্বে ছিলো মাত্র। আমি নতুন এক কালচার আবিষ্কার করছিলাম। ডাউনটাউনের ইতালিয়ান দূতাবাসের পেছনে পুরাতন একটি অংশে আমি বাস করতাম। ভোরে আমি জেগে ওঠতাম মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে অপূর্ব সুমধুর আযান ধ্বনি শুনে। আমরা মুসলিম রুটিনে কাজও করতাম: শনি থেকে বৃহস্পিবার, ভোর ৭টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। শুক্রবার দিন আমি হাঁটতে যেথাম। প্রায়ই নিজেকে দেখতে পেতাম আমেরিকান দূতাবাসের পেছনে অবস্থিত ছোট্ট মসজিদটির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জুমুআর নামাযের খুতবা শুনতাম মনোযোগসহ।

লক্ষ করলাম, ইমাম কর্তৃক খুতবা প্রদানের পূর্বে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে। লোকজন ফিসফিস করছে। এরপর শুরু হলো খুতবা। মনে পড়লো সিনোগগে ভোরবেলা (জালম) জবুর কিতাব পাঠ করার কথা রাবাই কর্তৃক। খুতবা আমাকে এক আশ্চর্য শান্তিময় অনুভূতি প্রদান করে। ইমাম যখন জামাআতে নামাযকালে দাঁড়িয়ে মধুর সুরে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করতে শুরু করলেন, তখনও অন্তরে প্রশান্তি অনুভুত হলো। ধীরে ধীরে ইসলাম যেনো আমার জন্য হয়ে উঠছিলো আয়েশি ও অন্তরঙ্গ।

আমি একজন ভাষাবিদ। ফিল্ড রিসার্চে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও কাজ করেছি। সুমালি ভাষা শেখার একখানা বই পেলাম। একজন উস্তাদেরও ব্যবস্থা হলো। তিনি শিক্ষক থেকেও বেশি বন্ধু ছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি স্বাগত জানানো, সাধারণ কিছু বিশেষ্য, ক্রিয়া, আত্মী-স্বজন সম্পর্কিত শব্দাবলি এবং সময় বলা শিখে নিলাম। কিছু শব্দ দেখলাম আরবি থেকে ধারকরা। তবে সুমালি ভাষার ব্যাকরণ খুব কঠিন বলে মনে হলো। ভাষা শিক্ষার একটি উত্তম পথ হচ্ছে কথাবার্তা করা। সুতরাং আমরা এদিকে বেশি জোর দিলাম। শিক্ষক আমাকে ইসলাম সম্পর্কেও অনেক তথ্য দিলেন।

বেশিদিন যায় নি- আমি যখন ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি, উস্তাদ বললেন, "আপনি অনুমতি দিলে একজন শায়খকে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসি।" তখনও কিন্তু আমার মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সক্রিয়া ছিলো। বিশেষকরে আমি চিন্তিত ছিলাম আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে। কিন্তু তারা এ মুহূর্তে অন্তত ১০ হাজার মাইল দূরে বসবাস করছিলেন। আর আমি

একটি মুসলিম সমাজে শান্তিতেই আছি। আমার অনেক ভালো বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। এটাও পরিষ্কার ছিলো যে, আমার প্রতি তাদের আচরণের মূলে ছিলো ইসলাম। আমি সাহস করে বললাম, "হ্যাঁ, শায়খকে নিয়ে আসুন।"

শায়খ সময়মতো আসলেন। তিনি আমাকে আমার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন কররেন। আমি বললাম, "আমি ইয়াহুদি ছিলাম, খ্রিস্টান নয়। অনেক আগে থেকেই আমি শূকরের মাংস ভক্ষণ ছেড়ে দিয়েছি, এ্যালকাহল, জুয়া, অবৈধ নারীভোগ ইত্যাদি।" তিনি আমাকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস-আক্বীদা, ৫ স্তম্ভ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করলেন। এরপর বললেন, "এবার বলুন- আশহাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু ওয়াআশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।" আলহামদুলিল্লাহ! আমি এই পবিত্র কালিমা পাঠ করে নিলাম। এদিন থেকে আমার নাম হয়ে গেলো ড. মুস্তফা মৌল্ড।

হঠাৎ যেনো মনে হলো সমস্ত টেনশন থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। নিজেকে একটি বৃহৎ কমিউনিটির সদস্য দেখতে পেলাম। এরূপ অনুভূতি জাগ্রত হবে তা আমি কল্পনা করতে পারি নি। আমার সকল সুমালি বন্ধু এ সংবাদে খুব আনন্দিত হলেন। সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িতে দিতে প্রতিজ্ঞা করলেন। তারা আমাকে সম্বোধন করতে লাগলো 'সীদি' (চাচাতো ভাই) বলে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি কিছু স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করে বিমানযোগে চলে গেলাম নাইরোবি শহরে।

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমাকে পুনরায় কাজির অফিসে যেয়ে সাক্ষীদের সামনে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করতে হলো। এরপর কণেসহ আবার কাজি অফিসে এসে বিবাহের কাজটি সম্পন্ন করলাম। মাত্র দুদিন সময় ছিলো। আমাকে মুগাদিসু ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হবে। বিয়ের মাত্র বছর খানেক পরে, যখন আমার বয়স ৪৩ তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি মুসলিম পুত্রসন্তান দান করেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলের নাম রাখলাম বিখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামানুসারে- খালিদ। আমি হয়ে গেলাম আবু খালিদ।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমার ইসলামগ্রহণের কথা পরিবার-পরিজনকে জানিয়েছিলাম কী না? জবাব হলো, অনেক দিনের জন্য জানাই নি। তবে বিয়ের সংবাদ দিয়েছিলাম। এ সংবাদে তারা না ছিলেন অবাক কিংবা অসন্তুষ্ট।

আমি ছিলাম এক মধ্যম বয়সী পুরুষ। জীবন নিয়ে কী করতে হয় তা তার জানা থাকার কথা। আমার পরিবারবর্গ আমার আনন্দে আনন্দিত ছিলেন। খালিদের জন্মের পর তারা খুব আনন্দিত হন। সে ও তার মাকে দেখার জন্য সবাই উদগ্রীব ছিলেন। খালিদ যখন এক বছরের শিশু তখন আমি ছুটির সময় বেড়াতে যাই বোস্টনে। সাথে নিয়ে যাই সন্তান ও তার মাকে। আমার স্ত্রী পূর্বের বিবাহ থেকে দুটি ছেলেসন্তানের জননী হয়। এদের নাম আলী ও ইউসুফ। বোস্টোনে যাওয়ার পূর্বে তাদের রেখে আসি বোর্ডিং স্কুলে।

সবাই আমার পরিবারকে খুব সাদর অভ্যর্থনা জানান। পুরো ভ্রমণটি ছিলো আনন্দময়। স্ত্রী আমার মাতা, বোন ও চাচীর জন্য কিছু উপহার নিয়ে আসে। তারাও তাকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দান করেন। আমি মনে করলাম, হয়তো তারা ধরে নিয়েছেন মুসলিম মহিলা কোনো ইয়াহুদি বা খ্রিস্টানকে বিয়ে করতে পারে। তারা জানতেন আমার স্ত্রী ও ছেলে খালিদ মুসলমান ছিলো। তারা এ ব্যাপারে মোটেই চিন্তিত নয়। এছাড়া এটা তাদের জানা গত ৩০ বছর ধরে আমি ইয়াহুদি ধর্মের প্রাকটিস করি নি। আমি অতীতেও এক নন-ইয়াহুদি মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তারা যদি আমার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাহলে মিথ্যা বলবো না। আর যদি না করেন, তাহলে নিরবই থাকবো। হয়তো সুযোগ আসলে বলবো।

কয়েক বছর পূর্বে তারা অবশেষে আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি সত্য কথা বলে দিলাম। আমি বলবো না তারা খুশি হয়েছিলেন। তবে অবাক হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেন নি। এখনও পারিবারিক সম্পর্ক সাধারণই আছে। তবে আমার কাজ ১ বছর পর বাতিল হয়ে গেলো।

আমার পরিবারকে নাইরোবিতে রেখে ১৯৮৮ সালে আমেরিকায় ফিরে আসি একাকী ও বেকার অবস্থায়। তবে খুব বেশিদিন যায় নি, দুটি পার্ট-টাইম

শিক্ষকতা ও একটি পুরুষের কাপড়ের দোকানে কাজ শুরু করি। শিক্ষকতা বেশিদিন থাকে নি। সুতরাং ৩ বছরব্যাপী ঐ কাপড়ের দোকানেই কাজে থাকি। আমি অবশ্য ভালো কাজের সন্ধান অব্যাহত রেখেছি। ইতোমধ্যে আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আসি আমেরিকায়। আমরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করে বেঁচে আছি।

এরপর চার বছর পূর্বে একজন মুসলিম পড়শি বললেন, একটি নতুন ইসলামী ইন্সটিটিউট কিছুদিন হয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে একজন ইংরেজির উস্তাদের প্রয়োজন। আমি সাথে সাথে কল করলাম ও সেখানে যেয়ে পরিচালক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাকে তারা কাজের জন্য গ্রহণ করলেন।

কী অদ্ভুত ব্যাপার, আমি এখন ঠিকই জানালাহীন একটি ভার্জিনিয়া অফিসে কর্মরত- তবে পার্থক্য আছে! আমি এখন আমার নতুন সত্যধর্ম ইসলামী পরিবেশে ছিলাম। আমার চুতর্দিকে ছিলেন ভালো মুসলিম ভাইগণ- যাদের থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা পাচ্ছিলাম প্রতিনিয়ত। এদের কেউ কেউ উত্তম গবেষকও ছিলেন। আমি সবাইকে খুব ভালোবাসি। মূলত আজ আমাকে অর্থ দেওয়া হচ্ছে কুরআন, হাদিস, আক্বিদা, ফিকাহ, সিরাত, তারিখ ও আরবি নিয়ে গবেষণার বিনিময়ে। আলহামদুলিল্লাহ! প্রভুর দরবারে প্রতিদিন অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন এবং এখন তাঁর অনুগ্রহের বারিধারা আমার ওপর বর্ষণ করে যাচ্ছেন। আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।[৯৪]

[৯৪] https://www.islamreligion.com/articles/4003/viewall/dr-a-moustafa-mould-ex-jew-usa/

হুসাইন আবদুল ওয়াহিদ আমিন

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আয়ল্যান্ড

মুসলিম নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ওয়াসিলায় দীর্ঘ গবেষণা ও ইসলামে দীক্ষিত

ভূমিকা

আমার এ ইসলামগ্রহণের বর্ণনাটি লিখেছি মূলত অন্যান্য পশ্চিমা হবু ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীদের উপকারার্থে। বিশেষকরে যারা আমার মতো খাঁটি খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী ধর্মীয় পরিবেশে বড়ো হয়েছেন, তারা এ থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন বলে আমি মনে করি। খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা মিল দেখা গেলেও, কিছু মৌলিক বিষয় আছে যেগুলো কখনও মিলবে না, বা মিলানো যাবে না। এর মধ্যে শীর্ষে আছে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস ও জিসাসের দেবতা হওয়া। সুতরাং একজন গোঁড়া খ্রিস্টান থেকে ইসলামে ভ্রমণ হচ্ছে এক বিরাট ধার্মিক বিশ্বাসের পরিবর্তন- এটি সাধারণ ব্যাপার নয়।

এ বিরাট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা দ্বারা এটাই আশা যে, যারা এ রাস্তায় ভ্রমণে আছেন বা যেতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সহায়ক ও সান্ত্বনা প্রদানকারী হবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস মনে পড়ছে:

“একদা এক ব্যক্তি রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। সে দেখলো কাটাযুক্ত একটি গাছের ডাল রাস্তার উপর পড়ে আছে। সে এটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলো। আল্লাহ এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার পাপ ক্ষমা করে দিলেন।” (সহীহ বুখারি)

অপরের উপকারার্থে আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দ্বারা আমিও রাস্তার কাল্পনিক কাটা সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছি। কারণ খ্রিস্টবাদ বা যে কোনো

বাতিল বিশ্বাস থেকে মহাসত্যের ধর্ম ইসলামে ফিরে আসতেও রাস্তার মধ্যে ভ্রমণকারী অনেক কাটার সম্মুখীন হবে।

আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সময় খুব একটা ইন্টারনেট-সচেতন ছিলাম না। সুতরাং সব গবেষণা নিজেই করতে হয়েছে। আমার জন্য এটা খুব জরুরি ছিলো যে, ইসলাম নিয়ে গবেষণার ফলাফল যেনো যৌক্তিক ও ধার্মিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির আওতাভূক্ত হয়। আমি মনে করি নিচের পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখিত অনুসন্ধান ও সবশেষে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ধারাবাহিক বর্ণনা হবে অপর অনুসন্ধানীর জন্য উপকারী দিকনির্দেশনা। তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক সন্ধানে লেখাটুকু সহায়ক শক্তি হিসেবে পাবেন।

আমার ব্যক্তিগত পটভূমি

আমি ইসলামকে আলিঙ্গন করি ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে। তখন আমার বয়স ৩১ বছর। আয়ল্যান্ডের একটি ক্যাথোলিক পরিবারে আমার জন্ম। জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে কাটিয়েছি। একটি মুসলিম দেশে ভ্রমণকালে একজন মুসলিম মহিলার সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। আমি জানতাম, এই মহিলাকে বিয়ে করতে হলে ইসলামে দীক্ষিত হতে হবে। কিন্তু মুসলিম হতে মন কিছুতেই চাইলো না। বাস্তবে তখন ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত ছিলো। যেটুকু ছিলো, তা সবই নেতিবাচক। সুতরাং ইসলামে দীক্ষিত হয়ে পছন্দের নারীকে বিয়ের স্বপ্ন আপাতত এখানেই শেষ হয়ে যায়।

এ অভিজ্ঞতা হেতু কিন্তু একটি লাভ হল- ইসলামকে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। সুতরাং ইউরোপে ফিরে আমি অনুসন্ধানে লেগে গেলাম। ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরিতে ইসলাম সম্পর্কে যতো বই পেলাম সবগুলো পাঠ করলাম। তবে এগুলো ছিলো মূলত অ-মুসলিমদের লেখা। তারপরও দেখলাম প্রায় ৯০% ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি একমত হতে বাঁধা নেই। ফলে আমি আরো আগ্রহশীল হয়ে পড়ি। বুঝতে পারলাম, ইসলামকে এর কিছু কিছু অনুসারীদের আচরণ দ্বারা বিচার করা ঠিক হবে না- যা আমি ইতোমধ্যে করেছি। ধর্মের মৌলিক ঈমান-

আকীদা ও আমলের ওপর যেসব দিকনির্দেশনা আছে ওগুলো জেনে যাচাই-বাছাই করতে হবে।

জিসাস - গডের পুত্র?

যে বিষয়টি নিয়ে সত্যিই চিন্তিত হলাম তা ছিলো জিসাসকে নিয়ে। তিনি কী সত্যিই গডের পুত্র ছিলেন? একজন ক্যাথোলিক খ্রিস্টান হিসেবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, হলি ট্রিনিটি (ত্রিত্ববাদ) তথা গড দ্যা ফাদার, জিসাস দ্যা সান ও হলি স্পিরিট (পিতা গড, গডের পুত্র জিসাস ও পবিত্র আত্মা) - এই এক গডে তিন ব্যক্তি- এতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস আনতে হবে। ইসলাম এটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে: গড মাত্র একজন (তাওহিদ)। আর জিসাস- একজন বড়ো নবী হলেও মানুষ ছিলেন মাত্র। গডের পুত্র নন।

"হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ- তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রাসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য; সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" (নিসা (৪): ১৭১)

"মরিয়ম-তনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর তার জননী একজন ওলীয়া- তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে।" (মাইদাহ (৫): ৭৫)

"সন্তান বলল: আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।" (মারইয়াম (১৯): ৩০)

“নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। ... ” (মাইদাহ (৫): ১৭)

“তারা কাফির, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্; অথচ মসীহ্ বলেন, হে বণী- ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (মাইদাহ (৫): ৭২)

“যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র, আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই ... ।” (মাইদাহ (৫): ১১৬)

ইসলাম বিশুদ্ধ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের সর্বাধিক মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহই (খ্রিস্টানদের ভাষায় গড দ্যা ফাদার) একমাত্র প্রভু। কুরআনের সূরা ইখলাসে (১১২) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে:

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি; এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।” (ইখলাস (১১২): ১-৪)

আমাকে কী করতে হবে? এটা তো আমার নিকট সম্পূর্ণ এক ব্যাপার। আমি তো জিসাসের অবাধ্য হতে পারবো না। জিসাস ক্রাইস্ট গডের পুত্র হওয়ার আকীদাটি আমার মনে এতো শক্তভাবে গাঁথা ছিলো যে, এর বদলে অন্য কোনো ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া একরূপ অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল।

সেন্ট পল ও আদি খ্রিস্টান চার্চ

ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আমি নিজের ধর্মের ইতিহাসের ওপর পুনরায় দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি- বিশেষকরে সেন্ট পল ও আদি খ্রিস্টান চার্চের সঠিক ইতিহাস কী তা খুঁজে দেখা একান্ত জরুরি অনুভব করলাম।

যাকিছু আবিষ্কার করলাম তাতে আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাই। খ্রিস্টবাদের ওপর দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের অধ্যয়নকালে আমি এসব ব্যাপার কখনও পাঠ করি নি- বা দেখি নি। আমার জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথেই অনেক ব্যাপার প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হই। এগুলো হচ্ছে পল অব তারসাস বা সেন্ট পল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আকীদাগত বিদআত'। বাস্তবে পল কোনো দিনই জিসাসের সাক্ষাৎ পান নি- তিনি কোনো এ্যাপস্টলও (ধর্মসংস্কারক) ছিলেন না। তিনি দাবি করেন, জিসাসের 'ভিশন' (স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক যোগাযোগ) লাভ করেছিলেন। আর এর ওপর নির্ভর করে যারা জিসাসের সঙ্গী ছিলেন, যারা তাঁর কথা নিজেদের কানে শুনেছেন, আমল-ঈমান দেখেছেন, তাদের সমস্ত ঐতিহাসিক ও ধার্মিক জ্ঞানকে পল নিজের কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেন। যেমন, মূসার (আ.) আইনসমূহ পল রদ করেন। এ আইনে বলা আছে জিসাস গডের পুত্র হতে পারেন না। এরূপ বিশ্বাস হচ্ছে কুফরী। যেমন:

"আমি হচ্ছি প্রভু, তোমাদের প্রভু ... আমি ছাড়া অন্য কোনো (কাল্পনিক) গডের উপাসনা করবে না ... আমার কোনো শরীক নেই।" (এক্সোডাস ২০:২-৫)

"শুনো ও ইসরাইল! প্রভু - এবং প্রভু একক - আমাদের প্রভু।" (ডিউটারোমনি ৬:৪)

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, 'সান অব গড' (গডের পুত্র) কিংবা 'ত্রিত্ববাদ' থাকার কোনো সুযোগ নেই। আছেন শুধুমাত্র 'গড দ্যা ফাদার' (খ্রিস্টবাদ মুতাবিক) এবং ইসলাম মুতাবিক 'এক আল্লাহ'। আল্লাহ ও গড শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গডই আল্লাহ, আল্লাহই গড। গড অপর কেনো প্রভু নন-

যা কেউ কেউ মনে করেন। [তবে এটা সত্য- গড এর বহুবচন আছে (Gods), স্ত্রীলিঙ্গও আছে (Goddess)। কিন্তু আল্লাহ শব্দের লিঙ্গ বা বহুবচন নেই। সুতরাং 'গড' থেকে 'আল্লাহ' শব্দ এক প্রভুর ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত ও যথার্থবোধক।]

ইয়াহুদিরা সে সময় এবং আজো খ্রিস্টানদের 'জিসাস আল্লাহর পুত্র' বলে বিশ্বাসকে কুফরী বলে আসছেন। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হই একজন ইয়াহুদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে। ইয়াহুদিদের কর্তৃক জিসাসকে মেসায়া (মসীহ) হিসেবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, "এ শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একজন মানুষ বুঝাচ্ছে। এটা কখনও গড বা গডের পুত্র বুঝায় না।"

সেন্ট পলের মিশনারী কাজটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হচ্ছিলো সে সময়ের ভূমধ্যসাগরীয় পৌত্তলিকদের দ্বারা। (গ্রীসের প্রাচীন শহর) করনিথে তিনি ইয়াহুদিদের কর্তৃক একান্তভাবে গডের উপাসনার বিষয়টি পরিত্যাগ করেন। ইয়াহুদিদের প্রতি পলের ঘোষণাটি হচ্ছে এই:

"তুমি যদি হারিয়ে যাও- তাহলে এরজন্য তুমি নিজেই দায়ী। আমি দায়ী নয়। এখন থেকে আমি চলে যাবো জেন্টাইলদের (যারা ইয়াহুদি নয়) নিকট।" (এক্টস ১৭:৬)

গডের সন্তানাদি থাকার ধারণা গ্রিকদের নিকট সুপরিচিত ছিলো। আমি মনে করি, পল ইচ্ছা করে জিসাসের বাণীকে পরিবর্তন করেছেন, ঐ গ্রিক জেন্টাইলদের নিকট খ্রিস্টবাদকে গ্রহণযোগ্য করতে। তার উদ্দেশ্যে ছিলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রিকদের খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত করা। আমরা এক্টস ১৭:২২-২৩- এ দেখেছি এথেন্সে গিয়ে পল কীভাবে তখনকার গ্রিকদের পৌত্তলিক ধর্মকে ব্যবহার করেছেন নিজের আবিষ্কৃত খ্রিস্টবাদকে তাদের মধ্যে প্রচার করতে। এটাও প্রমাণিত যে, পল চলতে চলতে নতুন বিষয়াদি আবিষ্কার করেছেন এবং আকীদার ভেতর ঢুকিয়েছেন ইয়াহুদি ঐশীসূত্র, জিসাসের শিক্ষা এবং এমনকি নিজের ভিশন ছাড়াই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ কোরিনথিয়ান্স ৭:২৫ সম্পর্কে বলা যায়। এখানে পল অবিবাহিত লোকদের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন: "প্রভু থেকে এ ব্যাপারে আমার নিকট

কোনো নির্দেশনা নেই।” কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছেন এই বলে: “যিনি প্রভুর দয়ায়, বিশ্বাসযোগ্য .. ।”

নতুন টেস্টেমেন্টের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন

একটি ক্যাথোলিক পরিবারে জন্ম ও বেড়েওঠা এবং ক্যাথোলিক স্কুলে পড়ালেখা করে আমি সর্ব-প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বাস করতাম বাইবেল হচ্ছে গডের কথা। বড়ো হয়ে আমি যখন বাইবেল- বিশেষকরে নতুন টেস্টেমেন্ট লিপিবদ্ধকরণের ইতিহাস অধ্যয়ন করলাম তখন আমার মন থেকে উক্ত অন্ধবিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাইবেল গডের কথা- এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বাস্তবে পল ও তার অনুসারীরাই এটির সিংহভাব লিখেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৬ নাম্বার পরিচ্ছেদ থেকে এ্যাপোস্টলদের (জিসাসের সঙ্গীরা) এক্টস এর পরে এসেছে পলের জীবনকাহিনী- বারনাবাজের জীবনকথা নয়। যদিও বারনাবাজ ছিলেন জিসাসের একজন সাথী- বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাইপ্রাসের খ্রিস্টান চার্চের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বারনাবাজ সুপরিচিত। তিনি গসপেল লিখেছিলেন যা আদি যুগের খ্রিস্টানদের কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ছিলো। কিন্তু বাইবেলের নিউ সেস্টেমেন্টে এই গসপেল বাদ দেওয়া হয়। আর নিউ টেস্টেমেন্ট লিখিত হয় জিসাসের তিন শতাধিক বছর পরে রোমান পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টিনের নির্দেশে।

যে চারটি গসপেল এখন খ্রিস্টেনডম কর্তৃক খ্রিস্টবাদের সব আইন-কানুন হিসেবে (জিসাসের ৩ শতাধিক বছর পরে (৩২৫ বি.সি.) কাউন্সিল অব নিকায়ার মাধ্যমে) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা সবই নির্ভরযোগ্যহীন তৃতীয় ও চতুর্থ হস্তের বর্ণনার ওপর ভিত্তিশীল। এ চারটি গসপেল লেখার সনগুলো দেখুন: মার্ক ৬৫-৭৫ ঈসায়ী, লুক ৮০-৮৫ ঈসায়ী, মেথিউ ৮৫-৯০ ঈসায়ী এবং জন ৯৫-১৪০ ঈসায়ী।[৯৫]

[৯৫] সূত্র: University of Calgary, Department of Religious Studies; http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/C_Transp/C_Index.html

গডের কথা কীভাবে সুস্পষ্টভাবে জিসাসের বংশবৃত্তান্ত দুটি গসপেলে দুভাবে হতে পারে (মেথিউ ১:১-১৭; লুক ৩:২৩-৩৭)? আর মানবিক বংশবৃত্তান্ত কোন কারণে থাকবে জিসাস যদি গড বা গডের পুত্র হয়ে থাকেন? জিসাস সঠিক কত হাজার মানুষকে 'গায়েবি রুটি ও মাছ' দিয়ে খাবার ভক্ষণ করিয়েছিলেন? দুটি গসপেলে দুটি হিসাব এসেছে। ঠিক কজন খেয়েছিলেন-সেটা মূল বিষয় নয়। তবে এভাবে পার্থক্য থাকায় কথাগুলো সরাসরি গডের-তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মোটকথা, গসপেল লেখার যুগ জিসাসের সমসাময়িক ছিলো না। এ যুগে ইয়াহুদিরা রোমান বিরোধী ব্যর্থ এক বিদ্রোহ (৬৬-৭৭ ঈ.) করে। ইয়াহুদিদের থেকে আলাদা থাকা ও রোমান শাসকদের খুশি করার বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টবাদ থেকে ইয়াহুদি প্রভাব মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই উক্ত চারটি গসপেল লেখা হয়। সুতরাং এতে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। একই সময় ইচ্ছে করেই পরবর্তীতে বারবাজের লিখিত গসপেলকে বাদ দেওয়া হয়। সেটা ছিলো অধিক সত্যের কাছাকাছি। পোলিন-প্রভাবিত চার্চ ৪র্থ শতক থেকে এ সত্য বাইবেল থেকে একেবারে বিলুপ্ত করে ছাড়ে।

এটাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, জিসাস, তাঁর সকল সাথী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সবাই ইয়াহুদি ছিলেন। তাদের ঐশীবাণী ছিলো হিব্রু ভাষায়। কিন্তু নতুন সেস্টেমেন্ট লিখা হয় গ্রিক ভাষায়।

আল-কুরআন: সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত

এখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, নতুন সেস্টেমেন্ট এবং বিশেষকরে চার গসপেলের পরিবর্তে আল-কুরআন একটিমাত্র কিতাব হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে একজন মাত্র নবীর ওপর। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ তাঁর বহু সাথী ২৩ বছরে নাজিলকৃত কুরআনের প্রতিটি আয়াত সাথে সাথে মুখস্ত করে নেন। বিশুদ্ধ মতে রাসূলের মহাপ্রয়াণের দুই দশকের ভেতরই এটি কিতাব আকারে সংরক্ষিত হয়। আজো তা হুবহু লিখিতভাবে ও অসংখ্য

কুরআনে হাফিজ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়ে আসছে। সন্দেবাদীরা চাইলে প্রাথমিক যুগের হস্তলিখিত কুরআনের দুটি কপি এখনও দেখতে পারেন: একটি ইস্তাম্বুলে ও অপরটি উজবেকিস্তানের তাশকেন্দে। আজকের বিশ্বে প্রত্যেকটি আরবি কুরআনের কপি হুবহু একই- আয়াত থেকে আয়াত, শব্দ থেকে শব্দ- এমনকি অক্ষর থেকে অক্ষরে কোনো বিন্দুমাত্র বেমিল নেই। একমাত্র আল্লাহর কথা ছাড়া এবং তাঁর কর্তৃক সংরক্ষণের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো লেখা এভাবে শত শত বছর যাবৎ সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে কখনও থাকা সম্ভব নয়।

কুরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকার এক চিত্তাকর্ষণ বর্ণনা শুনুন। ঈসায়ী উনবিংশ শতকে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় এক অনুসন্ধান চালায়। তারা বিয়াল্লিশ হাজার কুরআনের আরবি কপি বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে। এগুলোর প্রিন্টিং তারিখ ১৩০০ বছরের পূর্বের হস্তলিপি থেকে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সময় ছিলো। দীর্ঘ ৫০ বছরব্যাপী এসব পাণ্ডুলিপির ওপর সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চলতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিলো পার্থক্য খুঁজে বের করা। গবেষকরা অবাক-বিস্ময়ে রিপোর্ট উপস্থান করে বলেন: শুধুমাত্র প্রিন্টিং ভুল ছাড়া এই বিয়াল্লিশ হাজার কপির মধ্যে একটি অক্ষরের মধ্যেও কোনো পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই নি! চিন্তা করুন, এসব কপি ইসলামী প্রথম শতক থেকে ১৪তম শতকের বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

দুর্ভাগ্যবশত উক্ত সংগ্রহ যে বিল্ডিংয়ে সংরক্ষিত ছিলো তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সম্মিলিত ফোর্স কর্তৃক জার্মানিতে বোমাবর্ষণকালে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এর রিসার্চ প্রজেক্টের ফলাফল হামলার শিকার হয় নি।

মোটকথা, কুরআন সম্পূর্ণরূপে একক এক মাহগ্রন্থের দাবি রাখে। এর লিখিত ট্যাক্সট (মুতন) সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এটা সম্পূর্ণটাই যে আল্লাহর কথা- তা বিশ্বাস করা না করা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সিন্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

শুধু তাই নয়, আল্লাহর কথা কুরআন ছাড়াও তাঁর রাসূলের হাদিসও ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের মুতন হিসেবে সংরক্ষিত আছে। ইসলামী যুগের দ্বিতীয় শতকে মুসলিম গবেষকরা (মুহাদ্দিসীন) এসব হাদিস খুব সতর্কতাসহ

লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি প্রতিটি বর্ণনার বর্ণনাকারীদের (রাবি) ব্যাপারে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে হাদিসকে সত্যায়িত করা হয়েছে। রাবিদের সততা ও আমল-ঈমানের মধ্যে সামান্যতম বেশকম পেলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাদের বর্ণনা বাদ দিয়েছেন। সংরক্ষকদের কড়া মানদণ্ডে ঠিকে নি- এরূপ হাজার হাজার হাদিস গ্রন্থসমূহে স্থান পায় নি।

চার গসপেলেও জিসাস গড বা গডের পুত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বিদ্যমান

খ্রিস্টবাদের চার গসপেলের (বাইবেলের) মধ্যেও আমরা দেখতে পাই জিসাসের গড বা গডের পুত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ও মতানৈক্য বিদ্যমান। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় খোদ ত্রিত্ববাদের ওপরও। অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন: বিশটি স্থানে জিসাস গডের উপাসনা করেছেন বলা আছে (মেথিউ ১৩:২৩, ১৯:১৩, ২৬:৩৯, ২৭:৪৬, ২৬:৪২-৪৪; মার্ক ১:৩৫, ৬:৪৬, ১৪:৩৫-৩৬; লুক ৩:২১; ৫:১৬; ৬:১২, ৯:১৮; ৯:২৮, ১১:১-৪, ২২:৪১; জন ১৪:১৬, ১৭:১, ১৭:৯, ১৭:১১, ১৭:১৫)। জিসাস যদি নিজেই গড হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কাকে বা কেনো উপাসনা করবেন?

ভেবে দেখুন এসব শ্লোক: জিসাস ও গডের ইচ্ছা ভিন্ন (মেথিউ ২৬:৩৯)।; জিসাস নিজেকে ও গডকে আলাদাভাবে দেখে নিজে গড হওয়া অস্বীকার করেন (মেথিউ ১৯:১৬-১৭; মার্ক ১০:১৭-১৮ এবং লুক ১৮:১৮-১৯)। জিসাস নিজেই ও তার সাথীগণ এবং অন্যান্য সমসামিয়করা তাঁকে একজন নবী হিসেবে মনে করতেন। তারা তাকে গডের পুত্র বা গড হওয়া ভাবেন নি (লুক ৭:১৫, ১৩:৩৩, ২৪:১৯; জন ৪:১৯)

ক্যাথোলিক খ্রিস্টান থেকে এ্যারিয়ান ইউনিটেরিয়ান, এরপর মুসলিম হওয়ার ভ্রমণকাহিনী

আমার গবেষণার ফলাফল ও বেশ আত্ম-অনুসন্ধান শেষে পোলিন চার্চকে ‘বিশ্বাসগত বিদআতী’ সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করি। বিদআত- যেমন,

ত্রিত্ববাদ- যা জিসাসের সাথীদের অজানা ছিলো, জিসাসের মৃত্যুর ৩৮১ বছর পরে এটি চার্চের বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত হয়।

আমি তখন হতাশ হয়ে এ্যারিয়ানিজমের প্রতি আকর্ষিত হই। ক্যাথোলিক জ্ঞানপুঞ্জী এ্যারিয়ানিজমের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলে:

"একটি নতুন খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস যা চতুর্থ শতকে আবিষ্কৃত হয়। এর উদ্ভাবকরা জিসাসের গড হওয়াকে অস্বীকার করে ... এটি আধুনিক যুগের অবিশ্বাসের মতো নয়, তাই একে আধুনিক চোখে অদ্ভুত প্রতীয়মান হয়।"

এ্যারিয়ান বিশ্বাসটি ছিলো একত্ববাদী যার উৎপত্তি হয় ৩য় ঈসায়ী শতকের শেষের দিকে ও ৪র্থ ঈসায়ী শতকের শুরুতে। এর প্রবক্তাদের মধ্যে বিখ্যাত কজন হলেন পাদ্রী অরিয়াস অব আলেকজান্দ্রিয়া (২৫০/২৫৬-৩৩৬), বিশপ ইউসেবিয়াস অব নিকোমেডিয়া (মৃ. ৩৪২), লুচিয়ান অব এ্যান্টিওক (২৪০-৩১২) এবং পরের দশকসমূহের রোমার সম্রাট কন্সটান্টিনাস ২য় (৩১৭-৩৬১) প্রমুখ।

উপরোদ্ধৃত ক্যাথোলিক এনসাইক্লোপিডিয়া যা বলতে ব্যর্থ হয়েছে (অবশ্যই ইচ্ছে করে) তাহলো, যা তারা হেরেসি (ধর্মে সংযুক্তি) হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা বাস্তবে ৪র্থ ঈসায়ী শতকের মাঝের দিকে একটি ঘোষণাকৃত খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসের দলিল ছিলো। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ৩৫৯ ঈসায়ীতে এ্যারিমিনিয়াম (বর্তমান ইতালির রিমিনি) কাউন্সিলের পর সেন্ট জেরোমি (৩৪৭-৪২০) লিখেন: "সমস্ত পৃথিবী আর্তনাদ করার পর নিজেদেরকে এ্যারিয়ান হিসেবে পেয়ে চমকপ্রদ অনুভব করেছে।" রোমান সম্রাট কন্সটান্টিয়াস ২য় ও তার পরবর্তী এ্যারিয়ান নেতাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খ্রিস্টবাদের ক্রিড (বিশ্বাস) এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এরপর যখন রোমান সাম্রাজ্যে রাজনীতিক পরিবর্তন শুরু হয় তখন এ্যারিয়ান খ্রিস্টানরা নির্যাতনের শিকার হয়। একত্ববাদী খ্রিস্টানদেরে বলপূর্বক ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী করা হয় এবং ৩৮১ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় কাউন্সিলে ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টান আকীদার অন্তর্ভূক্ত হিসেবে দাপ্তরিকভাবে ঘোষিত হয়।

আমিও যখন এ্যারিয়ানদের মতো এ সিদ্ধান্তে আসি যে, জিসাস গড বা গডের পুত্র ছিলেন না- তখন যেনো মনে হলো মনাসিকতা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক উঁচু এবং গুরুত্বপূর্ণ বেড়া অতিক্রম করেছি। বর্তমান খ্রিস্টবাদে জিসাসের গড ও পুত্র হওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় গুরুত্ববহ বিশ্বাসের একটি। সুতরাং এ বিশ্বাস যখন আমার মাঝে বদ্ধমূল হলো, জিসাস একজন নবী ছিলেন- গড বা গডের পুত্র ছিলেন না- তখন তাঁর পরের শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস আনা ও ইসলামকে গ্রহণ করা ছিলো আমার জন্য অনেকটা সহজ-সরল।

ঠিক এ কারণেই এ্যারিয়ান খ্রিস্টবাদীদের যারা বিলুপ্তপ্রায় রোমান সাম্রাজ্যের প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করতো এবং মূল খিস্টান চার্চ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ছিলো, ইসলামের আগমনের পরই মুসলমানদের দাওয়াতে শেষ নবী ও তাঁর বার্তাকে তারা গ্রহণ করে নেয় অতি সহজেই।

খ্রিস্টান হয়ে বেড়ে ওঠার কারণে একজন গডের ধারণা আমার নিকট খুবই পরিচিত ছিলো। তিনি যে যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদআয়াত প্রদানের উদ্দেশে একের পর এক নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলেন তা-ও বিশ্বাস করতাম। ইসলামও পুরাতন সেস্টেমেন্টে বর্ণিত নবী-রাসূলদের স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া জন দ্যা বাপ্তিস্ট, জিসাস প্রমুখকেও নবী হিসেবে স্বীকার করে। আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে উক্ত সব নবী সম্পর্কে বর্ণনা জানতাম।

ষষ্ঠ ঈসায়ী শতকে এসে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে পৌত্তলিকতা ও বর্বরতা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে অধিকাংশ খ্রিস্টবাদীরাও ছিলো তিন-খোদায় বিশ্বাসী। এছাড়া পারস্য, মিশর, ভারত, চীন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেও বহুখোদাবাদ অনেকদিন ধরে শেকড় গেড়ে বসেছিলো। এ পরিবেশে একজন নতুন নবীর আগমন যে আসন্ন ছিলো তা আমি বুঝতে পারি। আর সেই নবীই হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আসলেন সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নিয়ে। প্রেরিত হলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। কারণ তাঁর পর নবীদের আগমন ঘটবে না।

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। তিনজন বাদে এদের সবার কথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। নিচে এদের তালিকা দিচ্ছি:

১. হযরত আদম -এডাম (আ.), ২. হযরত ইদ্রিস (আ.), ৩. হযরত নূহ -নোয়াহ (আ.), ৪. হযরত হূদ (আ.), ৫. হযরত সালেহ (আ.), ৬. হযরত ইব্রাহিম -এ্যাব্রাহাম (আ.), ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.), ৮. হযরত ইসহাক -আইজাক (আ.), ৯. হযরত লূত -লট (আ.), ১০. হযরত ইয়াকুব -জেকব (আ.), ১১. হযরত ইউসুফ -জসেফ (আ.), ১২. হযরত শূয়াইব (আ.), ১৩. হযরত আইউব -জব (আ.), ১৪. হযরত মূসা -মৌজেজ (আ.), ১৫. হযরত হারুন -এ্যারন (আ.), ১৬. হযরত যুলকিফল -এযেকিয়েল (আ.), ১৭. হযরত দাউদ -ডেভিড (আ.), ১৮. হযরত সুলাইমান -সলোমন (আ.) ১৯. হযরত ইলইয়াস -এলাইযাহ (আ.), ২০. হযরত ইয়াসা -এলিশা (আ.), ২১. হযরত ইউনুস -জোনাজ (আ.), ২২. হযরত জাকারিয়া (আ.), ২৩. হযরত ইয়াহইয়া -জন দ্যা বাপ্তিস্ট (আ.), ২৪. হযরত ঈসা -জিসাস (আ.) এবং ২৫. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এখন আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, প্রথমে যে মুসলিম নারীকে বিবাহের কথা বলেছিলাম, তা পাই বা না- (বাস্তবে এ বিবাহ শেষ পর্যন্ত ঠিকে নি) আমি নিজ থেকেই ইসলামে দীক্ষিত হতে চাই সত্যধর্মবিশ্বাস হেতু। কারণ আমি এ দীক্ষিত হওয়া দ্বারা জিসাসকে বা তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি না- বরং তাঁরা ও তাঁদের অকলুষিত শিক্ষাকে গ্রহণ করছি। এটা ইসলামের আকীদারও অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের সকল মূল খ্রিস্টবাদী ফিরকা তথা রোমান কাথোলিক, ইস্টার্ন অর্থোডক্স ও প্রটেস্ট্যান্ট- মূলত পলের সৃষ্ট কৃত্রিম ধর্মের অনুসারী ও বিশ্বাসী। আমি ইসলাম ছাড়া অকলুষিত আর কোনো ধর্মবিশ্বাস এ পৃথিবীতে বর্তমানে আছে বলে মনে করি না। ইসলামই একমাত্র সঠিক পথ- এছাড়া দ্বিতীয় কোনো সঠিক পথ নেই।

ক্যাথোলিক এনসাইক্লোপিডিয়া এটাও উল্লেখ করেছে যে, এ্যারিয়ানিজম আর কখনও পুনর্জাগরিত হয় নি। যদিও এটি স্বীকার করেছে

যে, স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৬/২৭) ও জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪) এ্যারিয়ানদের প্রতি সমবেদী ছিলেন। কিন্তু যা এ জ্ঞানপুঞ্জী সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে তাহলো এ্যারিয়ানিজমের মূল একত্ববাদী বিশ্বাসকে ১৪০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত রেখে যাচ্ছে সর্বশেষ ধর্মবিশ্বাস ইসলাম। এখন ক্যাথোলিক, প্রটেস্ট্যান্ট কিংবা অর্থোডক্স কেউ নেই- যে বলবে খ্রিস্টবাদের মূলেও ছিলো একত্ববাদ।

সুস্পষ্ট চেতনা ও এ বিষয়ের ওপর মানসিক সব ধরনের যাতনা যা আমি ইসলাম নিয়ে অনুসন্ধানের শুরুতে পেয়েছি, এ সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে বলছি: আমি বিশ্বাস করি জিসাস একজন মানুষ ও আল্লাহর নবী ছিলেন। তিনি না ছিলেন গড না গডের পুত্র। আজকের খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস সম্বন্ধে জানলে তিনি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হতেন। এদের অভিসম্পাত করতেন। অতীতে আমি ভয় করতাম, জিসাসের প্রতি প্রতারণা করবো যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, বাস্তাবে যা আমি বিশ্বাস করতাম তা ছিলো তাঁর প্রতি অবিশ্বাস ও আরো জঘন্য মিথ্যাবাদিতা!

আমি বিশ্বাস রাখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরের (সর্বশেষ) প্রেরিত আল্লাহর নবী। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ আসমানী দ্বীন। কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব- আল্লাহর পথপ্রদর্শনের কথা। ইসলামই মূল ইয়াহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদের সংস্কারকৃত ও বিশুদ্ধকৃত আল্লাহর পছন্দ সব মানুষের একমাত্র ধর্ম।

আমি এটা সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমি ইসলামে দীক্ষিত হই নি, কোনো মহিলাকে বিয়ে করার জন্য। তবে হ্যাঁ একজন মুসলিম মহিলার ওয়াসিলায় আমার মধ্যে সত্যানুসন্ধানের স্ফূলিঙ্গ উত্থিত হয়েছিলো বটে। বলা যায়, ঐ মহিলা সত্যকে আবিষ্কারের ওয়াসিলা বা অনুঘটক হিসেবে আল্লাহ তা’আলার হুকুমে আমার জীবনে এসেছিলেন। আর সবার অবগতির জন্য বলছি, মহিলার সঙ্গে সম্পর্কও ২০০১ সালে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আমি এখনও মুসলমান আছি।

আমার ইসলামে দীক্ষা, যখন এসেছিলো তা ছিলো অত্যন্ত আন্তরিক। কোনো সুবিধার জন্য নয়। আন্তরিক হওয়াটাই জরুরি। ধর্মপরিবর্তন কখনো

প্রতারণামূলক হতে পারে না। কারণ এসব ব্যাপার হচ্ছে ব্যক্তি ও তার আত্মার চিরন্তন পরিণতির বিষয়।

আমি খ্রিস্টবাদ এজন্য পরিত্যাগ করেছি যে, ত্রিত্ববাদ ও জিসাস গড (বা গডের পুত্র) হওয়া আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়- এগুলো আমি বিশ্বাস করি না। আমি আন্তরিকভাবে একমাত্র এক গডে বিশ্বাস করি। আমি অনুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুয়েছি যে, আজকের যুগে একমাত্র ইসলামই বিশুদ্ধ একত্ববাদের ধর্ম। ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা-ই হোক, আমি এ বিশ্বাসে অটল থাকবো।

আমি এখন আমার নতুন বিশুদ্ধ একত্ববাদী ইসলামী বিশ্বাসকে লালন করে খুব সন্তুষ্ট ও শান্তিতে আছি। আমার বিশ্বাসের ঘোষণা হচ্ছে এই:

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি; এবং তার সমতুল্য কেউ নেই “ (ইখলাস (১১২): ১-৪)

এবং “আশহাদুআল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াআশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।” - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।”

মা-বাবার প্রতি ধন্যবাদ

সবশেষে, আমি আমার পিতামাতার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারা আন্তরিক, ভক্ত-অনুরক্ত খ্রিস্টান। আমার ইসলামগ্রহণকে খুব শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছেন। এখনও তারা নিজের পুত্র হিসেবে আমাকে ভালোবেসে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমর্থন করছেন। এ দিক থেকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যশীল। আলহামদুলিল্লাহ![৯৬]

---

[৯৬] https://www.islamreligion.com/articles/658/viewall/hussein-abdulwaheed-amin-ex-catholic-ireland/#_ftnref9498

উইলিয়াম বার্চেল বাশির পিকার্ড

কবি ও গল্পকার, যুক্তরাজ্য

ডব্লিউ. বি. বাশির পিকার্ড বি.এ., এল.ডি. হচ্ছেন একজন সুপরিচিত কবি ও গল্পকার। ইংরেজি ভাষায় তাঁর রাচিত 'লাইলা-মজনু', 'দ্যা এডভানচার অব আল-কাসিম' এবং 'নিউ ওয়ার্লড' ইত্যাদি গ্রন্থাদি পাঠকদের নিকট সুখপাঠ্য ও সুপরিচিত। তবে যা অনেকে হয়তো জানেন না, তিনি একজন মুসলমানও বটে। খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামগ্রহণের বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। আসুন শুনে নিই।

"প্রত্যেক শিশুই তার ফিতরতের ওপর (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে) জন্ম নেয়। তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক করে বড়ো করে।" (সহীহ বুখারি)

ইসলামের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলাম ঠিকই। তবে বেশ কিছু বছর চলে যায় ব্যাপারটি অনুধাবন করতে।

স্কুল ও কলেজে হয়তো অতিবেশি তীব্রভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখি সাময়িক ব্যাপার ও এর চাহিদা নিয়ে। ওসব দিনে আমার পেশাটি দীপ্তিময় ছিলো তা কখনও বিবেচনা করবো না। তবে আমি ছিলাম অগ্রগতিশীল। খ্রিস্টান পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো ভালো জীবনের। গডের ধারণা ও তাঁর উপাসনা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা ছিলো আমার জন্য সুখকর। আমি যদি কোনো কিছু উপাসনা করে থাকি তাছিলো, মহানুভবতা ও সাহস।

ক্যামব্রিজ থেকে এসে আমি মধ্য আফ্রিকায় চলে যাই। সংরক্ষণাধীন রাষ্ট্র উগান্ডায় প্রশাসক হিসেবে যোগ দেই। সেখানে আমি এমন এক চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজনামূলক জীবন অতিক্রম করি যা, ইংল্যান্ডে অসম্ভব ছিলো। আমি বাস করছিলাম এক কৃষ্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ববোধের মানবসমাজে। আর

আমাকে বলতে বাঁধা নেই- এ অতি সাধারণ হর্ষোৎফুল্ল জীবনবোধে বিশ্বাসী মানুষগুলোর সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। প্রাচ্য আমাকে সবসময়ই আকর্ষিত করে আসছে। ক্যামব্রিজে থাকতে আমি পাঠ করেছি 'দ্যা এ্যারাবিয়ান নাইটস' (আলিফ লায়লা)। এখন আফ্রিকায় একাকী আমি পাঠ করলাম 'দ্যা এ্যারাবিয়ান নাইটস'। বৃটিশ সংরক্ষণাধীন উগান্ডার বন্য যাযাবর জীবন অতিক্রান্ত করেও কিন্তু প্রাচ্যের প্রতি আকর্ষণে একবিন্দু ভাটা পড়ে নি।

এরপর আমার প্রসন্ন জীবনটি ভেঙ্গে পড়লো প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর কারণে। আমি বাড়ির দিকে দ্রুত চলে আসি উগান্ডা ছেড়ে। আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। সুস্থতা লাভের সময় আবেদন জানাই আর্মিতে যোগ দিতে। তখনও অসুস্থ থাকায় আমার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলো। আমি বাধ্য হয়ে বৃটিশ হোম ডিফেন্স ফোর্সে যোগ দেই। এরপর যেভাবেই হোক ডক্টর হিসেবে পাশ করে আর্মির ইউনিফর্ম পরলাম অশ্বারোহী হিসেবে। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ফ্রান্সে ডিউটিরত থাকতে যোগ দেই ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত সোম যুদ্ধে। এ যুদ্ধে আমি আহত হয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দী হই। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আমাকে প্রথমে জার্মানিতে পাঠানো হয়। আহত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।

জার্মানিতে আমি দেখেছি আহত মানবতার ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা স্বচক্ষে। বিশেষকরে রুশ সৈন্যদের দুরাবস্থায় আমি শঙ্কিত-ভীত হয়েছি। তারা ছিলো ডিসেন্ট্রিতে আক্রান্ত। আমি নিজেও ক্ষুদার জ্বালায় মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলাম। আমার ডান হাতটি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এটি ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছিলো না। জার্মানদের নিকট আমি ছিলাম এক অকেজো বোঝা। সুতরাং তারা আমাকে পাঠিয়ে দিলো সুইজারল্যান্ডে। সেখানকার হসপিটালে হাতের মধ্যে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আমার পুরো মনে আছে, সেই বিপদের দিনগুলোতেও কুরআন আমার নিকট কীরূপ প্রিয় ছিলো। জার্মান থেকেই আমি বাড়িতে পত্র লিখলাম, সেইলের অনূদিত এক জিলদ কুরআন শরীফ আমার নিকট প্রেরণ করতে। পরে জানতে পারি, বাড়ি থেকে এক কপি কুরআন পাঠানো হয়েছিলো- কিন্তু তা আমার নিকট কখনও পৌঁছায় নি। সুইজারল্যান্ডে অপারেশন শেষে আমার

হাত ও পা ভালো হয়ে যায়। আমি সুস্থ হলাম। বাইরে যেয়ে হাঁটাহাঁটি করতে পারছিলাম। আমি সাভারি কর্তৃক অনূদিত ফ্রেন্স ভাষার এক কপি কুরআন ক্রয় করি। এ কপিটি আজো আমার নিকট আছে- আমি একে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করেছি। ওখানে, আমি এক বিরাট হর্ষ দ্বারা উল্লসিত হলাম। মনে হলো যেনো, আমার মাঝে একটি চিরন্তন সত্যের ঐশী আলোকরশ্মি পতিত হয়েছে অনুগ্রহসহ। আমার ডান হাত তখনও অকেজো। তাই কুরআন লিখার প্রাকটিস করতে ব্যবহার করি বাম হাত।

কুরআনের প্রতি আমার ভক্তি-অনুরাগের একটি প্রমাণ হচ্ছে এই: এখনও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে এ্যারাবিয়ান নাইটস এর একটি গল্পের কথা। এক যুবককে মৃতদের শহরে জীবিত পাওয়া যায়। সে মৃতদের মাঝখানে বসে পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলো। তার চতুর্দিকের দৃশ্য তখন তার নিকট ছিলো অদৃশ্য।

সুইজারল্যান্ডের ওসব কঠিন দিনে আমি ‘একরকম মুসলাম’ হিসেবেই জীবিত ছিলাম। যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর হওয়ার পর **১৯১৮** সালের ডিসেম্বরে আমি লন্ডনে ফিরে আসি। এর তিন বছর পর **১৯২১** সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হই। আমার পছন্দের বিষয়গুলোর একটি ছিলো আরবি। এ বিষয়ের ওপর লেকচার হতো কিংস কলেজে। আমাদের উস্তাদের নাম ছিলো মরহুম প্রফেসর বিলশাহ ইরাকী। একদিন তিনি লেকচারের সময় কুরআনকে অধ্যয়নের উপদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা বিশ্বাস করো বা না, কুরআনকে তোমারা খুব আকর্ষণীয় পাবে এবং অধ্যয়ন করা হবে সত্যিই উপকারী।” আমি তখন বলেছিলাম, “ওহ! কিন্তু আমি তো এতে বিশ্বাসী!” আমার এ কথাটি দ্বারা প্রফেসর বিলশাহ খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। এরপর কিছু আলোচনা শেষে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, লন্ডনের নটিং হিল গেটে স্থাপিত প্রেয়ার হলে (উপাসনার কক্ষে) যোগ দিতে তার সঙ্গে। আমি আনন্দচিত্তে আমন্ত্রণটি গ্রহণ করি।

এরপর থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম নটিং হিল গেটের প্রেয়ার হলে। এতে ইসলামের প্রাকটিস সম্পর্কে আরো বেশি অবগত হই। তারপর

১৯২২ সালের নতুন বছরের দিন (১ম জানুয়ারী) আমি প্রকাশ্যে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হই। আলহামদুলিল্লাহ!

আজ প্রায় ২৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ সিকি শতকব্যাপী একজন মুসলিম হিসেবে বসবাস করে আসছি ঈমান ও আমলে। আমল সামর্থ অনুযায়ী যেটুকু সম্ভব করে যাচ্ছি। আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ক্ষমতা ও দয়ার সীমা নেই। জ্ঞানের ক্ষেত্রসমূহ প্রশস্ত হয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে গিয়েছে। আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায়, আমি নিশ্চিত অনুভব করি যে, একমাত্র সঠিক যে বস্ত্র পরিধান করা উচিৎ তাহলো, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। আমাদের মাথায় যে টুপি আমরা পরবো তা হবে প্রভুর প্রশংসা। আর আমাদের হৃদয়কে যদ্বারা অলঙ্কৃত করবো তা হবে এক আল্লাহর ভালোবাসা। ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)।[৯৭]

[৯৭] https://www.islamreligion.com/articles/55/william-burchell-bashyr-pickard-poet-and-novelist-uk/

সালাউদ্দিন এ. বোর্ড

প্রাক্তন খ্রিস্টান - আমেরিকা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে ইসলামে দীক্ষিত

১৯২০ সালের কোনো এক সময়। আমি এক ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছি। টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র, এলোমোলোভাবে পড়ে আছে। চোখে পড়লো লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি সাময়ীকির প্রতি, 'আফ্রিকান টাইমস - অরিয়েন্ট রিভিউ'। হাতে তুলে নিয়ে পাঠ করতে থাকি।

ইসলাম ধর্মের ওপর রচিত একটি প্রবন্ধের ওপর চোখ পড়লো। খুব ভালোই লাগছিলো পাঠ করতে। এক পর্যায়ে দেখলাম অনুবাদসহ একটি বাক্য- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - কোনো মা'বুদ নেই আল্লাহ ছাড়া। এটি আমার মন কেড়ে নিলো। মনে হচ্ছিলো এটি আমারই জন্য লিখিত হয়েছে। আমার মধ্যে যে অনুভূতি বাক্যটি জাগ্রত করেছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি কখনও এ মুহূর্তটি ভুলবো না। প্রবন্ধে লিখা আছে, এ বাক্যটিই হচ্ছে অমূল্য সম্পদ যা প্রত্যেক মুসলিমের বুকের ভেতর সংরক্ষিত আছে।

এর কিছুদিন পরই আমি মুসলমান হয়ে যাই। নাম পরিবর্তন করে রাখি সালাউদ্দিন। ইসলাম হচ্ছে সঠিক রাস্তা- কারণ গডের সাথে শরীক থাকার সুযোগ নেই ইসলামে। এটা শিক্ষা দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমাদের গুনাহকে ক্ষমা করতে পরবে না। এছাড়া, স্বভাবের সাথে এর একটি সমন্বয় আছে। এটা দেখিয়েছে, এক কাজের জন্য দুজন 'মনিব' থাকতে পারে না- হোক তা গোলাবাড়ির উঠোন, পশুচারণভূমি, শহর, দেশ, জাতি কিংবা মহাবিশ্ব পরিচলন। অপর যে সত্য ইসলামের শিক্ষা থেকে আমাকে প্রত্যয় দান করেছে, তাহলো এই- ইসলামই আরব জাতিকে বের করে নিয়ে এসেছে তাদের রহস্যময় মরুভূমির বাসস্থান থেকে। তারাই এমন এক নতুন বিশ্ব সভ্যতার জন্ম দিয়ে গেলো যার ব্যাপ্তি সিন্ধু থেকে আন্দালুচিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

মুসলিমরা স্পেনে এসে জঙ্গল দেখলো। একে পরিবর্তন করলো 'গোলাপ বাগানে'। আমি জন ডব্লিউ. ড্রেপারকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি তার 'দ্যা ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলাপমেন্ট অব ইউরোপ' গ্রন্থে পৃথিবীকে সত্যকথা জানিয়ে দিয়েছেন- কীভাবে ইসলাম আধুনিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। তিনি, বাস্তবে খ্রিস্টান ইতিহাসবিদদের কর্তৃক ইউরোপ সৃষ্টিতে ইসলামের অবদানকে দৃষ্টির বাইরে রাখার অপচেষ্টাকে নিন্দা জানিয়েছেন।

আরবরা ইউরোপে এসে দেখলো সেখানকার জাতক বাসিন্দারা ছিলো এক বর্বর জাতি। অসভ্য, নোংরা, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশি। ইউরোপীয়রা তাদের ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির জন্য আরবদের কাছে ঋণী। ধর্মীয়ভাবে পবিত্র হয়েছে। তখনকার দিনে উরোপের অধিকাংশ মানুষ তেনা পরে নিজেদের দেহ কোনোমতে ঢেকে রাখতো। তারা সম্মানজনক কাপড় পরা শিখেছে আরবদের কাছে।

যে আরবরা বর্বরতার চরম অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিলো, মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের করুণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাদের দান করেছিলো সঠিক জীবনবোধ- তাদের সাথী গড থাকাটা স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে। তাদের ছাড়া আজকের পৃথিবীর বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক চমক আমরা দেখতে পেতাম না।

আল-হামদুলিল্লাহ! এ মহান উম্মাহের সদস্য হতে পেরে সত্যিই আনন্দিত ও সৌভাগ্যশীল বলে মনে করি। তাই আবারো উচ্চারণ করছি:

"আশহাদুয়াল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদুয়ান্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ!"[৯৮]

[৯৮] Islam Our Choice, pp, 98-100

মুহাম্মদ সুলাইমান তাকেউচি

প্রাক্তন বৌদ্ধ - জাপান

তিনি হচ্ছেন জাপানিজ সোসাইটি অব এনথোলজি'র এসোসিয়েট

আল্লাহর অনুগ্রহে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইসলাম আমাকে আকর্ষিত করেছে কারণ:

১. ইসলামে আমি পেয়েছি এক প্রাণবন্ত ভ্রাতৃত্ববোধ।

২. মানবজীবনের সমস্যাবলীর বাস্তব কার্যকরী সমাধান ইসলামে আছে। মানবসমাজে বসবাসরত মানুষকে এটি ধর্মীয় উপাসনা থেকে আলাদা করে নি। এর পরিবর্তে মুসলমানগণ জামাআতে উপাসনা করেন এবং কমিউনিটির সামাজিক সেবা আল্লাহর ওয়াস্তে করেন।

৩. মানবজীবনে ইসলাম হচ্ছে বস্তু ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত রূপ।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জাতীয়তা, গোষ্ঠি কিংবা নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যের ঊর্ধ্বে। এটি সত্যিই সর্বজনিন। পৃথিবীর সব মুসলিমকে এটি একত্রিত করেছে। আর ইসলাম বিশেষ নির্বাচিত ক'জনের ধর্ম নয়। এটা সব মানুষের ধর্ম। হোক তারা পাকিস্তানী, আরব, আফগান, চীনা কিংবা জাপানী; মোটকথা, ইসলাম একটি সত্যিকার আন্তর্জাতিক ধর্ম।

গতানুগতিক জীবনে ইসলাম বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এটাই একমাত্র আল্লাহর ধর্ম যা সময়ের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করে বেঁচে আছে। ইসলামী শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে- ঠিক যেভাবে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ইসলাম যেহেতু একটি স্বভাবধর্ম, এতে নিহিত আছে প্রয়োজনীয় সংস্কারকর্মের সুযোগ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সুবিধার্থে। সুতরাং তূলনামূলকভাবে এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে, মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে এটি এক চমকপ্রদ ভূমিকা রেখেছে।

ইসলামে, মুক্তির রাস্তাটি সমাজের ভেতর দিয়ে চলন্ত; এটা আমাদের যৌথ বসবাসকে বাইপাস করে যায় না। আমি বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কিছুটা অবগত আছি। উভয় ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে মানবসমাজ থেকে মুক্তি পেতে বিনিময় করতে। কিছু বৌদ্ধ ফিরকা তাদের টেম্পল পাহাড়ের উপরে স্থাপন করেছে। সেখানে মানুষ খুব কষ্ট করে আরোহণ করে। অনুরূপ জাপানি ধর্মীয় জীবনে অনেক উপমা আছে, যেখানে গডকে এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে যেখানে পৌঁছুনোই সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য অসম্ভব।

খ্রিস্টানদের ব্যাপারও অনুরূপ। তাদের আছে মঠ (মনোস্টারী), দূর-দূরান্তে নির্জন স্থানে। তারা ধর্মকে সাধারণ মানবজীবন থেকে আলাদা করে রেখেছে। অপরদিকে, আমাদের ইসলাম মসজিদকে স্থাপন করেছে গ্রামে, গঞ্জে, বাজারে, শহরে, মহানগরীর কেন্দ্রে। সেখানে নামায (উপাসনা) হয় সবাইকে নিয়ে জামাআতে। সমাজের ভেতরে ইসলামধর্ম দান করেছে একক একটি বিস্তৃতি।

মানবজীবন হচ্ছে আত্মা ও বস্তুর সমন্বিত রূপ। আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন রূহ (আত্মা) ও জিসম (দেহ)। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ মানবিক জীবন পেতে আমাদেরকে এ উভয়টি সেলাই করে একত্রিত করতে হবে। বস্তু ও আত্মার মাঝখানে আলাদাকরণ রেখা টানা ঠিক হবে না। ইসলাম আত্মা ও বস্তুকে গ্রহণ করেছে। উভয়টিকে একত্রিত করেছে তাদের সঠিক স্থানে স্থাপন করে। এর ওপর তৈরি করেছে তার দর্শন। এমন এক দর্শন যা জীবনচলার সর্বত্র মূল্যবোধ দান করেছে।

আমি একজন নতুন মুসলমান। দুবছর পূর্বে আমি ইসলামকে আলিঙ্গন করেছি। আর আমি যেটুকু বুঝেছি তাহলো, ইসলাম ঈমান ও আমলের একটি ভ্রাতৃত্ববোধের নাম।[৯৯]

---

[৯৯] Islam Our Choice, pp, 96-97

এস. ই. লিভাইন

প্রাক্ত ইয়াহুদি - আমেরিকা

এক ইয়াহুদি মহিলা তার মুসলিম স্বামীর ওয়াসিলায় মুসলিমদের জীবনযাত্রা দেখে ইসলামগ্রহণের কাহিনী

আমি ও আমার স্বামী মসজিদে গেলাম। সেখানে কেউ একজন বক্তৃতা দেবেন। এই প্রথম আমার স্বামী আমাকে মসজিদে যেতে আমন্ত্রণ জানান। এক বছর হয়েছে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। উভয়ে একটি নির্যাতনপ্রাপ্তদের পুনর্বাসন সেন্টারে কর্মরত ছিলাম। দেখা হলো- কথা হলো এরপর বিয়ে।

শুরু থেকে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিলো। তিনি কালো, আমি সাদা। তিনি মুসলিম আর আমি ইয়াহুদি। যদিও বিয়ের পূর্বে তিনি আমাকে কখনও মুসলমান হতে বলেন নি, তিনি আমাকে নিরব দাওয়াত দিয়েছিলেন নিজের অপূর্ব সুন্দর চরিত্র প্রদর্শন করে।

আমার স্বামীর একটি ব্যক্তিগত বড়ো ইসলামী লাইব্রেরি আছে। একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবে আমি তার লাইব্রেরির অনেক বই-পুস্তক পাঠ করেছিলাম। স্বামীর উত্তম সুন্দর চারিত্রিক আচরণ, দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার দৃশ্য, জুমুআর নামাযে গমনাগমন এবং রমজান মাসের উপবাস ইত্যাদি খুব মনোযোগসহ গত এক বছর যাবৎ অবলোকন করেছি। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যে তার ধর্মসম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়।

মসজিদে পৌঁছুনোর পর তিনি আমাকে ইশারা করলেন মহিলাদের প্রবেশপথের দিকে। আমরা একমত হলাম, অনুষ্ঠান শেষে গাড়ি পার্কে পুনরায় একত্রিত হবো। আমি অগ্রসর হলাম মহিলাদের প্রবেশ দ্বারের দিকে। ভাবলাম, "আমি পারবো!"। একটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার করিডর দিয়ে প্রবেশ করে অনেকটা খাঁড়া সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম।

আমি কখনও বন্ধু বানাতে সমস্যার সম্মুখীন হই নি। বহুকৃষ্টির পরিস্থিতি আমার খুব পছন্দনীয় বিষয়। সুতরাং একটি মনোমুগ্ধকর সময় কাটানোর আগ্রহ অনুভব করছিলাম।

বাড়িতে থাকতে আমার স্বামী বলেছিলেন, একটা কিছু বিনয়ী-ভদ্র ড্রেস পরতে। তাই দীর্ঘ হাতার একটি ড্রেস পরেছিলাম। ভাবলাম, মসজিদে উপস্থিত মহিলাদের নিকট এটি ভালো লাগবে। কিন্তু, সিঁড়ির নিচে নামার পর যখন 'সিস্টার' লিখিত দরোজা দিয়ে ভেতরে গেলাম, তখন খুব টেনশনে পড়ে যাই। আমার মধ্যে বিরাজ করছিলো সন্দেহ, বিচ্ছেদভাব ও বিভ্রান্তি। কারণ, লক্ষ করলাম সব পর্দাবৃত মহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! যেনো কোনো ভূত প্রবেশ করেছে মসজিদে। আমি প্রায় হিমায়িত অবস্থায় তাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইতোমধ্যে আমি এতো মসুলিম মহিলাকে এক জায়গায় একত্রিত অবস্থায় দেখি নি। সবার মাথা ছিলো হিজাবে আবৃত। কেউ কেউ পরেছে নিকাবও। দুজন নিকাব পরিহিতা মহিলা যাদের দুটো চোখ মাত্র দেখাচ্ছিলো, তারাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো।

এরপর একজন মহিলা বসা থেকে দাঁড়িয়ে আমার নিকট আসলেন। বললেন, 'আমি বাসিমাহ'। ভাবলাম, এ মহিলার চোখে-মুখে অন্তত স্বাগতভাব ফুটে ওঠেছে। আমি বললাম, "হায়! আমার নাম শ্যারন। বক্তৃতার অনুষ্ঠানের জন্য এসেছি।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সাথে কেউ আছে?" জবাব দিলাম, "আছে। আমার স্বামী- উপরতলায়।"

তিনি কিছুটা অবাক হয়েই বললেন, "অহ! আপনার স্বামী বুঝি মুসলিম?" বললাম, "হাঁ, হাঁ, তিনি মুসলিম।" তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! আসুন, আমাদের সাথে বসুন।"

তিনি আমাকে একটি টেবিলে নিয়ে যান, যেখানে আরো তিনজন মহিলা বসা ছিলেন। তারা ছিলেন আমার জীবনে দেখা সর্বাধিক রূপবতী বহিরাগত নারী। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বাসিমাহ। তবে আমি

তাদের সবার নাম ভুলে গেছি। প্রত্যেকের নামও ছিলো তাদের মতো অপূর্ব সুন্দর। সিস্টার বাসিমাহ আরো মহিলাদের স্বাগত জানাতে চলে গেলেন।

একজন সুন্দরী মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোত্থেকে এসেছেন?" জবাব দিলাম, "আমি একজন আমেরিকান। আমার পূর্বপুরুষ পূর্ব-ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন। আমার জন্ম নিউ ইয়র্কে।"

পরের প্রশ্ন ছিলো, "আপনার স্বামী কোথা থেকে এসেছেন?" জবাব দিলাম, "তিনিও আমেরিকান।" মহিলা বললেন, "কিন্তু তিনি কোত্থেকে এসেছেন?" বললাম, "ফিলাডেলফিয়া"। তিনি আবার বললেন, "না, আমি জানতে চাচ্ছি, কোন দেশ থেকে?"

জবাব দিলাম, "তিনি আমেরিকান। ইউএসএ জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে তিনি হচ্ছেন আফ্রিকান-আমেরিকান। তিনি ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা।" ভাবলাম, হয়তো তিনি ইংরেজি ভাষার ওপর তেমন দক্ষ নন। পরে আমি জানলাম, এ মহিলাদের অনেকেই আরব পুরুষদের স্ত্রী ছিলেন। আমার কথা শুনে সবাই একসাথে 'হু' বলে নিজেদের আকর্ষণীয় দৃষ্টি নিচের দিকে নামিয়ে দিলেন।

এরপর একজন পুনরায় খুশি রশ্মিসদৃশ ভাব তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী মুসলিমাহ হতে ভাবছেন?" জবাব দিলাম, "না! আমি ইয়াহুদি।" তাদের মুখের ভাবটি কী যে হয়েছিল তখন- যদি দেখতেন পাঠক! খুব তাড়াতাড়ি ভদ্রভাবে বিষয়টি পরিবর্তন করা হলো।

ঐ মিহলা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সন্তানরা কী মুসলিম?" জবাব দিলাম, "না। আমার কোনো সন্তানাদি নেই।" ব্যস, এটুকুই। তারা আমার সঙ্গে মিল পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। এরপর হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেলো- যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তারা শুরু করলেন কথাবার্তা আরবি ভাষায়!

আমি বোকার মতো তাদের টেবিলে বসে থাকি। তাদের একে অন্যের সঙ্গে আরবিতে বলাবলির সময় আমি মাঝে মাঝে শুধু মৃদু হাসি দিয়েছি।

এরপর আরো কিছু মহিলা আমাদের টেবিলে এসে যুক্ত হলেন। আরব মহিলারা আমার সঙ্গে নতুন আগন্তুকদের পরিচয় করে দিলেন ইংরেজিতে, "তিনি হচ্ছেন শ্যারন। তিনি ইয়াহুদি।" এরপরই পুনরায় তারা আরবিতে কথাবার্তা করতে থাকেন।

প্রোগ্রাম শুরু হতেই সব মহিলা নামাযের কক্ষে গিয়ে ভারী কার্পেটের উপর বসে পড়লেন। কিন্তু ৫ মিনিট যেতেই মহিলারা একে অন্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় মত্ত হলেন। উপরতলা থেকে বক্তার কথাগুলো স্পিকারের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছিলো মহিলাদের কক্ষে। কিন্তু কথাবার্তার কারণে খুব বেশি কিছু বুঝা যাচ্ছিলো না।

প্রোগ্রাম শেষে কিছু মহিলা রান্নাঘরে চলে গেলেন। তারা খাবর জোড়ার করে নিয়ে আসবেন। ইতোমধ্যে সিস্টার বাসিমাহ এসে বললেন, "বসুন, একটু পরই খাবার পরিবেশন করা হবে।" আমি বললাম, "আমাকেও সাহায্য করার সুযোগ দিন।" তিনি বললেন, "না, না। আপনি আমাদের মেহমান। কিছু আমেরিকান সিস্টার এসেছেন। আমি তাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করে দেবো।"

সিস্টার বাসিমাহ কক্ষের অপরপ্রান্তে দাঁড়ানো এক মহিলাকে ইশারা করলেন। তিনি এসে বাসিমাহর গালে চুমো খেলেন ও আরবিতে সালাম দিলেন। উভয়ে এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। সিস্টার বাসিমাহ আমার দিকে ইশারা করে অপর মহিলাকে বললেন, "তিনি হচ্ছেন শ্যারন। তিনি ইয়াহুদি। আপনি কী তার সঙ্গ দেবেন খাবার পরিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত?" তিনি বললেন, "অহ, আচ্ছা! হায় শ্যারন, আমি সিস্টার আরওয়াহ!"

সিস্টার আরওয়াহ ও আমি বসে পড়ে একে অন্যকে আরো জানার চেষ্টা চালালাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কতোদিন ধরে মুসলমান হয়েছেন, তিনি কী কোনো মুসলিমের সঙ্গে বিবাহিতা? ইত্যাদি। এরপর তিনি বোমাটি ফেললেন!

প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কেনো জিসাসকে হত্যা করলে?"

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, "কী?"

তিনি এবার প্রশ্নটি নরম করে নিয়ে আসলেন, "অর্থাৎ ... জানতে চাচ্ছিলাম, ইয়াহুদিরা কোন কারণে জিসাসকে হত্যা করেছিলো?"

আমি কী শুনছিলাম, বিশ্বাস করতে পারি নি। আমি এ প্রশ্নে সত্যিই বিস্ময়বিহ্বল ও ক্ষুব্ধ অনুভব করছিলাম। অপরদিকে, আমি প্রশ্নকারী মহিলার নির্মল দৃষ্টিপাত থেকে বুঝতেই পারছিলাম, তিনি সত্যিই কারণ জানতে চাচ্ছেন। হয়তো তিনি ইতোমধ্যে কোনো ইয়াহুদি মহিলার সাক্ষাৎ পান নি। এটাই ছিলো তার অন্তরে জ্বলন্ত প্রশ্নের জবাব জানার সুযোগ।

তার সঙ্গে পরিচিতি হওয়ায় আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ তিনিই ছিলেন মসজিদে আগত প্রথম আমেরিকান মহিলা, যাকে আমি পেয়েছিলাম। এখন আমি চাচ্ছিলাম, টেবিল থেকে ওঠে পালিয়ে যাই। এরপর ক্ষুব্ধতা কিছুটা পশমিত হলো।

তার দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁত কামড়ে বললাম, "আমরা জিসাসকে হত্যা করি নি। রোমানরা করেছে!" তিনি যেনো একটি আহত জন্তুর মতো ফিরে তাকালেন। কিছু বলতে তার দুটো ঠোঁট খুললো মাত্র, কিন্তু কিছু বলার পূর্বে অন্য একজন তাকে ডাক দিলেন। আমাকে বললেন, "মাফ করুন, আমি ফিরে আসছি।"

একদল আফ্রিকান-আমেরিকান সিস্টার মসজিদে আসলেন। আমি বাকি সন্ধ্যা তাদের সাথেই কাটিয়ে দিলাম। তবে স্বামীর সাথে কার পার্কে ফিরে আসার পূর্বে সিস্টার বাসিমাহ আমাকে তাঁর মোবাইল নাম্বার দিলেন। তিনি বার বার বললেন, সময় করে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে।

আমি তাকে কল করেছি। ক্রমান্বয়ে আমাদের মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি আমাকে ইসলাম ও আল্লাহ সম্পর্কে সব বলেছেন। তার কাছ থেকেই আমি জানলাম, জিসাসকে আসলে কেউ হত্যা করে নি! আমি জানলাম, আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়ে যান।

সিস্টার বাসিমাহ জানতেন আমি ইসলামে আগ্রহী ছিলাম। তিনি অনুধাবন করেন, আমার অন্তরটি আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য বিরহযন্ত্রণায় ভুগছিলো। তিনি বললেন, নতুন শিশুর মতো আমার পুনঃজন্ম হবে। আমি

নিষ্পাপ হয়ে যাবো। সুতরাং এ সুযোগ হারাতে নেই। আমি তার কথায় কাঁদতে থাকি।

আমি চাচ্ছিলাম আল্লাহর সঙ্গে সঠিকভাবে জড়িত হওয়ার আরেকটি সুযোগ। কারণ, আমার অতীত ছিলো পাপেপূর্ণ। আমি সব সময় আল্লাহকে ভালোবাসতাম। কিন্তু জীবন নিয়ে আমি হারিয়ে যাই। আমি সিস্টার বাসিমাহর স্বামীকে অনুরোধ জানালাম, শাহাদাত প্রদানে আমাকে সহযোগিতা করতে।

আমার সিদ্ধান্তের কথা নিজের স্বামীকে বলতেই তিনি প্রথমে অবাক হলেন। তারপর খুশিও হলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী এ সিদ্ধান্তে অটল আছো?" যেনো মনে হলো আমার স্বামী তখনও আমাকে বিশ্বাস করছিলেন না। আমি জবাব দিলাম, "আমি এর থেকে অন্য কোনো ব্যাপারে আমার জীবনেও বেশি অটল হতে পারি নি। আমার অভ্যন্তরে কোনো দ্বিধা, সন্দেহ, ভীতি ইত্যাদি কিছুই নেই।"

সিস্টার বাসিমাহর স্বামীর সামনে আমি শাহাদাতের পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করলাম। তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! মাবরুক! (স্বাগতম) আপনি এখন থেকে একজন মুসলিমাহ।"

শাহাতাদের বাণী উচ্চারণের আনুষ্ঠানিকতা থেকে বাড়ি ফেরার পর আমার স্বামী আমাকে এক জিলদ কুরআন ও সংক্ষিপ্ত বুখারির একখানা কিতাব উপহার দিলেন। তবে সিস্টার বাসিমাহর বাড়ি থেকে সেই স্মরণীয় দিনে ফেরার পূর্বে তিনি আমাকে মুসলিম মহিলাদের শালীনতা সম্পর্কিত একটি বুকলেট প্রদান করেন। তিনি আমাকে একটি জায়নামাজ, একটি নামাযের জন্য ড্রেস এবং একটি হিজাবও উপহার দেন।

ঐদিন থেকেই আমি হিজাব পরে আসছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এখনও এটি মাথা থেকে খুলি নি, এমনকি ২০১১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনার পরও নয়।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে আমি ইসলামগ্রহণ করি। সেদিন থেকেই আমার পিতা চিরতরে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন। একজন মুসলমানকে বিয়ে করায় তিনি আমার ওপর আগে থেকেই খুব রাগান্বিত ছিলেন। আমার

স্বামীকে তার মেয়ের-জামাই হিসেবে কখনও মানেন নি। তিনি চিৎকার দিয়ে বলতেন, "শ্যারন! তুমি কী জানো না- ঐ লোকগুলো (মুসলমানরা) আমাদেরকে ঘৃণা করে।"

আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি, শান্তিপ্রিয় ইসলাম ও ফিলিস্তিনীদের অধিকারের পলিটিক্যাল সংগ্রাম একই জিনিস নয়। কিন্তু সবই যেনো বলা হচ্ছিলো, বধির কানে! যাক, আমার পিতা কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যিনি জেরুজালেমের বাইরে বিয়ে করেন। আমার মাতা কিন্তু রোমান ক্যাথোলিক ছিলেন বিয়ের সময়। তিনি প্রাকটিসও করতেন নিজের ধর্মের- খুব সতর্কতার সঙ্গে।

আমার অন্যান্য পরিবারবর্গও আমাকে অবগত করেন, তারা এ সিদ্ধান্তে কতো মারাত্মকভাবে হতাশ হয়েছেন! আমি একজন 'কালো মুসলিমকে' বিয়ে করেছি জেনে সত্যিই লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে যায়। আর এখন ইসলামকে কবুল করে বসলাম।

আগস্ট, ২০০১ সালে আমার পিতা মারা যান। পিতার স্ত্রীর অনুরোধে মৃত্যুসংবাদটি পর্যন্ত ফিউনারেল অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। কালো স্বামীকে নিয়ে সিনোগগে যাবো- এটা তার বরদাশত করার মতো ছিলো না!

আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, ইসলামধর্ম সব মানুষের জন্য, সব যুগের জন্য। একজন মুসলিম মিসরি, পাকিস্তানি, আমেরিকান, সৌদি, ইন্দোনেশিয়ান কিংবা ফিলিস্তিনী হোক- তাতে কিছুই যায় আসে না। সে কালো, সাদা, বাদামী বা হলুদ চামড়াবিশিষ্ট হোক- তাও কোনো ব্যাপার নয়। সে যদি আরবি, ইংরেজি, বাংলা, উর্দু কিংবা স্প্যানিশ ভাষায়ই কথা বলে- তাতেও কোনো সমস্যা নেই। সে মুসলমান। একেই বলে বিশ্বজনিন সত্যধর্ম। আমাদের কৃষ্টিগত ভিন্নতা উম্মাহকে বিভক্ত করে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা দিয়েছেন:

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে

তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (হুজুরাত (৪৯): ১৩)[১০০]

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন - সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

সমাপ্ত

১০০ https://www.islamreligion.com/articles/618/viewall/s-e-levine-ex-jew-usa/